বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস

(১৮২৬-১৮৫৬)

স্বপন বসু

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি ॥ ২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯ ।

প্রথম প্রকাশ :
বুদ্ধ পূর্ণিমা : ১৩৪১

প্রকাশক :
শ্রীপ্রণব রায়
ডিজাইনার্স্ ফোরাম,
৩, ম্যাংগো লেন (তিনতলা),
কলকাতা-১।

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রিপ্রোডাকৃসন সিণ্ডিকেট,
কলকাতা-৬।

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯।

কুড়ি টাকা

আমার মা-কে

বিষয়সূচী

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলায় এক নবজাগরণ এসেছিল—একথা শুনে আসছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ উনিশ শতকের বাংলায় নতুন অনেককিছু ঘটলেও জনসাধারণের বড়ো অংশকেই তা স্পর্শ করেনি। সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও জনগণের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেশি মাথা ঘামান নি। বাংলার মুসলমান সমাজেও উনিশ শতকের প্রথমদিকে নবজাগরণের বিশেষ কোনো ছোঁয়া লাগে নি। এইসময়ে তাঁরা তাঁদের পূর্ব গৌরবের কথা স্মরণ করে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব দেখিয়ে বাইরের বৃহত্তর জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় তাঁদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব হল বিলম্বিত। তাই এইসময় বাংলার মুসলমান সমাজ ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে, পরিবর্তিত যুগের কথা চিন্তা না করে, নিষ্ঠাভরে ফেলে আসা দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন। সবমিলিয়ে সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকে বাংলায় কোনো নবজাগরণ এসেছিল—একথা মেনে নেওয়া কঠিন। অবশ্য এইসময়ে নগরবাসী বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে এক নবচেতনা এসেছিল—এই চেতনাই আধুনিকতা। যা বাঙালীকে উজ্জীবিত করেছিল প্রচলিত প্রথাকে বিচার করতে, বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে, শ্রেণীস্বার্থ সচেতন হয়েও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক করে তুলতে।

ঘটনাবহুল উনিশ শতকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এই শতাব্দী ও তার নানা ব্যক্তি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ, বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, অনেক মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আমরা পেয়েছি। কিন্তু নতুন করে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে এমন অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি—যার ভিত্তিতে প্রচলিত অনেক ধারণাকেই মেনে নেওয়া কঠিন, এবং নতুনতর তথ্যের ভিত্তিতে এই শতাব্দীর বহু ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নতুন আলোকপাত সম্ভব।

॥ ২ ॥

আমাদের আলোচনা ১৮২৬ থেকে ১৮৫৬ উনিশ শতকের ঘটনাবহুল এই ৩০টি বছরকে নিয়ে। ১৮২৬-এ ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন; ১৮৫৬-এ বিধবাবিবাহ আইন চালু হয় ও বাংলায় প্রথম আইনসিদ্ধ বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দুটি ঘটনাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই গুরুত্ব কি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৮১৪-তে রামমোহনের বসবাসের জন্ম কলকাতা আগমন, ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮-তে বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব—এই ঘটনাগুলির নেই ?

আমাদের মতে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বাংলা গদ্যের ইতিহাসে থাকলেও অন্যক্ষেত্রে নেই। কয়েকজন পণ্ডিত-মুন্সী আর কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ আমাদের আর কি দিয়েছে ? ১৮১৪-তে রামমোহন কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করে সমাজে বিরাট কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন নি। কয়েকজন মধ্যবয়সী ধনী ছাড়া 'হাফ রিফর্মার' রামমোহনের কার্যকলাপে প্রথমদিকে বিশেষ কেউ আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮২৬-এ ডিরোজিওর নিযুক্তির আগে পর্যন্ত এটি ছিল মডার্ন বাবুদের ফ্যাশনেবল স্কুল। ডিরোজিওর নিযুক্তির কিছুদিন আগে হিন্দু কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র সম্পর্কে সাহেবদের কাগজ 'ক্যালকাটা জার্নাল' একটি উপাদেয় মন্তব্য করে। ৩.১.১৮২২-এ পত্রিকাটি বিনা দ্বিধায় এই অভিজাত বিদ্যাকেন্দ্রের শিক্ষকদের 'মাথামোটা' আর ছাত্রদের 'রামবোকা' বলে অভিহিত করে। ১৮২৩ পর্যন্ত এটি যে কেরানী তৈরীর কারখানার বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে নি—তা হিন্দু কলেজের অন্যতম ম্যানেজার রসময় দত্তকেও স্বীকার করতে হয়েছে। ১৮১৮-তে সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও রাতারাতি সাময়িকপত্র সমাজজীবনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের বাইরে এসময় সাময়িকপত্রের বলতে গেলে কোনো পাঠকই ছিল না। ১৮৩৪-এ প্রভাবশালী বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে'র প্রচারসংখ্যা মাত্র ২৫০, ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণে'র মাত্র ১০০। বছর পনের আগে এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো কম ছিল। এসবের তুলনায় ১৮২৬-এ ডিরোজিও নামে একটি তরুণের হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির 'অতি তুচ্ছ' ঘটনাটি সমকালে কি পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ও পরবর্তী ইতিহাসের মোড় কিভাবে ফিরিয়ে দেয়—তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির দিক দিয়ে ১৮২৬-৫৬ এই ৩০ বছরে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, বাঙালীসমাজে অনেককিছু দেখতে দেখতে অতীতের বস্তু হয়ে উঠেছে। ১৮২৬-৫৬ এই ৩০টি বছর যেন ঘটনার মিছিল।

১৮২৮-এ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, ১৮২৯-এ সতী নিষেধক আইনজারি ও তার প্রতিক্রিয়ায় ১৮৩০-এ ধর্মসভার জন্ম; ১৮৩০-এ আধুনিক বাংলার অন্যতম নায়ক রামমোহনের বিদেশযাত্রা ও ১৮৩৩-এ বিদেশে তাঁর মৃত্যু; ১৮৩০-এ মিশনরি ডাফের এদেশে ধর্মীয় প্রচারকার্য ও পরিণামে দলমত নির্বিশেষে বাঙালীর খ্রীষ্টাতঙ্ক; ইয়ংবেঙ্গলের প্রচলিত রীতিবিরোধী আচরণের ফলস্বরূপ ১৮৩১-এ হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর পদচ্যুতি; স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন; ১৮৩৬-এ বাঙালীর প্রথম রাজনীতি বিষয়ক সভা 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র জন্ম; ১৮৪৩-এ দাসত্বপ্রথার বিলোপ, বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ, জমিদার ও নীলকরের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত কৃষক বিদ্রোহ—এতসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই ৩০ বছর সময়কালের মধ্যে ঘটেছে।

এতসব ঘটনার মাঝে ১৮৫৬-এ বাঙালী সবিস্ময়ে দেখল বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হতে। বাঙালীর চোখের সামনে জলজ্যান্ত বিধবার ধুমধাম করে বিয়েও হল এই বছরের ডিসেম্বর মাসে! ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের অগতানুগতিক আচরণের মধ্য দিয়ে শহরে বাঙালীজীবনে যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছিলেন, তাকে চরমে পৌছে-দিলেন বিদ্যাসাগর বিধবার বিয়ে দিয়ে। শহরের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে তা গ্রাম-সমাজকে নাড়া দিল। এই ঘটনার পরে বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা আলোচনায় আর অগ্রসর হই নি।

কারণ, ঠিক এর পরের বছর ১৮৫৭-তে ঘটল সিপাহী যুদ্ধ (যাকে কেউ বলেছেন জাতীয় সংগ্রাম, কেউ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, কেউ আবার 'বিদ্রোহ' বলে গোটা ব্যাপারটিকে চিহ্নিত করেছেন)। যুদ্ধ শেষ হল ইংরেজের জয়লাভে। কিন্তু যুদ্ধের পর এদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। কোম্পানির হাত থেকে ভারত-শাসনভার গ্রহণ করে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৮৫৭-এর পর সামাজিক সংস্কারে সরকারি আগ্রহ লোপ পাওয়ায়—এর পর থেকে সামাজিক আন্দোলনের স্রোতে ভাঁটা পড়ে। রানীর আমলে পুরানো দিন আবার ফিরে আসবে এমন স্বপ্নও অনেকে দেখতে লাগল। কোম্পানি আমলে প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আইন নয়া জামানায় বাতিল হবে কিনা এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হতে লাগল। আইন করে বহুবিবাহ রদ করার সব ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক থাকলেও, সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরেজ আর এ আইন

পাশ করল না। ১৮৫৭-র পর থেকে ইংরেজ রাজন্যদের রাজ্যগ্রাস নীতি পরিত্যাগ করায়, রাজন্যরা অতঃপর ব্রিটিশ রাজত্বের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল। সারা ভারতে ব্রিটিশের এক শক্তিশালী তাঁবেদারশ্রেণী গড়ে তোলার জন্য জমিদারদের সভা 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ১৮৫৯-এ বাংলার মতো সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কাতর আবেদন জানাল। ভারতীয়দের 'প্রকৃত প্রভুভক্তি' প্রদর্শন করতে ভিক্টোরিয়া লিখিত 'আদেশ' দিলেন। ১৮৫৭-এ প্রেসের স্বাধীনতা আবার অপহৃত হল (তবে সংবাদপত্রের এই কণ্ঠরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি), দু'একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার (যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর') প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ভক্তিবাদী, যুক্তিবাদী নির্বিশেষে অনেকেই ভয়ার্ত কণ্ঠে রানীর জয়জয়কার করতে লাগলেন (করতেই হবে রানীর 'আদেশ'!)। সিপাহী যুদ্ধের পর শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়, এবং ক্রমশ তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়। মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নবোদিত জাতীয়-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা চলতে থাকে (অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে আগের মতোই উচ্চবিত্তের একাধিপত্য শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও চলতে থাকে। ১৮৩৬-এ 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' থেকে ১৮৮৫-তে ভারতের 'জাতীয়' কংগ্রেস পর্যন্ত ইংরেজপ্রেমী সবকটি প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের কাছাকাছি যাবার কোনো চেষ্টা করেনি)। সবদিক দিয়েই সিপাহী যুদ্ধের পর বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন ভিন্নমুখী হয়, রাজনীতি স্বতন্ত্র মোড় নেয়। ১৮৫৭ খ্রী. বাংলার ইতিহাসে এক মাইলস্টোন, এবং এইসব কারণে ১৮৫৭ খ্রী. থেকে বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পৃথক ও বিস্তৃততর আলোচনার দাবি রাখে।

॥ ৩ ॥

১৮২৬-৫৬ বাংলার এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালকে আমরা দুটি দিক দিয়ে আলোচনা করেছি। প্রথমে ১৮২৬-৫৬ এই ৩০ বছরের বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে আমরা প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে তুলে ধরেছি। এই পর্যায়ে আমাদের পরিবেশিত বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত

তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা কয়েকটি নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। উপযুক্ত যুক্তি এবং তথ্যের দ্বারা আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত সমর্থিত। আমরা দেখাতে ও বলতে চেয়েছি :

(১) প্রচলিত ধারণানুযায়ী ডিরোজিও নাস্তিক এবং সংশয়বাদী হলেও মূলত তিনি খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ;

(২) 'বিদ্রোহী' ইয়ংবেঙ্গলের 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গদের' স্ববিরোধী আচরণ ছিল প্রচুর ;

(৩) 'প্রগতিশীল' রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের কথার সঙ্গে কাজের অমিলটাই ছিল বেশি ;

(৪) হিন্দু রক্ষণশীলদের মৌখিক আস্ফালন সত্ত্বেও তাঁদের অনেক আচরণই ঘোরতর অহিন্দু। রাজা রাধাকান্ত, রাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতির মতো 'সচেতন' রক্ষণশীলরাও দুর্গাপুজোর সময় গো-মাংসে অতিথি-আপ্যায়নে ক্রটি করতেন না।

(৫) প্রচলিত ধারণা অধিকাংশ মেয়েকেই নাকি জোর করে সতী করা হত ; যদিও এর বিপরীতটাই সত্য। শুধু স্ত্রী-ই নয়, রক্ষিতাও সতী হতেন, মুসলমান রমণীও সহগমন করতেন, 'ভাবী' স্বামীর মৃত্যুতেও কেউ কেউ চিতায় গিয়ে উঠতেন। সতীপ্রথার ঘোর বিরোধী রামমোহন কেন আইন করে এ প্রথা রদে সম্মতি দিতে পারেন নি, তাও আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি।

(৬) কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বহু পূর্ব থেকেই আন্দোলন হয়ে আসছিল। বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী এইসব 'ভুলে যাওয়া' সংস্কারকদের ভূমিকা আমরা বিশ্লেষণ করেছি। বহুবিবাহ বিষয়ে বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে আবেদনপত্র পেশ করা হয়, তাও আমরা বলেছি।

(৭) আলোচ্য পর্ব আমাদের মতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর ইংরেজ ভক্তির যুগ। আমরা দেখিয়েছি, এদেশে ইংরেজ-আগমন শুধু 'দেশপ্রেমিক' ও 'যথার্থ জাতীয়তাবাদী' রামমোহন বা তাঁর ভক্ত-শিষ্য প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথের কাছেই নয়, 'দেশহিতৈষী' ইয়ংবেঙ্গলের কাছেও ঈশ্বরের করুণাঘন আশীর্বাদ! শুধু রক্ষণশীল রামকমল সেনই বেন্টিঙ্ককে 'প্রকৃত ভারতবন্ধু ও রক্ষক' বলেন নি, 'র‍্যাডিক্যাল' ইয়ংবেঙ্গলও লর্ড বেন্টিঙ্কের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—অলজ্জকণ্ঠে একথা বলেছিলেন।

॥ ৪ ॥

এই পর্বের বাংলার বিচিত্র ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কতখানি ছাপ রেখেছে তাও আমাদের আলোচনার বিষয়। এ পর্যন্ত কার্যত অব্যবহৃত উপাদানের ভিত্তিতে রচিত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটিতে আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদটিতে সমকালীন বাংলাসাহিত্যে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্ম, রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম, নাস্তিকতা, সতী, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। এই পর্বের আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোনো আলোচনা আগে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শুধু আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই আমরা রচনা করি নি, তথ্যের সাহায্যে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহুল প্রচলিত কয়েকটি ধারণাও দূর করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। দেখিয়েছি, বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধীরূপে এ যাবৎ খ্যাত ঈশ্বর গুপ্ত আসলে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না! প্রথম যৌবনে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করলেও, পরে তিনিই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষার গোঁড়া সমর্থক। ১৯ বছরের সদ্যযুবক ঈশ্বর গুপ্তের স্ত্রীশিক্ষা বিরোধিতার পাশাপাশি ৩৭ বছরের আত্মস্থ ঈশ্বর গুপ্তের স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনকে তুলে ধরে আমরা একটি অপরিণত যুবকের পরিণত হয়ে ওঠার নেপথ্য-কাহিনী বর্ণনা করেছি। পরিহাসরসিক ও চিন্তাবিদ ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত রূপকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই আশ্চর্য মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করেছি।

সতী, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে প্রত্যেকটি বাংলা সাময়িকপত্রের (অবশ্যই আজকের দিনে যেগুলি পাওয়া যায়) ভূমিকা বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে সমকালীন বিচিত্র প্রতিক্রিয়াকে আমরা দেখিয়েছি। 'তত্ত্ববোধিনী'র 'প্রগতিশীল' ভূমিকা সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বললেও—১৮৪৯-এ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাঙালীসমাজ যখন সরগরম, সেই উত্তপ্ত পরিবেশে 'তত্ত্ববোধিনী'র বিস্ময়কর নীরবতা আমাদের কাছে তাৎপর্যহীন মনে হয় নি।

মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালীজীবনে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক হাজারো ভাঙাগড়া ও তার সমকালীন সাহিত্যিক প্রতিফলন আমরা পাশাপাশি দেখিয়েছি। আমরা যা বলেছি তাই শেষ কথা নয়।

আমরা যেমন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত অনেক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারিনি, ঠিক তেমনি নতুনতর তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত যে কোনো মুহূর্তে খণ্ডিত হতে পারে। একথা সবসময় মনে রেখেই উনিশ শতকের বাঙালী মানসের সামগ্রিক পরিচয় পাবার এটি একটি বিনীত প্রয়াস।

॥ ৫ ॥

ছাপায় দু'চারটে ভুল থেকেই গেছে। ১ম পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনে 'dawn of the new age'-এর জায়গায় 'dawn of a new era'; ১০ম পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনে রামনারায় মিশ্রণ এর জায়গায় রামনারায়ণ মিশ্র; ১৩০ পৃষ্ঠায় ১০ লাইনে ২ জন এর জায়গায় ১২ জন, ১৬৯ পৃষ্ঠায় ৯ম লাইনে ১৮২৮-এর জায়গায় ১৮৩০ ও ২১১ পৃষ্ঠায় ১০ সংখ্যক পাদটীকায় ১৭৭২ XIক এর জায়গায় ১৭৭২ শক পড়লে বাধিত হব।

দুটি তথ্যগত ভুল সংশোধন করে নিচ্ছি। ১৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাদুটির ইংরেজি অনুবাদ 'Marriage of Hindu Widows' নামে ১৮৫৬-তে প্রকাশিত হয়। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পরে আরও অনেকে একথা বলেছেন। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় (19th Century Studies, No 10, April, 1975) বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রথম পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Practice of widow-marriage among Hindus' নামে ১৮৫৫-তে প্রকাশিত হয়।

১৫৭ পৃষ্ঠায় আমরা বলেছি বহুবিবাহকারী কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্যা প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব সম্ভবত 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার' পত্রিকার। এর ২৪ বছর আগে ১৮১২-তে রেভাঃ ক্লডিয়াস বুকানন তাঁর 'Memoir of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India' গ্রন্থের ২য় সংস্করণের পরিশিষ্টে (বুকাননের বইএর প্রথম সংস্করণ ১৮০৫-এ প্রকাশিত হয়, এই সংস্করণ দেখার সুযোগ আমাদের হয় নি) ৭ জন জীবিত ও ৩ জন মৃত বহুবিবাহকারী কুলীনের নাম, বাসস্থান ও বিবাহসংখ্যার উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে কলকাতার রাজীব ব্যানার্জির বিবাহসংখ্যা ৪০, রাজচন্দ্র ব্যানার্জির ৪২ (পেলে ইনি আরও বিয়ে করতে প্রস্তুত!), বিক্রমপুরের

রাধরাজা ব্যানার্জি, পুরণ ব্যানার্জি, রাজকিশোর চ্যাটার্জি ও রূপরাম মুখার্জি— এই চারজনেরই সখ ৪০টিরও বেশি বিয়ে করেও মেটে নি। বর্ধমানের কাছে পাঁচড়ার প্রতাপ ব্যানার্জির স্ত্রীর সংখ্যা মাত্র ৭০! এই ৭ জন ছাড়া ৫ বছর আগে মৃত বর্ধমানের বিরজু মুখার্জি ৯০টি, ১২ বছর পূর্বে মৃত যশোরের রামকণি মুখার্জি ১০০টি ও ৪ বছর পূর্বে মৃত শান্তিপুরের কাছে বালিগড়িয়ার রঘুনাথ মুখার্জি ১০০-টিরও বেশি বিয়ে করেছিলেন—এ তথ্যও বুকানন আমাদের জানিয়েছেন।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে খাস কলকাতাতেও বহুবিবাহকারী কুলীন বামুনরা অনেক মেয়ের জীবনযৌবন নিয়ে খেলা করত—ঘটনাটি মনে রাখার মতো।

॥ ৬ ॥

এ বই আমি লিখেছি বললে ভুল হবে, আমাকে এ বই লিখতে বাধ্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। কান ধরে আমাকে তিনি বাংলা লিখতে শিখিয়েছেন, বানানের প্রথম পাঠ দিয়েছেন, পত্রপত্রিকাগুলির মূল ফাইল ঘাঁটার নেশা ধরিয়েছেন। অশেষ ধৈর্য ধরে বারবার আমার লেখা পড়ে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—চালিয়ে যাও, থেমো না। এ বই-এর নামকরণও তিনিই করেছেন।

অধ্যাপক শ্রীঅশোক মুস্তাফি এই লেখায় প্রথম থেকে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সহায়তা ছাড়া রাজা রাধাকান্ত দেব লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি আমি অন্তত কোনোদিনই পেতাম না। ডঃ ভবতোষ দত্ত 'রিফর্মার' পত্রিকার সন্ধান জানিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জি চৌধুরী আমার ক্ষীণদৃষ্টির কথা বিবেচনা করে কয়েকটি পত্রিকার মূল ফাইল ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। গ্রন্থপ্রকাশের শেষপর্যায়ে অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী পুরকায়স্থ হাসিমুখে আমার নানা অত্যাচার সহ্য করে পুস্তক প্রকাশকে নিশ্চিত করেছেন। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে যেসব গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন যাতায়াত করেছি, সর্বত্র কর্তৃপক্ষ—বিশেষ করে কর্মীদের কাছ থেকে যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১১৫এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস্ স্বপন বসু
কলকাতা-১৯।

১. নবজিজ্ঞাসার সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নতুন এক যুগের এবং সেইসূত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল, একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। এই নবযুগের পেছনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথাও স্বীকার্য।[১] অবশ্য প্রতীচ্য ভাবই আধুনিকতা নয়, আধুনিকতা আরও ব্যাপক এবং গভীর। তবে পাশ্চাত্যের চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ এদেশে আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত করেছিল, আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, নতুন অর্থনৈতিক ও সেইসূত্রে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, নতুন জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা ইত্যাদি বাংলার কাল-প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, যার প্রত্যক্ষ ফল বাংলার 'নবজাগরণ', অবশ্যই সীমিত অর্থে।[২]

এই নতুন যুগকে আমরা বিশেষভাবে বলতে চাই, নবজিজ্ঞাসার যুগ। উনিশ শতকে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা—প্রায় পরস্পর-বিরোধী এই দুই ধারার সম্মুখীন এদেশের 'সচেতন জনমনে' এই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এ জিজ্ঞাসা সচেতন বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা—এবং তা প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিকে অবলম্বন করে। উনিশ শতকে বাংলায় এই নতুন যুগের সূত্রপাত সমসাময়িক ব্যক্তিদেরও চোখ এড়ায়নি। ১৮২৯-এ রামমোহন-পন্থীদের পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ড' 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি-প্রসঙ্গে' বর্তমান সময়কে 'dawn of the new age' বলে অভিহিত করে।

উনিশ শতকে বাংলার এই নবজিজ্ঞাসার পীঠস্থান হয়ে উঠল কলকাতা। নতুন যুগের নতুন শহর হিসাবে কলকাতা আত্মপ্রকাশ করল তার নতুন নতুন শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে। এ. বি. স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি ২১. ১০. ১৭৮৪-তে 'ক্যালকাটা-

---

১ 'If we have to single out the most important contributory factor to the Renaissance of Bengal in the 19th Century it is the English education and the western ideas that flowed along with it.' *'On Rammohan Roy'*, Dr. R. C. Majumdar, p. 20

২ *'British Orientalism & Bengal Renaissance'*, David Kopf, p. 275-6.

গেজেটে' এক চিঠিতে লেখেন, আমোদপ্রমোদ ও ফ্যাশনের অভিনবত্বে অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা ইউরোপের অধিকাংশ শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।[৩] জন কলিন্স, উনিশ শতকের প্রথম দশকে একটি কবিতায় কলকাতা এশিয়ার ফ্লোরেন্স হয়ে উঠছে, এইভাবে তাকে চিত্রিত করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা বিকশিত হল, বাড়ির ভাড়া, জমির দাম অনেক বেড়ে গেল, লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগল দ্রুত। ১৮০৯-তে কলকাতার উন্নতির জন্য গবর্নর জেনারেল লটারি স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

হুতোম কলকাতাকে বলেছিলেন, আজব শহর কলকাতা 'রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা'; 'তত্ত্ববোধিনী' একে 'লাম্পট্য বিদ্যাশিক্ষার পাঠশালা' হিসাবে দেখেছিল; 'সমাচার দর্পণ'কার এখানকার বাবুদের 'পালিশ করা জমিদার' বলতে ইতস্তত করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম তিরিশ বছরের মধ্যে একই সঙ্গে কলকাতা হয়ে উঠল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান; না হলে তিরিশের দশকেই কি করে কলকাতার কলেজের ছাত্র মিথ্যা কথা বলতে পারে না একথা মেনে নিল সবাই? সঙ্গতভাবেই 'কলিকাতা কমলালয়'কার ১৮২৩-এই একে 'মহানগর' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ১৮২৪-এ জেমস্ অ্যাটকিন্সন একটি কবিতায় একে 'প্রাসাদ নগরী' হিসাবে চিত্রিত করার পর, ১৮৩০-এ 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিনে'র এক প্রতিনিধি এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, অতীত দিনের কবি ও অন্যান্যরা ট্রয়, করিন্থ বা রোম সম্পর্কে যা বলেছেন বা করেছেন, তা আমাদের এই কলকাতা সম্বন্ধেও সত্য। অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই এই শহর কনস্টানটাইনের রাজধানীর মতো জগতের বিস্ময়, আর মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও ধৈর্যের এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে।[৪]

কী ছিল কলকাতা আর কী হয়ে উঠতে চাইল! অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষপর্যন্ত ইংরেজরা কলকাতায় শুধু আফ্রিকান দাসই কেনাবেচা করত না, নিজেদের স্বার্থেই তাদের সন্তান উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করত।[৫] দাসব্যবসা ছিল অব্যাহত। এমনকি কোনো দাস

---

৩ *'Selections from Cal. Gazettes'*, (*Vol. 1*), W. S. Seton Karr, p. 27.

৪ *'The City of palaces'*, 'The Calcutta Magazine and Monthly Register' (Vol II), 1830, P. 763.

৫ *'Echoes from old Calcutta'*, Busteed, p. 120. F. N.

পালালে বিচারক আইনমাফিক আচ্ছা করে চাবকে তাকে তার মনিবের হাতে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিতেন। পলাতক দাসের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা করে মালিকরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন। পুরোনো 'ক্যালকাটা-গেজেটে'র পাতায় পাতায় এই ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে।

ইউরোপীয়েরা এদেশে এসেছিল, সেকালের এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'দি ক্যালকাটা গেজেট অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজর'-এর মতে, শোষণ করতে, অত্যাচার করতে, লুঠ করতে। সাত সাগর পেরিয়ে তাদের এদেশে আসার পেছনে অর্থলোভটাই ছিল সবচেয়ে বড়। তাই ইংলণ্ডে ফিরে বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাবার জন্য তারা যে-কোনো উপায়ে ধনী হবার চেষ্টা করত।[৬] নৈতিক চরিত্রও গর্ব করার মতো ছিল না। নীচুতলার ইউরোপীয়দের কথা বাদ দেওয়া যাক, ওপরমহলের নৈতিক চরিত্র এমনই ছিল যে, কোনো ভদ্রমহিলার আইনসম্মত বিবাহ-বিচ্ছেদের পরই সে গবর্নরের জেনারেলের বউ হবে কিনা, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যেত। কোনো তরুণী এদেশে এলে তাকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মেয়ে নিয়ে ডুয়েল লড়া তো ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। ১৭৮০-তে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে প্রকাশ্য স্থানে ডুয়েল লড়েন। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মাদাম গ্রাণ্ডের কেচ্ছা অতিপরিচিত ঘটনা। অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়েও সম্ভ্রান্ত ইংরেজরা ডুয়েল লড়তেন, সাহসী প্রেমিকরা উপনিবেশের মহিলাদের উদ্দেশে কবিতা লিখতে ও কাগজে তা ছাপতে দ্বিধা করতেন না। পুরোনো 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পাতায় সেসব কবিতা আজও আছে। উপনিবেশের মহিলারা জুয়ায় আসক্ত বলে 'বেঙ্গল জার্নাল' অভিযোগ করে, যদিও 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

স্থান-হিসাবে কলকাতা এই সময় মোটেই স্বাস্থ্যকর ছিল না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল সাংঘাতিক। নদীতীরগুলি পশু আর মানুষের মৃতদেহে পূর্ণ থাকত। ১৭০৫ পর্যন্ত শহরে ডাক্তার মাত্র একজন, আর হাসপাতালের কোনো চিহ্ন ১৭০৭ পর্যন্ত কলকাতায় ছিল না। পথঘাট-গুলি অপ্রশস্ত এবং আবর্জনাপূর্ণ, ডাকাতি ছিল রোজকার ব্যাপার, ধন-

---

৬ *'The Calcutta Gazette & Commercial Advertiser'*, 21. 4. 1829.

প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না মোটেই। কলকাতার আশেপাশে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকেও বাঘ বেরোত, চৌরঙ্গি যেতে পাল্কিবেয়ারারা দ্বিগুণ দর হাঁকত। ১৮০৫-এও এসপ্লানেডে হাতীর দেখা মিলত, অনেক স্থানই ঘন জঙ্গলপূর্ণ। ১৮২০-তেও চার-পাঁচটি ছাড়া কলকাতার সব রাস্তাই কাঁচা। ১৮২৫-এ জনবহুল চিৎপুরের পথে দিবালোকেও শেয়াল ঘুরতে দেখেছিলেন বিশপ হেবার। ১৮২৬ সালেও কলেজ স্কোয়ারের আশপাশে ছিল চোর-ডাকাতের আড্ডা, সূর্যাস্তের পর কোনো দেশীয় লোক মরে গেলেও সে পথ দিয়ে চলতে চাইত না। অথচ ১৭৭৩-এ কলকাতা ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

কলকাতা তবু বাড়ছিল। উনিশ শতকে এই বিকশমান শহর-কলকাতায় নতুন যুগের নেতৃত্ব দিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, ইংরেজ অধিকারের পর যাঁরা ধীরে ধীরে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি, পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবজাত যুক্তিবাদ এবং ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ নিয়ে তাঁরা আত্মসমীক্ষার পথে পা বাড়ালেন। উচ্চবিত্তের যুগসঞ্চিত শ্রেণীস্বার্থ-রক্ষার প্রয়াস ও জনসাধারণকে সার্বিক বঞ্চনার চেষ্টার মধ্যেও এই শ্রেণীর কিছু মানুষই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাই রামমোহনপন্থী 'বঙ্গদূতে'র ভাষ্যকার ১৩.৬.১৮২৯-এই বলতে পেরেছিলেন, 'এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপান্ন তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত।'

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়'-এ বিষয়ী ভদ্রলোকের ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন; ১. 'যাঁহারা প্রধান কর্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করিয়া থাকেন' (এঁরাই কলকাতার হঠাৎ নবাবের দল; এই মুচ্ছুদ্দিগিরি পাবার জন্য সেযুগে লোকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে ইতস্তত করত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নবকৃষ্ণের বা মাধব দত্তের নাম করা যায়); ২. 'মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য' (আজকালকার ভাষায় এঁদের বলতে পারি উচ্চমধ্যবিত্ত); ৩. 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক' এঁদের কেউ মুহুরি, কেউ মেট, কেউ বা

বাজার-সরকার (অর্থাৎ আমরা এখন যাঁদের বলি নিম্নমধ্যবিত্ত)। এছাড়াও ছিলেন অসাধারণ ভাগ্যবান কিছু লোক, যাঁরা প্রচুর ধনের অধিকারী এবং তার সুদ বা জমিদারির উপস্বত্ব হতে ন্যায্য ব্যয়ের পরেও অনেক উদ্বৃত্ত থাকত।[৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলার যে নবজিজ্ঞাসার কথা বলেছি তার সূত্রপাত হয়, ভবানীচরণ-কথিত প্রথম স্তরের ব্যক্তিদের হাতে, যাঁরা ছিলেন দেওয়ান বা মুৎসুদ্দি বা জমিদার, এবং প্রচুর বিত্তের অধিকারী। স্মরণ করতে পারি, আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক হিসাবে স্বীকৃত রামমোহন রায় ছিলেন একজন দেওয়ান। তাঁর অন্তরঙ্গ দ্বারকানাথ ঠাকুর, ২৪ পরগণার কালেক্টর এবং সল্ট-এজেন্ট মিঃ প্লাউডেনের দেওয়ান হিসাবে দু'বছর কাজ করেন। কিছুদিন তিনি আবগারী বিভাগেও (লবণ এবং আফিম) দেওয়ানের কাজ করেন। এযুগের বিখ্যাত ধনী 'কলকাতার রথচাইল্ড' বলে খ্যাত মতিলাল শীল 'বিদেশাগত জাহাজ সকলের মুচ্ছুদ্দিগিরি' কর্ম করতেন। রামমোহন-অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুরও তমলুকের সল্ট এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ কলকাতাস্থ সল্ট বোর্ডের দেওয়ানের পদ ত্যাগ করলে ঐ পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য বেশিদিন তিনি ঐ পদে কাজ করেননি। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি রামকমল সেন হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসের কর্ম-ত্যাগের পর ১৮২৮ সাল থেকে ডাঃ উইলসনের অধীনে টাকশালের নেটিব সেক্রেটারি বা দেওয়ানের পদে কাজ আরম্ভ করেন, ১৮৩২-এ তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। 'ধর্মসভা'র একনিষ্ঠ সম্পাদক ভবানীচরণ বহু জায়গায় দেওয়ানের কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এইসব বিত্তবান শিক্ষিত 'প্রগতিশীল' দেওয়ানরা বা বাংলার নবজিজ্ঞাসার প্রথম বাহকেরা ছিলেন আপসপন্থী, ব্যক্তিস্বার্থে এবং গোষ্ঠি-স্বার্থের কারণে, সেইজন্য একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্তই মাত্র তাঁরা এই জিজ্ঞাসাকে ভাষা দিয়েছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্য সচেতনতা এবং অধিকাংশ দেশীয় প্রথা সম্পর্কে শ্রদ্ধার পাশাপাশি আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি কিছুটা অনুরাগ, এককথায় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ তাঁদের জীবনে,

---

৭ 'কলিকাতা কমলালয়', (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা-১) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮-৯।

কর্মে এবং আচার-আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রামমোহন বা দ্বারকানাথ বা প্রসন্নকুমার যে কারোরই জীবন এবং কর্ম আলোচনা করলে আমাদের কথার স্পষ্ট সমর্থন মিলবে।

বাংলার নবজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব, আমাদের মতে, প্রধানত মধ্যবিত্ত-নিয়ন্ত্রিত; যদিও বিত্তের আধিপত্য এখানেও অনুপস্থিত ছিল না। নব্যবঙ্গের নায়ক ডিরোজিও শুধু নন, তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীও (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) মধ্যবিত্ত-স্তরভুক্ত। ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রশিষ্যরা তাঁদের জিজ্ঞাসাকে অনেকদূর প্রসারিত করেছিলেন। যে কারণে তাঁদের আত্মসমীক্ষা এবং পাশ্চাত্যভাবের প্রতি মোহ সে যুগে উচ্ছৃঙ্খল আখ্যা পেয়েছিল। অগতানুগতিক পথে চলার জন্য (যা অনেকাংশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবের ফল) সেযুগে তাঁদের অনেক প্রতিকূলতা, অনেক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলার নবজিজ্ঞাসার আর এক নায়ক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এই মধ্যবিত্ত স্তরভুক্ত 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক' ঘরের সন্তান। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের বাহন হল সাময়িক পত্রিকা। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সাময়িকপত্রের আত্ম-প্রকাশ ঘটলে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছু এর আলোচনার বিষয়ীভূত হল। প্রচলিত ধর্মাচার, সামাজিক কুসংস্কার, প্রথাজীর্ণতা ইত্যাদির প্রতি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা ছেড়ে সাময়িকপত্রের মাধ্যমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করল।

এই নবজিজ্ঞাসার বা নবচেতনার প্রাথমিক পর্বে তিনটি অস্ফুট পরিবর্তনের চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত দেবমুখিনতার জায়গায় কিছুটা মানবমুখিতা এল, যা এ-সময়ের বাংলাসাহিত্যেও ছাপ রাখল। সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার অব্যাহত থাকলেও তা ঠিক দেবমুখিতা থাকল না। স্মরণীয়, বৃহত্তর অর্থে যাকে মানবিকতা (humanism) বলা হয়, তার অর্থ যদি করি, বঞ্চিত নিপীড়িত মানবের প্রতি মমতা, তাদের দুঃখ-নিরসনের সচেতন প্রয়াস, তাহলে উনিশ শতকের সূচনায় তাদের কথা কেউ ভেবেছেন, বা তাদের দুঃখ দূর করে মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে আমরা মনে করি না। যে কারণে উনিশ শতকের এই নবজিজ্ঞাসা বাংলার বৃহত্তর জনজীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

যা-কিছু জিজ্ঞাসা, যা-কিছু সংশয়, তা শহর-অঞ্চলের সামান্য সংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, পল্লী-অঞ্চলে তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েনি।

দেবমুখিনতার জায়গায় সাহিত্যে কিছুটা মানবমুখিতা এলেও একথা স্বীকার্য, বহিরঙ্গভাবে ধর্মীয় প্রভাব তখনো অতি বিস্তৃত ও গভীর। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এদেশীয়রা কোনোরকম আপসের একান্ত বিরোধী হওয়ায় কোম্পানি-সরকার তাঁদের রাজত্বের প্রথমদিকে এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাসে কোনোরকম হস্তক্ষেপে ছিলেন অনাগ্রহী। কিন্তু কিছু সচেতন মানুষ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দেববিমুখ না করেও অন্তত কিছুটা মানবমুখী করে-ছিলেন। বিষয়ী রামমোহনের ধর্মচর্চা জীবনবিমুখ ছিল না।

শুধু মানবমুখিতাই নয়, সমাজে কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকারের প্রবণতাও এইসময়ে আমরা লক্ষ্য করলাম। (রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত শুধুমাত্র শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, তাঁদের ব্যক্তিক পরিচয়েই তাঁরা চিহ্নিত।) যার রূপ বিশেষভাবে প্রকাশ পেল এই সময়ের নারীমুক্তি আন্দোলনে। নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু, এবং সেবাদাসী হিসাবে না দেখে সচেতন জনমন তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে প্রয়াসী হলেন। এর পেছনে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত রোমান্টিক মনোবৃত্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও এর ব্যাপকতা স্মরণীয়। তবে এ সময়ে সত্যিই নারীর মানসমুক্তি ঘটেছিল কিনা, এবং তার ব্যক্তিত্ব আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা গভীর সন্দেহের বিষয়। কারণ বিস্তৃত আন্দোলন সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ সমাজ স্বীকার করেনি, বহুবিবাহ অব্যাহত, এবং স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত সীমাবদ্ধ, স্ত্রীশিক্ষা বৈধব্যের সূচক, এই বিশ্বাস প্রায় গোটা উনিশ শতকের বাঙালী মানসিকতারই প্রতিফলন।

অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী বাঙালীর জীবনে এই যে কিছু পরিমাণে যুক্তিবাদ এল, (অন্তত শ্রেণীবিশেষের মধ্যে) তা এ যুগের মানুষকে করে তুলল অনেকটা ইহ-মুখী। একান্ত অদৃষ্টনির্ভরতা ছিল যার স্বভাবধর্ম, সে এইসময় থেকে নিজের অদৃষ্ট নিজেই নির্মাণ করতে চাইল, সহায়ক হল সমসাময়িক পরিবেশ। নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র, রামদুলাল দে ইত্যাদিরা হঠাৎ যেন কুবেরের ধন হাতে পেলেন। এ বিষয়ে দু'একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ১৭৫৭-এ

যে নবকৃষ্ণের মাস-মাইনে ছিল ৬০ টাকা, সেই লোক পরবর্তীকালে মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। যে রামদুলালের কর্মজীবনের সূত্রপাত ৫ টাকা মাইনেয়, সেই লোকই মৃত্যুকালে মাত্র ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রেখে যান! এই ইহমুখিনতা হঠাৎ-নবাবদের প্রাণিত করেছিল প্রমোদে গা ঢেলে দিতে। রামমোহনপন্থীরাও প্রচুর অর্থসম্পদের অধিকারী হয়ে ভোগেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যেমন দুর্গোৎসব) বা পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁদের এই ভোগবাদী জীবনের চিত্রটা স্পষ্ট ফুটে উঠত। অন্যদিকে, এই যুক্তিবাদের প্রভাবে আবার সমাজদেহে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, ধর্মক্ষেত্রে এসেছিল চাঞ্চল্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এই আধুনিকতার অস্ফুট সূত্রপাত, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লক্ষ্য করেছেন, ১৭৫৭-এ পলাশির মাঠে, এক গতিশীল জাতির হাতে স্থিতিশীল আর এক জাতির পরাজয়ের মধ্যে। কলকাতার ইতিহাস-কারও কলকাতার আধুনিকতার সূচনা ধরেছেন ১৭৫৭ থেকে।[৮] আধুনিকতার আলোকপাতে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অচলায়তন কিছুটা বিচলিত হল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এলেন শিক্ষার দীপ জ্বালাবার জন্য অক্লান্তকর্মী যুক্তিবাদী হেয়ার; শ্রীরামপুর মিশনরিরা ধর্মান্তরিতকরণের জন্য তাঁদের কর্ম-প্রয়াসকে বহুমুখী করে তুললেন; প্রচুর বিত্তের অধিকারী, বেদ-বাইবেল-কোরানে স্নাত রামমোহন এসে স্থায়ী বাসা বাঁধলেন কলকাতায়; ১৮১৫-তে ধনীদের মিলনস্থল 'আত্মীয়সভা' বৈদান্তিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায়। ১৮১৭-তে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসা-রোদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'স্কুল বুক সোসাইটি', একই সালে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা;[৯] ১৮১৮-তে ভারতীয়দের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে 'স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব-নবজিজ্ঞাসার উপযুক্ত ক্ষেত্রপ্রস্তুতির সহায়ক হল। অবশ্য এর আগে থেকেই প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আস্থাবান কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত ও কর্মচারী এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধারে, ঐতিহাসিক সচেতনতা সঞ্চারে,

---

৮ '*Calcutta Old and New*', **H. E. A. Cotton, p. 75.**

৯ **'It was, in act, the first collegiate institution of its kind any-where outside of the West'.** ডেভিড কফের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮০।

দেশীয়ভাষার উন্নতিসাধনে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনে, পত্রপত্রিকা প্রকাশে, জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারে ও জনশিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যা এদেশে আধুনিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল, এঁদের মধ্যে কেরী, উইল্‌কিন্স, উইলিয়ম জোন্স, হ্যালহেড প্রভৃতির নাম অতিখ্যাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার এই আধুনিকতা তথা নবজিজ্ঞাসার সূত্রপাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকার কিছু বিশেষ আলোচনা এখানে করে নেওয়া যায়। ইংরেজ-অধিকারের পরও কিছুদিন মুসলমানী রাজভাষা ফারসীর-প্রভাব ও ব্যবহার ছিল অব্যাহত। কিন্তু ধীরে ধীরে আইন আদালত ও ভদ্রসম্প্রদায়ের যোগাযোগরক্ষী ভাষা ফারসীর স্থান নিল নতুন অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজি। ইংরেজ-আগমন এদেশে একদলকে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এনে দেওয়ায় নিজেদের আগ্রহেই বাঙালীরা নতুন রাজভাষা ইংরেজি-শিক্ষায় উৎসুক হয়ে উঠল। ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, ইংরেজ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেনি, এমন কি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা যায়[৯]। কোম্পানির একজন ডিরেক্টার অন্তত আমেরিকায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে সাম্রাজ্য হারানোর বেদনায় ভারতে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাননি। বাঙালীরা নিজেদের গরজেই ইংরেজি শিখেছিল, অবশ্য কিছু মিশনরি ও দরদী ইংরেজের সাহায্য তারা পেয়েছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালীরা আরো বেশি আগ্রহী হল ইংরেজি শিখতে। সে আগ্রহের নমুনা পাই ২৩.৪.১৭৮৯-এ 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত এর বিজ্ঞাপনে।[১০]

কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় অনেক ইংরেজি শিক্ষাদানের স্কুল গড়ে উঠল। যেগুলির শিক্ষাপ্রণালীকে অবশ্য কোনোমতেই বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। ১৭৮০-১৮১৩-র মধ্যে স্থাপিত ইংরেজি শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে

---

১০ *The humble request of Several Natives of Bengal*

'We humbly beseech any gentlemen will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengal country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders ; this favor will be gratefully remembered by us and our posterity for ever.'
'Selections from Calcutta Gazettes' (Vol. II), **W. S. Seton Karr, p. 497.**

উল্লেখযোগ্য মিঃ আর্চারের স্কুল, আমড়াতলায় মার্টিন বাউলের স্কুল, মিঃ ব্রাউনের স্কুল; কবরখানার কাছে,মিঃ জর্জ ফার্লির স্কুল, কসাইটোলা স্ট্রীটে মিঃ হোমসের একাডেমি, মেরেডিথ বিল্ডিংস-এ মিঃ গেনার্ডের স্কুল, মিঃ ফ্যারেলের সেমিনারী, মিঃ ড্রামণ্ডের 'ধর্মতলা একাডেমি', মিঃ ক্যানিং-হামের 'ক্যালকাটা একাডেমি', লসন বিবির স্কুল। এছাড়াও মিঃ হালিফাক্স মিঃ পিট্রাস, মিঃ লিণ্ডস্টেড, মিঃ ড্রেপার, মিঃ শেরবোর্ন ও ডঃ ইয়েট্সের স্কুল ছিল নামকরা।

ইংরেজি স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে বাঙালীরাও পেছিয়ে রইল না। ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেহেতু সমাজে বিশেষ সম্ভ্রম পেতে লাগল, তাই অশিক্ষিতপটু একদল লোকও এই সময় ইংরেজিশিক্ষা বিতরণ করে দু'পয়সা করে নিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ইংরেজিশিক্ষা জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, শুধুমাত্র জীবিকানির্বাহ ও সেইসূত্রে সৌভাগ্যের দ্বার খোলার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিনব উপায়ে ইংরেজি শেখা ও অভিনবভাবে তাকে উপস্থিত করা চলতে লাগল এযুগে। বাঙালীর লেখা ইংরেজি হল সাহেবদের হাসির খোরাক। 'Bengalee English' নাম দিয়ে তা অনেক সময় কাগজেও ছাপা হত। রামজয়-দত্তই সম্ভবত বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। রামকমল সেন রামজয় দত্তের কলুটোলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এইসময় রামনারায় মিশ্রণ (মিত্র ?) আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন (বা ভবানী) দত্ত, শিবু দত্ত ও আরো অনেকে ইংরেজি শেখানোর স্কুল করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যিনি খুব বেশি পড়তেন, তাঁর দৌড় ছিল 'আরেবিয়ান নাইট' পর্যন্ত। যিনি 'রয়েল গ্রামার' পড়তেন, তিনি তো পণ্ডিত শিরোমণি। এযুগে ব্যাকরণ, বাক্যরচনা-প্রণালী ইত্যাদির দিকে বেশি নজর দেওয়া হত না, নজর দেওয়া হত ইংরেজি শব্দ ও তার অর্থ শেখানোর দিকে। যে যত বেশি ইংরেজি শব্দ ও তার অর্থ কণ্ঠস্থ করতে পারত, সে তত বেশি ইংরেজিনবীশ বলে খ্যাতি অর্জন করত। শ্রীরামপুরের মিশনরিরা সে সময় তাঁদের আশ্রিত লোকদের এই বলে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এই ব্যক্তি একশো বা দুশো ইংরেজি শব্দ শিখেছে।

এইজন্য সেযুগে অনেকে ইংরেজি অভিধান মুখস্থ করত। এদেরকে বলা হত 'সচল অভিধান।' সুর করে বাংলা-ইংরেজি প্রতিশব্দ আবৃত্তি করাও সেযুগে ছিল জনপ্রিয়।[১১]

বাংলার বিত্তশালী এবং সচেতন জনগণ ধীরে ধীরে ব্যাপক অর্থে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যার ফলশ্রুতি সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানদের শিক্ষাগার হিন্দুকলেজ, যা একইসঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের উন্মোচক, এবং নিশ্চিত ভবিষ্যৎ-জীবনের সহায়ক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত অভিজাত হিন্দু সন্তানদের এই শিক্ষাগারে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষা, এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্যবিজ্ঞান শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও ঝোঁক সবটুকুই ছিল ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দিকে। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব সূচিত, যা কিছুদিন পরে হয়ে উঠল জ্ঞানার্জনের পর্ব।

এই ধরনের একটি শিক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথম কার মাথায় আসে, অর্থাৎ হিন্দু কলেজের আদিকল্পক কে-এ বিষয়টি বিতর্কিত। আর এই বিতর্কের সূত্রপাত প্রায় শ'দেড়েক বছর আগে থেকেই। এই প্রসঙ্গে তিনটি নাম উচ্চারিত হয়। প্রথমটি ডেভিড হেয়ারের, দ্বিতীয়টি সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি হাইড ঈস্টের, তৃতীয়টি রামমোহন-রায়ের।

অধিক প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ডেভিড হেয়ারই এর আদিকল্পক। তিনি রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'র 'আত্মীয়' বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনার কথা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইড ঈস্টকে জানালে, তিনি উদ্যোগী হয়ে তাঁর বাড়িতে এই উদ্দেশ্যে যে সভা ডাকেন (১৪.৫. ১৮১৬ ও ২১.৫. ১৮১৬), সেখানেই সম্ভ্রান্ত

১১ প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষার মনোরম তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন রামকমল সেন তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানের ভূমিকায়। দ্র. ***'A Dictionary in English and Bengalee' (Vol. I),*** **Ram Comul Sen, preface, p. 16-8.** রাজনারায়ণ বসু ('সেকাল আর একাল') ও শিবনাথ শাস্ত্রী ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ') এক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।

হিন্দুসন্তানদের জন্য একটি শিক্ষাগার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, দেশীয় ব্যক্তিরা এ-ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহায়তায় এগিয়ে আসেন। ২০. ১. ১৮১৭-এ ৩০৪, চিৎপুর রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে ২০ জন ছাত্র ও ৬ জন 'শিক্ষক মনিটর' নিয়ে কলেজের কাজ আরম্ভ হয়।

ডেভিড হেয়ার যে হিন্দু কলেজের আদিকল্পক তা শুধু সমকালীন পত্রিকা ৩০. ৬. ১৮৩০-এর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' ('এস' স্বাক্ষরিত জনৈক ব্যক্তির এই বিষয়ক পত্র সম্পর্কে) সম্পাদকীয় মন্তব্যে, বা ৩. ৭. ১৮৩০-এর 'সমাচার দর্পণে' (এতে হাইড ঈস্টের অবদানও স্বীকার করা হয়েছে), বা ১৮৩২-এর জুন, জুলাই ও অগস্ট সংখ্যা 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভারে' বা ১৮৫২-এর 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এই স্বীকার করা হয়নি, উনিশ-শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই (যেমন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, আলেক-জাণ্ডার ডাফ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, রমেশ দত্ত প্রমুখ) তা স্বীকার করেছেন। এছাড়া পরবর্তী গবেষকদের অনেকেই এই মতে বিশ্বাসী।

সাম্প্রতিককালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কিছু তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ডেভিড হেয়ারকে হিন্দু কলেজের আদি-কল্পকের সম্মান দিতে রাজি হন নি। তাঁর মতে এ বাবদ সমস্ত কৃতিত্বই হাইড ঈস্টের প্রাপ্য।[১২] তিনি এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত ঈস্টের পত্রের (পত্রাবলীর) ওপর। এছাড়াও তিনি ঈস্টের দাবির সমর্থনে ৫টি প্রমাণ দিয়েছেন। এগুলি হল: (১) ২৪. ৬. ১৮৩০-এ 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হিন্দু কলেজের একজন ডিরেক্টরের এ বিষয়ক একটি পত্র, (২) ১. ৭. ১৮৩০-এ 'ক্যালকাটা-গেজেটে' ঐ ব্যক্তিরই পূর্বোক্ত বিষয় সম্পর্কে আর একটি পত্র, (৩) ৪. ৯. ১৮৪৭-এ হিন্দু কলেজের আদিকল্পক সম্পর্কিত প্রশ্নে প্যারীচাঁদ মিত্রকে লেখা রাধাকান্ত দেবের একটি চিঠি,[১৩] (৪) ১৯. ১. ১৮২২-এ 'সমাচার-

---

১২ হিন্দুকলেজের উৎপত্তি ও আদিকল্পক সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের জন্য দ্র. *'On Rammohan Roy'*, Dr. R. C. Majumdar. p. 20-39.

১৩ এই তিনটি চিঠিতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার গৌরব ঈস্টকেই দিয়ে এর উৎপত্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে ডেভিড হেয়ারের সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে।

দর্পণে' প্রকাশিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক ঈস্টের বিদায়-সম্বর্ধনার বিবরণ ও ছাত্রদের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র, যাতে তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লিখিত [১৪], এবং (৫) ৩. ১২. ১৮২৭-এ সুপ্রীম কোর্টে গ্রাণ্ড-জুরিদের কাছে স্যর এডওয়ার্ড রায়ান প্রদত্ত একটি বক্তৃতা।

রামমোহন এদেশবাসীর পাশ্চাত্যশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৮২৩-এ লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক পত্রটি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যদিও এই পত্রটি সরকারী নীতিকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। হিন্দু কলেজের আদিকল্পকের সম্মান রামমোহনের কোনোভাবেই প্রাপ্য না হলেও [১৫] তিনি এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারও তাঁর কাম্য ছিল। ১৮২৪-এ আমেরিকায় রেভারেণ্ড হেনরি ওয়ারকে লিখিত এক পত্রে, এদেশীয় সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে বাংলার জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিখতে দেখলে খুশি হবে, একথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। (অবশ্য ১৮২৪-এ বাংলার জনমনের দিকে তাকিয়ে রামমোহনের কথাকে বিতর্কাতীত বলা যায় না)। এছাড়াও এদেশে ইংরেজের বসতিস্থাপন আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর অন্যতম বক্তব্য ছিল—তার দ্বারা এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার লাভ করবে।

হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত প্রস্তাবটির জন্য রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'য় বলে অনেকের বিশ্বাস। তাঁদের মতে, হেয়ার-পরিকল্পিত এ-বিষয়ক প্রস্তাবটি নিয়ে 'আত্মীয়' বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঈস্টের সঙ্গে দেখা করেন,

---

১৪ অবশ্য এতে কলেজ স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা ঈস্টের মাথায় আসে, এমন কথা বলা হয় নি। বলা হয়, 'আপনি যে হিন্দুকলেজ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমারদিগের বালকদের অনেক উপকার হইয়াছে।' শিবচন্দ্র ঠাকুর পঠিত কলেজ ছাত্রদের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে বলা হয়, 'আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে।' এই সভাতেই তাঁর এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করার কথা বলা হয়। ১৮৩০-এ ঈস্টের এক প্রস্তরমূর্তি কলকাতায় স্থাপিত হয়।

১৫ **'Rammohan had absolutely nothing to do with the establishment of the Hindoo College'. *'On Rammohan Roy,'* Dr. R. C. Majumdar, P. 21.**

এবং ঈস্ট-ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় দেশীয় ধনবান ব্যক্তিরা এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেও, প্রস্তাবিত কলেজ কমিটির সঙ্গে রামমোহনের সংযুক্তি অনেকের আপত্তির কারণ হয়। বৃহত্তর স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে হেয়ারের অনুরোধে রামমোহন হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়ান; যদিও সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির সঙ্গে তিনি ভালো-ভাবেই পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য হিন্দু কলেজে ধর্মীয় সংস্রবশূন্য সাহিত্য-বিজ্ঞানচর্চায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতারই প্রতিফলন।

হিন্দু কলেজের আদিকল্পকের নামের তালিকা থেকে রামমোহনকে বাদ দিলে বাকি থাকে দুটি নাম—হেয়ার ও ঈস্ট। এই দুজনের মধ্যে হিন্দু কলেজের প্রকৃত আদিকল্পক কে-সেবিষয়ে নিশ্চয় করে শেষকথা বলা বোধহয় সম্ভব নয়। লোকপ্রচলিত ধারণা হেয়ারের অনুকূলে হলেও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিক ঈস্টকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। তবে এ-বিষয়ে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে হেয়ারের দিকেই পাল্লা ঈষৎ ভারি বলে মনে হয়। কারণ, হিন্দু কলেজ-সম্পর্কিত ঈস্ট পত্র-পঞ্চকের ঐতিহাসিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়, বরং অনেকস্থলে বিভ্রান্তিকর।[১৬] বিচারপতি ঈস্ট, হ্যারিংটনকে ইংলণ্ডে পত্রগুলি পাঠান, অথচ হ্যারিংটন তখন কলকাতায়! শুধু তাই নয়, ঈস্ট-ভবনে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে আহূত ২১ ও ২৭ মে, ১৮১৬ সভায় তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।[১৭] হিন্দু কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় স্যর হাইড ঈস্টের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে হ্যারিংটনও উপস্থিত ছিলেন। কাজেই কলকাতায় সশরীরে উপস্থিত সুপরিচিত একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যখন ইংলণ্ডের ঠিকানায় চিঠি পাঠানো হয়—তখন ব্যাপারটি রহস্যময় বলে ঠেকে। ঈস্টের বাড়িতে কলেজ-কমিটির সভা হয় বটে, কিন্তু কারো বাড়িতে সভা হলে, বা বাড়িতে সভা ডেকে কোনো প্রস্তাব আলোচনায়

---

১৬ 'হিন্দুকলেজ সম্পর্কিত ইস্ট পত্র-পঞ্চক', সুবর্ণ ঘোষ, অশোকলাল ঘোষ, 'দেশ', ২৭.১, ১৯৭৩ ও ২১. ৭. ১৯৭৩।

১৭ ঐ, 'দেশ', ২৭. ১.১৯৭৩, পৃ. ১২৯৩।

উৎসাহ দেখালে, ঐ প্রস্তাবের আদিকল্পকও ঐ ব্যক্তি হবেন, তার কোনো মানে নেই।

প্রথম কলেজ-কমিটিতে বা ১৮১৯-এর আগে কলেজ-কমিটিতে হেয়ারের অনুপস্থিতির জন্য অনেকে (যেমন রাধাকান্ত দেব) হেয়ারকে হিন্দু কলেজের আদিকল্পকের সম্মান দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু 'নীরব কর্মী' হেয়ার ছিলেন নেপথ্য-নায়ক। নেপথ্যে থেকে নীরবে কাজ করাই ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮১৬-১৭-এ 'ঘড়িওয়ালা' হেয়ারের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাঁর নেপথ্যে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক।[১৮]

এছাড়াও ঈস্ট খুব ভারতহিতৈষী ছিলেন, বা হেয়ারের মতো এদেশের অন্ধকারকে শিক্ষার প্রদীপ জেলে দূর করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এমন কথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। হিন্দু কলেজ সম্পর্কে ঈস্টের ভূমিকা উৎসাহদানের, পরিকল্পনার নয়।

কিন্তু এদেশে শিক্ষাবিস্তারে হেয়ারের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ অল্প। ১৮৩০-এ হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে এ-নিয়ে পত্রপত্রিকায় বাদানুবাদের পালা যখন জমে ওঠে, তখন হেয়ারের প্রতি অবিচারে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'Nemo' স্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এক পত্রে হেয়ারের প্রতি অবিচারের কথা স্মরণ করে হিন্দু কলেজে একটি সাধারণ ফলকে এই কথা ক'টি উৎকীর্ণ করার কথা বলেন,

'The Hindoo College
Owes its existence
To
Hare'[১৯]

ইয়ংবেঙ্গলও হেয়ারকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক মনে করতেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশীয় প্রয়াস, যাকে আমরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সমসাময়িক একটি পত্রিকাতেও তার উল্লেখ দেখি,

---

১৮ *'History of Native Education in Bengal'*, 'The Calcutta Review', Vol. 17, 1852, P. 346.

১৯ *'The Calcutta Monthly Journal'*, June, 1830, P. 116.

'besides the Hindoo Cnllege almost entirely founded on that class of natives whose appellation it bears...'[২০]
হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর বিশেষ সংখ্যায় হেয়ারের জনহিত ও অন্যান্য কার্যকলাপের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়, তিনি 'এতদ্দেশীয় ধনবান্ বাঙ্গালি মহাশয়দিগের সাহায্যে হিন্দুকলেজ স্থাপিত করেন।'[২১] এবং পরবর্তীকালে এর উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করেন।

মূলকথা, হেয়ারের পরিকল্পনা, ঈস্টের আগ্রহে ও দেশীয় ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় রূপ লাভ করে জাতীয় জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে দেশীয় শিক্ষার মান ছিল অতি শোচনীয়। টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তা ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ, স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী এবং চলমান বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। এডাম তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে শিক্ষাজগতের যে চিত্র এঁকেছেন, তা অন্তত গর্ব করার মতো নয়। তখনকার গুরুমশাইদের দারিদ্র্য ছিল অপরিসীম, এবং অজ্ঞতা প্রবাদতুল্য (অবশ্য যথার্থ জ্ঞানসাধকও ছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি)। তাঁদের যা-কিছু পটুত্ব তা ছিল ছাত্রদের নব নব শাস্তিদানের উপায় উদ্ভাবনে (এডাম তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে ১৪ রকম শাস্তিদানের উল্লেখ করছেন, বৈচিত্র্যে এবং নৃশংসতায় সেগুলি তুলনাহীন)। ছাত্ররা গুরুমশাইদের সাক্ষাৎ যম মনে করত। 'তদানীন্তন গুরু মহাশয়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। কোন কোন বালক পাঠশালা হইতে পলায়নকালে ব্যাঘ্র, সর্প, ভূত, প্রেত কিছুরই ভয় করিত না।'[২২] এরকম একটি ঘটনায় দেখি, গুরুমশায়ের ভয়ে একটি ছেলে খেজুর গাছে উঠে পড়েছিল, তাকে নামাবার জন্য অন্য পড়ুয়ারা ইট মারতে লাগলে সে নিরুপায় হয়ে অতি কাতরস্বরে বলে, 'হে ঈশ্বর! যদি তুমি খেজুরের-।

---

২০ '*Calcutta School Society*,' 'The friend of India', October, 1818, P. 194.
২১ '*The Bengal Spectator*', Extraordinary, 14. 6. *1842*. P. 46.
২২ 'আত্মজীবনী', কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, পৃ. ৬৭।

কাঁটায় আমার চক্ষু দুইটি অন্ধ করিয়া দাও, তবে আর আমায় পাঠশালায় যাইতে হয় না।'[২৩] গ্রামাঞ্চলের কথা না হয় বাদই দিলাম, 'স্কুল সোসাইটি'র প্রথম রিপোর্টে দেখি, কলকাতার ১৯০টি বাংলা পাঠশালার ৪,১৮০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানও অতি-শোচনীয়।

এই অবস্থায়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপক অর্থে বাঙালীর কাছে নতুন অর্থ বহন করে আনল। ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য দেখা দিল এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। (১৮২৭-এ ইংরেজি আবশ্যিক শিক্ষা বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজের ৯১ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন ইংরেজি শিখত। অর্থাৎ প্রাচ্যধারার শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্ররাও পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ছিল।) হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে ঐ শিক্ষালাভের সুযোগের আশায় ছেলেরা দৌড়তে আরম্ভ করল, হেয়ারের পক্ষে বালক ও বয়োবৃদ্ধ লোকেদের অনুরোধের ঠেলায় বাড়ির বার হওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল।[২৪] ডাফের পাল্কির দরজা খুলে ছেলেরা কাতরকণ্ঠে ইংরেজি শিক্ষালাভের প্রার্থনা জানাতে লাগল। ডাফের স্কুলের প্রথম ছাত্র-জোগাড় রামমোহনের আনুকূল্যে হলেও, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে স্কুলে ভর্তির ভিড় ঠেকাবার জন্য দ্বারে দুজন দারোয়ান বসাতে হয়েছিল।[২৫] ডাফ অবশ্য একে নিছক জ্ঞানতৃষ্ণা বলেন নি। নতুন বইএর লোভে (যা বিনামূল্যে দেওয়া হত), অলস কৌতূহলে ও নতুনত্বের মোহে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল বদল করত। এ সবের জন্যই ভর্তির এত চাহিদা ছিল।[২৬] একথা স্বীকার করে নিয়েও এইসময় বাঙালীদের মধ্যে যে জ্ঞানতৃষ্ণা জেগেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং তার জন্য এই উন্মাদনা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে,[২৭] তাই কলকাতা হয়ে উঠল নবজিজ্ঞাসার পীঠস্থান, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়, নতুন যুগের শহর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় যা 'মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে' পরিপূর্ণ।

---

২৩ 'আত্মজীবনী', কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, পৃ. ২৩।

২৪ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৪৬-৭।

২৫ '*India and India Missions*', A. Duff, P. 527.

২৬ ঐ, পৃ. ৫২৭-৮।

২৭ ১৮৩১-এ ডিরোজিওর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' হাজার তিনেক দেশীয় তরুণ ইংরেজি-

হিন্দু কলেজের মূল কমিটির ৩০ জন সদস্যের মধ্যে হাইড ঈস্ট হলেন সভাপতি, হ্যারিংটন সহ-সভাপতি। বাকি ২৮ জনের মধ্যে ৮ জন ইউরোপীয় সদস্যের কথা বাদ দিলে (স্মরণীয়, কমিটি গঠনের তিন সপ্তার মধ্যে ইউরোপীয় সদস্যরা পদত্যাগ করেছিলেন।) অন্য ২০ জনই ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু, এবং অনেকের বিত্তের খ্যাতি বহুবিস্তৃত। (এই ২০ জন দেশীয় সদস্য হলেন চতুর্ভুজ ন্যায়সূত্রী (ন্যায়রত্ন?) সুব্রহ্মমহেশ শাস্ত্রী (সুব্রহ্মণ্য-শাস্ত্রী?), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরতন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল।) [২৮] এইসব বিত্তবান রক্ষণশীলের দল এদেশীয় রীতিনীতি ও আদর্শে সম্পূর্ণ আস্থাবান হয়েও, পাশ্চাত্য শিক্ষাধারাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। উত্তরপুরুষের ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের পথকে সুগম করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নাম কেনার জন্য তাঁরা সহায়তা করে-ছিলেন সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের অভিজাত শিক্ষাগার হিন্দুকলেজ স্থাপনে (যদিও জন্মলগ্নের পর কলেজের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রথম পর্বে [১৮১৭-২৩] তাঁদের নিস্পৃহতা বিস্ময়কর, তাঁরা এটিকে সম্পূর্ণ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেন নি, তাই একে বাঁচানোর জন্য সরকারী সাহায্য হল অপরিহার্য, এবং ১৮২৪-এ সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে উইলসন যুক্ত হলেন কলেজটির সঙ্গে। যাঁকে অনেকে হিন্দু কলেজের পুনর্জন্মদাতার গৌরব দিতেও কুণ্ঠিত নন। তিনি শিক্ষার সময় দ্বিগুণ করে, কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, নব নব যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করে, কলেজের আর্থিক ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে, তাকে তার নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে

শিক্ষার্থীর কথা জানায়, এবং এই সংখ্যা যে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাও। দ্র. '*Examination of a Native School*', reprinted from 'The East Indian', 'The India Gazette,' 2. 9.1831. ১৮৩১-এই কৃষ্ণমোহনের 'এনকোয়েরারে' প্রকাশিত একটি লেখায় শুধুমাত্র কলকাতা অঞ্চলেই দু'হাজারের বেশি যুবকের ইংরেজি শিক্ষালাভের কথা বলা হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ীই ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ১০টি ইংরেজি স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৮৬৮। দ্র. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), পৃ. ১৩৩।

২৮ '*History of Native Education in Bengal*', 'The Calcutta Review', Vol.17. 1852, P. 346.

দিলেন। এ সব ব্যবস্থার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা পৌঁছল ৪০০-তে); কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে তাঁরা সম্ভবত অবহিত ছিলেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের চেয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাজনিত সামাজিক সম্ভ্রম ও বিত্তার্জনের প্রত্যক্ষ ফলের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করে বিত্ত ও খ্যাতি অর্জন, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আদর্শের প্রতি অন্তত মৌখিক নিষ্ঠা বজায় রাখা, এই ছিল তাঁদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। এই স্বপ্নের প্রতিফলন কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থলের 'হিন্দুকলেজ' নামকরণে-কলেজের ছাত্রেরা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত 'হিন্দু' হবেন, এই ছিল তাঁদের কামনা।

কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে যেতে লাগল, যার সূত্রপাত করলেন হিন্দু কলেজে 'রীতিমতো' ইংরেজি-শিক্ষিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-স্নাত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী একদল হিন্দু তরুণ। অবশ্যই এই ভাঙনের রূপ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বছরের তরুণ ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির পর থেকে স্পষ্টাকারে দেখা দিল। তার আগে পর্যন্ত, অন্তত আমাদের মনে হয়, পাশ্চাত্য-জ্ঞান-বিস্তারের যে উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। এই আদর্শগত ভাঙন, এবং সেই সূত্রে বাঙালী তরুণ-দের নবজিজ্ঞাসার নেতৃত্ব দিলেন কলেজেরই তরুণ শিক্ষক পূর্বোক্ত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। বেকন, হিউম, আডাম স্মিথ, টমাস ব্রাউন, জেরেমী বেন্থাম, ডুগাল্ট স্টুয়ার্ট, টম পেন, লক, রীডের যুগান্তকারী চিন্তাধারা (এগুলি হিন্দু কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও ডিরোজিও কলেজের শ্রেণীকক্ষের বাইরে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের এইসব প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে-ছিলেন।) সমকালীন বিশ্বের চলমান ঘটনাস্রোত (ফরাসীবিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব) ইত্যাদির সঙ্গে ব্যাপক পরিচিতি হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্রের মনে যুগপ্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের জন্ম দিল, অনেক জিজ্ঞাসা তাঁরা তুলে ধরলেন, যার প্রচলিত উত্তর অন্তত তাঁদের নবার্জিত যুক্তি-বোধের সঙ্গে মেলে না। তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির প্রতি তাঁদের আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণের পালা শুরু হল। তাঁদের এই আক্রমণ অনাচারাশ্রয়ী নয়, পাশ্চাত্য আদর্শাশ্রয়ী, যদিও

সমকালীন সমাজপতিরা একে চিহ্নিত করেছিলেন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনাচার বলে। (প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শুধু বয়সেই নয়, অনাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দিক দিয়েও হিন্দু কলেজের নব্য-তরুণদল সেকালীন অধিকাংশ বিত্তবান রক্ষণশীল সমাজপতির পুত্র বা পৌত্রতুল্য!) এই ভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলার নবজিজ্ঞাসা নতুন যে পথে যাত্রা শুরু করল, শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্র-বন্ধুরা সেই পথেরই প্রথম পথিক দল।

২. ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল

উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার সমাজজীবনে (প্রধানত কলকাতায়) অগতানুগতিক পথে চলে রামমোহন কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, বিত্তবান সমাজপতিদের দু'চারজন ছাড়া (যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর. কালীনাথ রায় প্রভৃতি) আর বিশেষ কেউই তাঁর ভূমিকাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন নি। ইউরোপীয় চরিত্রে ঘোরতর আস্থাবান, ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত রামমোহন, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই, সমাজের সবকিছুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চাননি। প্রথা, আচার ইত্যাদিকে পুরোপুরি অস্বীকার না করেই তিনি কিছুটা নতুন পথের সন্ধানী। সংস্কারে বিশ্বাসী হলেও, উগ্রপন্থায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই প্রতীকোপাসনার বিরোধী রামমোহন আজীবন সযত্নে ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক উপবীত ধারণ করেছেন, সতীদাহের বিরুদ্ধবাদী হয়েও বেণ্টিঙ্কের আইন করে এ প্রথা রদ করার ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেন নি, ইংরেজশাসনের কল্যাণকর দিকটি বারবার তুলে ধরলেও, তার শোষণের রূপ সম্পর্কে থেকেছেন নীরব।

ব্যক্তিজীবনে এবং বহির্জীবনের কর্মক্ষেত্রে আপসপন্থী রামমোহন যখন এইভাবে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলেছেন-এমন এক সময় ১৩মে, ১৮২৬-এর 'সমাচার দর্পণে'র এককোণে 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে হিন্দু কলেজ সংক্রান্ত যে সংবাদটি পুনর্মুদ্রিত হয়, তাতে আরও অনেক কথার সঙ্গে 'ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি. রোজী সাহেব এই দুইজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন',[১] এই 'অতিতুচ্ছ'-

[১] 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম) (৩য় সংস্করণ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩২।
হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগ তারিখ শিবনাথ শাস্ত্রী, টমাস এডওয়ার্ডস প্রভৃতিরা ১৮২৮ বলে উল্লেখ করেন। প্যারীচাঁদ-ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহনের জীবনীকার-

ঘটনাটিও উল্লিখিত হয়। হিন্দু কলেজে নবনিযুক্ত 'ডি. রোজী সাহেব' নামক এই শিক্ষকটি সমসাময়িক আরও অনেক শিক্ষকের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন না, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শিক্ষার গুণে আপসপন্থী বাঙালী-সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠল। ডিরোজিওর আসার আগে বছর দশেক ধরে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা পাশ্চাত্যশিক্ষিত হয়েও, নিজেদের প্রথা, আচার, কুসংস্কার সম্পর্কে একটুও আস্থা হারিয়ে না ফেলায় তদানীন্তন সমাজ-পতিরা নিশ্চিন্তমনে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন (যদিও কলেজ-কমিটির অন্যতম সদস্য রসময় দত্ত স্পষ্টত এর কার্যকারিতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, গত সাত বছরে [১৮১৭-২৩] কলেজ কিছুসংখ্যক কেরানী সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি।[২]), কিন্তু নবনিযুক্ত এই তরুণ শিক্ষকটি তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেন না। ডিরোজিওর নিযুক্তির পর হিন্দু কলেজের সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ দিনগুলি আর রইল না। এল নতুন দিন।

ড্রামণ্ডের পাঠশালায় শিক্ষিত, সদাগরী অফিসের প্রাক্তন কেরানী, 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সহকারী সম্পাদক, সদ্য ভাগলপুর প্রত্যাগত উদীয়মান তরুণ-কবি ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষক হিসাবে হিন্দু কলেজে যোগদান করে একদল বুদ্ধিদীপ্ত উৎসাহী স্বপ্নদর্শী তরুণকে পেলেন ছাত্র হিসাবে, যাঁদের মন গ্রহণ করতে উৎসুক। তাঁদের মধ্যে তিনি জ্ঞানস্পৃহা জাগালেন, উদ্বুদ্ধ করলেন নিজস্বভাবে চিন্তা করতে। হিন্দু-কলেজে যে নতুন আলোর যুগ এল, সে যুগের ঐতিহাসিক নায়ক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ঈষৎ বিদ্যাভিমানী কিন্তু হৃদয়বান এই তরুণটির প্রেরণায় বাঙালী-যুবকেরা যুক্তিবাদী হয়ে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখেছিল। সত্যের-

---

রামচন্দ্র ঘোষ, এমনকি ডিরোজিও-জীবনীকার এডওয়ার্ডস তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র ১৮২৭-এ হিন্দু কলেজে তাঁর নিয়োগকাল বলেছেন। কেউ কেউ আবার (যেমন মেজ, বা ১৮৫২-তে 'ক্যালকাটা-রিভিউ'-এ 'History of Native Education in Bengal'-এর লেখক) তাঁর নিয়োগকাল বলেছেন নভেম্বর, ১৮২৬। অনেকে ১৮২৯ বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। এ বিষয়ে সকল সংশয়ের অবসান ঘটায় 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত সংবাদটি। ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হবার পরও যখন শ্রীসুশোভন সরকার, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, ডেভিড কফ প্রভৃতিরা হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগকাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন, তখন ধরে নিতে পারি, ব্রজেন্দ্রনাথ পরিবেশিত সংবাদটি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে।

২ '*History of Native Education in Bengal*', '**The Calcutta Review**', **Vol 17, 1852, P.349.**

প্রতি তাঁদের এমন শ্রদ্ধা জাগল যে, কলেজ ছাত্রদের সত্যবাদিতা প্রবাদোপম হয়ে দাঁড়াল; 'কলেজ বয়' শব্দটি সেযুগে সত্যের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩] ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩১-এ 'দি 'পার্সিকিউটেড' নাটকে লিখলেন, সত্যের চেয়ে পিতার কান্নাও বলবান নয়।[৪] রামগোপাল ঘোষ তাঁর পিতার শত অনুরোধেও মিথ্যা বলতে অস্বীকার করে সেযুগে সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে তাঁরা সত্য ও যুক্তির পূজারী হয়ে উঠলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনাচার, বীভৎসতা এবং হিন্দুসমাজের সর্বাঙ্গে ক্ষয়ের চিহ্ন তাঁদের চোখে পড়ল। নবার্জিত যুক্তির সাহায্যে তাঁরা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে, সামাজিক সংস্কারকে আক্রমণ করলেন। যা পারেন নি রামমোহন, তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার জন্য, তাই করলেন ডিরোজিওর ছাত্রশিষ্যদল। পৈতে ত্যাগ করলেন; পোপ ড্রাইডেনের কাব্য জায়গা নিল গায়ত্রীর; বিভিন্ন মন্ত্রের প্যারডি তৈরি হল; স্বার্থলোভী গুরু-পুরোহিতের ওপর এল ঘৃণা, হিন্দুধর্মনিষিদ্ধ আহারে হল রুচি! সবমিলিয়ে হিন্দু কলেজে এল এক নতুন যুগ, যাকে প্রায় সমকালীন একটি পত্রিকায় 'the Derozian Period of the College' বলে অভিহিত করা হয়।[৫] ডিরোজিও যে হিন্দু কলেজে নবযুগ প্রবর্তক একথা কিশোরীচাঁদ-মিত্রও স্বীকার করেছেন।

শুধু হিন্দু কলেজে রুটিনমাফিক ক্লাস নিয়ে, আর সেখানে দু'চারটে বড় বড় জ্ঞানগর্ভ কথা বলেই ডিরোজিও নিঃশেষিত হয়ে যান নি। ১৮২৮-এই তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন 'একাডেমিক এসোসিয়েশন।' সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় সবকিছু বিষয় নিয়ে খোলামনে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করার একটি সভা। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান এখানে প্রয়োগের সুযোগ পেতেন। পাক্ষিক এই সভাটির সভাপতি হলেন ডিরোজিও,

৩ '*Henry Derozio*', **Thomas Edwards, P.68.**

৪ 'A father versus truth ..No a father's cries are not stronger than those of truth.' '***The Persecuted***', Krishna Mohana Banerji, Act 2/Scene 2.

৫ 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র', ৫.৬. ১৮৩৩, যোগেশচন্দ্র বাগলের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'য় উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৮।

সম্পাদক উমাচরণ বসু। ডিরোজিওর তরুণ বন্ধুরা ছাড়াও কর্নেল বীটসন, ডেভিড হেয়ার, স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, ডঃ মিল এ-সভায় যোগ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। গিবন, এডাম স্মিথ, জেরেমী বেস্থাম, নিউটন, ডেভি, হিউম, টম পেন, লক, রীড, স্টুয়ার্ট, ব্রাউন থেকে আরম্ভ করে বায়রন, স্কট, এমনকি স্কচ কবি রবার্ট বার্নসও আলোচনার সূত্র ধরে এসে পড়তেন। সভার কাজও অগতানুগতিক ভাবে চলত। রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র লেখক 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'কে কেমব্রিজ অক্সফোর্ডের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র-সভাগুলির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ সবকিছু নিয়ে আলোচনা হলেও আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দুধর্ম ও তার গোঁড়ামি। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর সভায় হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা ডিরোজিওর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতেন, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!'[৬] এবং এইসব সভালোচিত জ্ঞানবস্তু ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিতে পারে এই আশঙ্কায় অনেক দেশীয় ব্যক্তি সন্তর্পণে এসব সভার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেন।[৭] ১৮২৯-এই 'একাডেমিক-এসোসিয়েশন'-এর আদর্শে আরো ক'টি সভা গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় বা ইউরেসীয়ানরা এইসব সভার পরিচালক ছিলেন। ১৮৩০-এ অন্তত ৭টি এ ধরনের সভার অস্তিত্ব ছিল। এগুলির অধিকাংশের অধিবেশনই বসত সপ্তায় একবার, কোনো-কোনোটির পাক্ষিক বা মাসিক অধিবেশনও হত; সভ্যসংখ্যা ১৭ থেকে ৫০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাহিত্য, সমাজ, বিজ্ঞান, রাজনীতি ছিল এগুলির আলোচ্য বিষয়। স্মরণীয়, এইসব সভাগুলির সঙ্গে ডিরোজিও কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাঙালী যে জাগছে, জ্ঞানের আলো যে কুসংস্কারকে চিহ্নিত করছে, প্রথাজীর্ণতার বিরুদ্ধে সে যে সচেতন হয়ে উঠছে, এইসব সভাগুলি তারই পূর্বাভাস। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' মূলত ধর্মীয় সভা, 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'কে বলতে পারি বাংলার প্রথম বিদগ্ধ সভা।

৬ *'Recollections of Alexander Duff,'* **Lal Behari De, P.30.**

৭ *'The Cal. Gazette & Commercial Advertiser'*, **13.4.1829.**

একদিকে যখন সভা-সমিতিগুলিতে তরুণ যুবকদল বিভিন্ন আলোচনায় মুখর হয়ে উঠে সমাজে সাড়া জাগিয়েছেন, অন্যদিকে তখন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ক অনেক বিচার-বিবেচনা করে, বহু গোপন তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করে প্রণয়ন করলেন সতীদাহ নিবারক আইন। সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠল, প্রতিবাদ উঠল বিদেশী শাসক কেন আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবেন, এমনকি যাঁদের বংশে সতীপ্রথা প্রচলিত ছিলনা, তাঁরাও (যেমন রাধাকান্ত দেব) প্রতিবাদ জানালেন এই আইনের বিরুদ্ধে। ১৭. ১. ১৮৩০-এ প্রতিষ্ঠিত হল 'ধর্মসভা', হিন্দুধর্মের সবরকম আচার-আচরণকে সমর্থনের মনোভাব নিয়ে।[৮] সতীপ্রথার অবসানে ডিরোজিওর মনোভাব প্রকাশ পেল একটি কবিতায় ('On the abolition of suttee')।[৯] 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর সভায় ধরে নিতে পারি তিনি তাঁর ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আপীল করলেন বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে। রামমোহন দিল্লীসম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পেয়ে, তাঁর বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধিকল্পে, এবং সেইসঙ্গে সতী আইনের পক্ষে ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতে চার্টারের নবীকরণের পূর্বেই যাত্রা করলেন ইংলণ্ডে। মধ্যপন্থী রামমোহনের দিন শেষ হল, এল নতুন দিন-উগ্রপন্থী ইয়ংবেঙ্গলের দিন।

রামমোহনের বিলাতযাত্রার পর বাংলার সমাজজীবনে নতুন করে আঘাত হানলেন ডিরোজিওর তরুণ ছাত্রদল (১৩ মার্চ, ১৮৩০ 'সমাচার-দর্পণে' 'জাবনিক রুচিভক্ষণ'[১০] শীর্ষক সংবাদে হিন্দু কলেজের একজন

৮ 'ধর্মসভা'র প্রধান ব্যক্তিরা ছিলেন, রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত-দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজা কালীকৃষ্ণ-বাহাদুর, আশুতোষ দে, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক (ধনরক্ষক), নীলমণি দে এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভা-সম্পাদক)। এঁদের একাধিক জন হিন্দু কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

৯ ৮.১২.১৮২৯-এ রচিত এই কবিতাটির প্রথম প্রকাশ সম্ভবত 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'। ডিসেম্বর, ১৮২৯-এ 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নালে' ও ১৪.১২.১৮২৯-এর 'ক্যালকাটা গেজেটে' কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। জার্নাল-সম্পাদক কবিতাটি প্রকাশের সুযোগ দেবার জন্য ডিরোজিওকে ধন্যবাদ জানান।

১০ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৫-৬।

ছাত্রের মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানে গিয়ে বিস্কুট কিনে খাবার ঘটনা নিয়ে 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মধ্যে বাদানুবাদের কথা প্রকাশ করা হয়)। [১১] যে প্রস্তুতি চলছিল হিন্দু কলেজের শ্রেণীকক্ষে, ডিরোজিওর ভবনে, 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর সভায়, যেখানে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন নিজস্বভাবে চিন্তা করতে, পাপকে ঘৃণা করতে। সেইসঙ্গে তাঁদের সামনে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছিলেন। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা শুধুমাত্র কলেজের পাঠ্যসূচীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পরিচিত হচ্ছিলেন হিউম, গিবন, এডাম স্মিথ, বেস্থাম, লক, রীড আর টম পেনের চিন্তাধারার সঙ্গে এবং হয়ে পড়ছিলেন বিস্মিত, এত কিছু জানার আছে জেনে অভিভূত। এই জানার আবেগেই আমেরিকা থেকে জাহাজে আসা টম পেনের 'এজ অব-রীজন' কাড়াকাড়ি করে তাঁরা কিনতেন, এমনকি পাঁচগুণ দাম দিয়েও। (টম পেনের 'এজ অব রীজন' 'সমাচার দর্পণ' ও জনৈক মিশনরি হডসনের ভাষ্য অনুযায়ী এদেশে প্রায় ১০০ কপি এসেছিল, এবং ১ টাকার বই ৫ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার ডাফ এবং তাঁর জীবনীকার জর্জ স্মিথের মতে এই সংখ্যা ১০০০, ১ টাকার বই ৮ টাকায় বিক্রী হবার কথা বলেছেন তাঁরা। চাহিদা দেখে আমেরিকার এক প্রকাশক পেনের রচনাবলীর এক সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।)

স্বভাবতই এই নতুন জ্ঞানের আলো তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছিল, লালবিহারী দের ভাষায়, 'They began to reason, to question, to doubt।' [১২] ডিরোজিওর এইসব তরুণ ছাত্রবন্ধুদের মনে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সবকিছুই খারাপ এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হল। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তাঁদের কাছে হিন্দুধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্যবস্তু [১৩] (যদিও তাঁর পরিচালনাধীন স্কুলের নাম ছিল 'হিন্দু ফ্রি স্কুল!') তাঁদের এই মনোভাব যে সেযুগে সমাদৃত হয়নি, বলাই-

১১ এর আগে অবশ্য ২২.১.১৮২৫-এর 'সমাচার দর্পণে' 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে 'বালকের-ইংরাজী পোষাক' শীর্ষক একটি সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হয়, যদিও এর তাৎপর্য ১৩.৩.১৮৩০-এর সংবাদটির ন্যায় গভীর ও দূরপ্রসারী নয়।

১২ '*Recollections of Alexander Duff,*' **L. B. De, P. 28.**

১৩ '*Hindu Free School*', **'The India Gazette', 1.10.1831.**

বাহুল্য। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র নাস্তিক হয়ে উঠলেন, ধর্মীয় সকল ব্যাপারেই তাঁরা হয়ে উঠতে লাগলেন অল্পবিস্তর যুক্তিবাদী।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেই হিন্দু কলেজ ছাত্রদের অগতানুগতিক আচরণ যে সংবাদপত্রের বিষয়ীভূত হয়েছিল, তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এই সময়ই তাঁরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন 'পার্থেনন' নামে [১৪] (১.৯. ১৮৪২-এর 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ 'পারথিয়ন' নামে উল্লিখিত), যার প্রথম সংখ্যায় তাঁরা সগর্বে ঘোষণা করলেন, জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও শিক্ষায় ও আচার-আচরণে তাঁরা ইউরোপীয় চরিত্রের অনুবর্তী। তাঁদের মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন হিন্দু সমাজপতিরা (রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এটির প্রকাশ বন্ধের দাবি করা হয়) এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল পত্রিকাটির ওপর, এমনকি দ্বিতীয় সংখ্যা যা মুদ্রিত হয়েছিল, তাও কারো কাছে পাঠাতে দেওয়া হয়নি। প্রথম সংখ্যাতেই 'পার্থেনন' এর সূচনা এবং সমাপ্তি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শুধু রক্ষণশীলরাই নয়, এমনকি ইউরোপীয় স্বার্থরক্ষী পত্রিকা 'জনবুল'ও, হিন্দুকলেজের ম্যানেজারদের এই আচরণকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'Their Parents and guardians have acted wisely in putting down such mischievous precociousness.' [১৫] অবশ্য এত-সব করেও ডিরোজিও-শিষ্যদের 'সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত' হয়নি, এবং তা লক্ষ্য করে সমাজপতিরা আরো বেশি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় 'হিন্দু কলেজছাত্রস্য পিতুঃ' স্বাক্ষরিত পত্রে [১৬] পত্রলেখক লেখেন, কলেজে দেবার আগে তাঁর ছেলেটি বেশ শিষ্ট শান্ত ছিল, কিন্তু 'পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক...।' অন্যান্যরা আবার এর-

১৪ 'ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম ও গবর্নমেন্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল...।' 'ধর্মসভার গত বৈঠক', 'দি বেঙ্গল স্পেকটেটর', ১.৯.১৮৪২, পৃ. ৮১।

১৫ **Excerpt from 'John Bull' reprinted in the 'Asiatic Journal', Vol. 3. Sept-Dec, 1830, P.5. Quoted in *'Awakening in Bengal'* (Selected-Documents, Vol. 1), Ed. Goutam Chattopadhyay, preface, P. xxii.**

১৬ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৩১-২।

ওপর 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে, পিতা ও পিতৃব্যদিগকে নির্বোধ কহে⋯ইংরাজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি।' এসব দেখে-শুনে উক্ত পিতা ছেলের কলেজ যাওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, 'কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না⋯।' এইরকম ভিন্ন দেশীয় শাস্ত্র উপাসনা ও আচার-আচরণের ফলে হিন্দু কলেজ থেকে হিন্দু নাম লোপ পাবে, এ আশঙ্কা শুধু একজন পিতারই নয়, তখনকার বহু পিতারই মনে দেখা দিয়েছিল।

২২ জানুয়ারি, ১৮৩১ 'সমাচার দর্পণে' 'কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ' স্বাক্ষরিত পত্রে[১৭] চন্দ্রিকাকারের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবকে কটাক্ষ করে বলা হয়, কলেজ স্থাপনের পূর্বে 'এতদ্দেশীয় কয়েকজন বাঁকা বাবুরা তাহারদিগের স্ব ২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন ২ অবৈধ কর্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি কি রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন⋯।' পত্রলেখক আরো লেখেন, হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্বে এদেশের সম্ভ্রান্তলোকের ছেলেদের মধ্যে যাঁরা বহু কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করে ইংরেজি শিখেছিলেন, তাঁরা স্বীকার করেন, কলেজের ছাত্ররা অল্পদিনে ইংরেজিতে যেরকম পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু কলেজ প্রভৃতি কয়েকটা পাঠশালা স্থাপিত হওয়ায় 'উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না, বরং হিন্দুবালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান.হইতেছেন এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।' সেযুগে সবাই যে কলেজ-ছাত্রদের জ্ঞানস্পৃহা বা অগতানুগতিক আচার-আচরণে বিরক্ত হন নি, দু'চারজন যে একে স্বাগত জানাতেও প্রস্তুত ছিলেন, পত্রটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু তরুণদল যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, নানাভাবে তার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছেন, তখন ৫মে, ১৮৩১ 'সমাচার চন্দ্রিকা' ঘোষণা করল, 'চার-পাঁচশত বালক হিন্দু কালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরি-দিগের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্মকর্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাঁহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত আছেন

১৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৩-৫

তাঁহারদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক না…।'[১৮] হিন্দুধর্মবিরোধী আচার-আচরণ যে চন্দ্রিকাকারকে পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, লেখাটির সুরেই তা ফুটে উঠেছে। চন্দ্রিকা-সম্পাদক নাস্তিকতা রোধে সরকারী হস্তক্ষেপও অবাঞ্ছনীয় মনে করেন নি।[১৯]

১৪মে, ১৮৩১-এর 'সমাচার দর্পণে'[২০] 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে 'কস্যচিৎ-কালীকিঙ্করস্য' পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে জনৈক হিন্দু কলেজ-ছাত্রের অভিনব আচরণ প্রকাশিত। কলকাতার এক গৃহস্থ তাঁর ছেলেকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর ছেলেটি কালীকে প্রণাম না করে 'কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মার্ণিং ম্যডম্।' পুত্রের এরকম আচরণে পিতা আক্ষেপ করে বলেন, 'ওরে আমি কি ঝকমারি কর্য়ো তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি একঘর্য়ো হইয়াছি ধর্মসভায় যাইতে পারি না।' হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যে নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে ওঠেন নি, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এবং সেজন্যই ১৬ জুলাই, ১৮৩১ 'সমাচার দর্পণে'[২১] 'সংবাদ-প্রভাকর' থেকে 'হিন্দু কালেজ' শীর্ষক যে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়, তাতে হিন্দু-কলেজের 'মেম্বর মহাশয়দিগের' কাছে নিবেদন জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন ক্লাস-মাস্টার ও পণ্ডিত মহাশয়দের এই মর্মে আজ্ঞা দেন যাতে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ফিরিঙ্গির মত পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণের অনুসরণ না করেন, এবং তার পরিবর্তে 'মাথা কামায়, ফিরিঙ্গি জুতা পায় দিতে না পায়, উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায়, মালা দেয় গলায়, অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায়, তিলকসেবা করে, ত্রিকচ্ছ কর্য়ো, ধুতী পরে, ঈশ্বরের গুণানুকীর্তনে সর্বদা রত হয়, কাছা-খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করে জল লয়। ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলে-দিগের হিন্দুর মত দেখায়…।' এবং কেউ এ রীতি লঙ্ঘন করলে তার নাম কেটে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। 'সমাচার দর্পণ' এই সব ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেও 'প্রস্রাবত্যাগের রীতির সুনিয়মকরণে' কলেজের কি মঙ্গল হবে বুঝতে পারে নি। 'সমাচার চন্দ্রিকা' আর সেকালীন-

---

১৮ 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৫.৫.১৮৩১।

১৯ ঐ, ৯.৫.১৮৩১।

২০ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৭-৮।

২১ ঐ , পৃ. ২৩৮।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় তৎকালীন রক্ষণশীল মনোভাবই ফুটে উঠেছে। এসব যখন লেখালিখি হচ্ছে, তখন কিন্তু 'সকল গণ্ডোগোলের মূলাধার' ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত। তিনি না থাকলেও তাঁর যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব বিকাশক শিক্ষাধারা তরুণদের মন থেকে পদ্মপাতায় জলের মতো মুছে যায়নি।

ছাত্রদের এই প্রচলিত রীতিনীতিতে অনাস্থা, হিন্দুদেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি অভক্তি, খাদ্যাখাদ্যে বিচারহীনতা বিদেশীয় চালচলনের অনুসরণ-এ সবই হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আচরণে যে পরিবর্তন আসুক না কেন, তাঁর জীবিতকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুরা ধর্মীয় দিক দিয়ে কিছুটা সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে ফেললেও, আমাদের স্থবির সমাজ-জীবনে প্রাণচাঞ্চল্যের প্রথম জোয়ার আনেন তাঁরই ছাত্রশিষ্যরা। এবং তার মূল্য ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবন্ধুদের দিতে হয় বেশ ভালোভাবেই। শিক্ষক ডিরোজিওর কৃতিত্ব তিনি একটা গোটা তরুণগোষ্ঠীকে অন্যায়, কুসংস্কার, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করেছিলেন, আহত হয়েছিলেন, অনেকে গুরুর মৃত্যুর পর পথ হারিয়ে-ছিলেন, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁরা আমাদের কাছে যৌবনের প্রথম দূত!

হিন্দুধর্মবিরোধী এই পরিবেশে গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরি আলেকজাণ্ডার ডাফ ২৭ মে, ১৮৩০-এ এসে উপস্থিত হলেন কলকাতায়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার ফল তখন বাঙালী তরুণসমাজে প্রত্যক্ষ, যা দেখে তিনি একই সঙ্গে উল্লসিত ও কিছুটা শঙ্কিত হলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ডাফ পূর্ববর্তীদের ব্যর্থতার কারণ উপলব্ধি করে হিন্দুধর্মের মূলে আঘাত করতে প্রস্তুত হলেন। এদেশে এসে তিনি, মিশনরিদের কাছে 'দি প্রিসেপ্টস-অব যেশাস'-এর লেখক হিসাবে 'কুখ্যাত' রামমোহনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রামমোহন ডাফকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন, তাঁর স্কুলের জন্য বাড়ি দেখে দেওয়া, ছাত্র জোগাড় করা-সব কিছুই তিনি করলেন। ১৩ জুলাই, ১৮৩০ বেলা দশটায় ডাফ স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণরা বাইবেল পাঠের ব্যাপারে আপত্তি জানালে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'উইলসনের মতো খ্রীষ্টান হিন্দু-

শাস্ত্র পড়েও হিন্দু বনে যাননি। আমি নিজে একাধিকবার কোরান পড়েছি; কিন্তু তার জন্য কি আমাকে মুসলমান হতে হয়েছে? এমন কি, বাইবেল পড়েও আমি খ্রীষ্টান হইনি। তাহলে, তোমরা তা পড়তে ভয় পাচ্ছ কেন? পড়ো, কি আছে জানো, এবং তারপর নিজেরা তার বিচার কর।'[২২] তাঁর কথায় অধিকাংশ প্রতিবাদকারীই শান্ত হয়। পরবর্তী একমাস তিনি রোজ বেলা দশটায় বাইবেল-পাঠের সময় স্কুলে উপস্থিত থাকতেন, এবং তারপরেও প্রায়ই সেখানে যেতেন।

কলকাতা এসে ডাফ দেখলেন ক্ষেত্র প্রস্তুত, হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা সর্বপ্রকার কুসংস্কার বিরোধী, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁরা অপ্রসন্ন। শুরু হল ডাফের ধর্মপ্রচার অভিযান। তাঁর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে তিনি 'Evidences and Doctrines of Natural and Revealed Religion' নামে খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত এক বক্তৃতামালার আয়োজন করলেন। বক্তা চার গোঁড়া মিশনরি ডাফ, এডাম, হিল ও ডিয়েলট্রি। লক্ষ্য-হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদল। ১৮৩০-এর অগস্ট মাসে এই বক্তৃতামালার ভূমিকাস্বরূপ প্রারম্ভিক ভাষণটি দিলেন মিঃ হিল, সারা শহর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের এই সভায় যোগ দিতে উৎসাহিত করলেও ডেভিড হেয়ার ছিলেন এর বিপক্ষে, শিক্ষাক্ষেত্রে কোনোরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপের তিনি ছিলেন একান্ত বিরোধী।[২৩] চারিদিকে হিন্দুধর্মহানির আশঙ্কায় রব উঠল। হিন্দু কলেজের ম্যানেজাররা শঙ্কিত হয়ে উঠে সেপ্টেম্বর, ১৮৩০-এ সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আলোচনা সভায় ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দিয়ে অবস্থার গতি ফেরাতে চেষ্টা করলেন। বিভিন্ন ইংরেজি সাময়িকপত্রে ম্যানেজারদের এই নির্দেশকে স্বৈরাচারী হিসাবে সমালোচনা করে, তাঁদের এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করার কোনো অধিকার নেই বলা হল। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (এর সম্পাদক ছিলেন মিঃ গ্রান্ট, সহকারী ডিরোজিও স্বয়ং) ম্যানেজারদের এই আদেশকে 'tyrannical' 'absurd' 'ridiculous' ইত্যাদি বলে ডাফ, হিল প্রভৃতিকে তাঁদের বক্তৃতামালা পুনরারম্ভ করতে, এবং হিন্দু কলেজের

২২ *'The Life of Alexander Duff' (Vol.I)*, **George Smith**, P. 122.

২৩ ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের ধর্মভাবনার আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

ছাত্রদের সবরকম নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তাতে যোগ দিতে আহ্বান জানাল।[২৪]

এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কগ্রস্ত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের ছেলেদের কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। বিরাট সংখ্যক ছাত্র অনুপস্থিত থাকতে লাগল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখল, 'আমরা শুনিয়াছি ৪৫০ / কিম্বা ৪৬০জন বালক ঐ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুইশত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে।...পরিত্যাগি দুইশত বালকের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের সন্তান অনেক। আমরা যে সকল নামের বিশেষ তত্ত্ব করি নাই। কিন্তু জনরব হইয়াছে যে, শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজ যাইতে নিষেধ করিয়াছেন'।...[২৫] ২৩.৪. ১৮৩১-এর হিন্দু কলেজ পরিচালকসভার কার্যবিবরণে দেখি, বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৫টি ছাত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৬০টি ছেলে অনুপস্থিত থাকছে, যাদের কেউ কেউ হয়তো অসুস্থ, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন অনেকেই কলেজে যোগ দিচ্ছে না।[২৬] হিন্দু কলেজ শুধু অহিন্দু কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুই নয়, তা খ্রীষ্টান তৈরীরও আখড়া, সাধারণ জনমন একথা বিশ্বাস করতে লাগল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও অনেকে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। এই সময় 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখি, 'সংস্কৃত কালেজের স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের ছাত্রের-দিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন তাঁহারা সংপ্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে আমারদিগে[র] শিষ্য যজমানেরা কহেন যে তোমরা যদি কালেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর তবে তোমাদিগের দ্বারা আমরা কোন কর্ম করাইব না... !'[২৭]

এক দিকে ইয়ংবেঙ্গলের প্রচলিত ধর্মাচার-বিরোধী অগতানুগতিক আচরণ, অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনরিদের তৎপরতা-এবং এরই ফলস্বরূপ

২৪ *'Henry Derozio'*, Thomas Edwards, P.71-2.

২৫ 'সমাচার চন্দ্রিকা', ১৩ বৈশাখ, ১২৩৮।

২৬ বঙ্কিমচন্দ্র. 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৯৫।

২৭ 'সমাচার চন্দ্রিকা', ১৩ বৈশাখ, ১২৩৮।

সাধারণের ভীতি ও দ্রুত ছাত্রসংখ্যাহ্রাস-এইরকম পরিবেশে হিন্দুকলেজের পরিচালক কমিটি তাঁদের কর্তব্য স্থির করতে এক জরুরী সভায় মিলিত হলেন। শনিবার, ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ পরিচালক মণ্ডলীর সভা বসল।[২৮] এই জরুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গবর্ণর চন্দ্রকুমার ঠাকুর, সহকারী সভাপতি উইলসন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। সকল গোলযোগের মূল তাঁদের চোখে ডিরোজিও। মুখ্যত ডিরোজিও-সম্পর্কিত এই সভায় স্বয়ং ডিরোজিওই ছিলেন অনুপস্থিত। পরিচালকদের অনেকে তাঁকে তরুণদের শিক্ষার অযোগ্য শিক্ষক হিসাবে প্রমাণ করতে চাইলেও অধিকাংশই এ-বিষয়ে একমত হলেন না। (কেবল রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে তরুণদের শিক্ষার অযোগ্য শিক্ষক বলে রায় দেন।) তখন ব্যাপারটিকে দেখা হল হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বর্তমান মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং তাঁকে সমস্ত অনর্থের মূল ও জনসাধারণের আতঙ্কের কারণ বলে কলেজ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। উইলসন ও হেয়ার হিন্দুসমাজের ব্যাপার বলে এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন নি। বাকি ৭ জনের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছাড়া অন্য ৬ জনই তাঁর অপসারণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

উইলসন, ডিরোজিওকে এক পত্রে ম্যানেজারদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে পদত্যাগ করার জন্য লেখেন। ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ ডিরোজিও তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। হিন্দু কলেজ পরিচালক সমিতির কাছে লেখা এই পদত্যাগপত্রে ডিরোজিও কি অভিযোগে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য হতে হচ্ছে তা না জানায়, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন। ঐ দিনই উইলসন ডিরোজিওর চিঠির উত্তরে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত তিনটি গুরুতর অভিযোগের কথা জানান: (১) তাঁর ঈশ্বরে অবিশ্বাস; (২) পিতা মাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে না করা; (৩) এবং ভাইবোনের বিয়ে সামাজিক

২৮ কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত হিন্দুকলেজের এই ঐতিহাসিক সভাটির কার্যবিবরণী বর্তমানে বিস্ময়করভাবে অদৃশ্য হওয়ায় এ-সম্পর্কিত তথ্যগুলি আমরা শ্রীবিনয় ঘোষের 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছি। পৃ. ৬৭-৭৩।

অপরাধ মনে না করা।[২৯] পরের দিন ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১ উইলসনকে লিখিত একটি দীর্ঘ পত্রে ডিরোজিও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-গুলির জবাব দেন। প্রথম অভিযোগের উত্তরটি তাঁর জ্ঞানপিপাসু চিরঅতৃপ্ত যুক্তিবাদী মনকে উন্মোচিত করেছে। ঘৃণ্য, কুৎসিত, অস্বাভাবিক দ্বিতীয় অভিযোগে যাঁরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁদের ঘৃণা করতেও তাঁর বাধে-একথা জানিয়ে, তিনি একাধিক ঘটনার সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। তৃতীয় অভিযোগটির উত্তর তিনি এক কথায় দেন—'না।' বলাবাহুল্য, তৃতীয় অভিযোগটি গুজব রটনাকারীদের রটনা, যারা নোংরামির যে কোনো পর্যায়ে নামতে পারত।

হিন্দু কলেজ-পরিচালক সমিতি ডিরোজিওকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁর ওপর হয়তো সুবিচার করেন নি; কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবে তরুণ বাঙালী ছাত্রদের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটায় প্রচলিত ধ্যানধারণা যখন বিপর্যস্ত, এইরকম পরিবেশে হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের আত্মরক্ষার প্রয়াসই ডিরোজিওকে অপসারণের সিদ্ধান্তে প্রকাশিত, এ সিদ্ধান্ত এক অর্থে তাঁদের পরাজয়, কারণ যুক্তিবাদী জ্ঞানের সামনে তাঁদের যুগবাহিত ধ্যান-ধারণা যে ভেঙে পড়ছে, তারই স্বীকৃতি যেন ডিরোজিওকে অপসারিত করে তার উৎসমুখ বন্ধ করার অসহায় সিদ্ধান্তে।

হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিদায় নিতে বাধ্য হলেন, সাংবাদিকতাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিলেন, একটি পত্রিকা বার করলেন 'ইস্ট-ইণ্ডিয়ান' নামে, এবং কলেজ থেকে বিদায় নেবার আট মাসের মধ্যে (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১) তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল। মোটামুটি পাঁচটি বছর তিনি যুক্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের সঙ্গে। যেহেতু তাঁর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না শ্রেণীকক্ষে, তাই তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র নন এমন অনেকেও তাঁর প্রভাবে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন (কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ডিরোজিওর এই দুই ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধু তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না)। হিন্দুকলেজে এবং 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে'

[২৯] 'Do you believe in a God? Do you think respect and obedience to parents no part of moral duty? Do you think the inter-marriage of brothers and sisters innocent and allowable?'— *'A Biographical Sketch of David Hare'*, P. C. Mitra, P. 21.

যাঁরা ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে সবচেয়ে অভিভূত, এবং তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সত্যের জয় ঘোষণা করে (অন্তত সাময়িকভাবেও) কুসংস্কারের শৃঙ্খলমুক্ত হতে চেয়েছিলেন, যাঁদের কোমল মন ফুলের কুঁড়ির মতো বিকশিত হচ্ছে দেখে ডিরোজিও ১৮২৯-এ একটি সনেটে [৩০]

['Expanding like the petals of young flowers

I watch the gentle opening of your minds....']

তাঁর আবেগ প্রকাশ না করে পারেন নি, সেই স্বপ্নদর্শী তরুণদলই বাংলার নবজিজ্ঞাসার ইতিহাসে 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত। এঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য-প্রভাবে প্রভাবিত, ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বে অভিভূত, এবং আচার-আচরণে অন্তত অনেকে প্রচলিত সংস্কার-বিরোধী। যে-কারণে মুসলমান খানসামার রান্না ছিল তাঁদের প্রিয়, বিস্কুট, বিফস্টিক, ফাউল-কারীর ছিলেন তাঁরা ভক্ত, মদ খেতেন প্রকাশ্যে, প্রণাম বা কোলাকুলি না করে করতেন করমর্দন, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি তাঁরা বিতৃষ্ণ, আর দেবদেবীতে বিশ্বাসহারা। এই গোষ্ঠীর কয়েকজন (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩-৮৫, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮১০-৫৭, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮১৪-৭৮, রাম-গোপাল ঘোষ [৩১] ১৮১৫-৬৮, রামতনু লাহিড়ী ১৮১৩-৯৮, শিবচন্দ্র দেব ১৮১১-৯০, হরচন্দ্র ঘোষ ১৮০৮-৬৮, রাধানাথ শিকদার ১৮১৩-৭০, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৮০৫-৫৭, প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪-৮৩, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব। ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যধন্যদের সংখ্যা ১৮-র বেশি বলে তাঁর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস জানিয়েছেন।) সবসময় ডিরোজিওর সঙ্গকামনা করতেন, এমনকি তাঁদের

---

৩০ 'To my Pupils' নামে ১০.৮.১৮২৯-এ 'ক্যালকাটা গেজেট এ্যাণ্ড কমার্শিয়াল এডভার্টাইজর'-এ প্রথম প্রকাশিত. ডিরোজিওর কবিতা সংকলনে সনেটটির পরিবর্তিত নাম **'To the students of the Hindu College.'** শ্রীবিনয় ঘোষ সনেটটি ডিরোজিওর 'মৃত্যুর কিছুদিন আগে' লেখা বললেও (দ্র. 'বিদ্রোহী ডিরোজিও', পৃ. ১৩০) আসলে এটি তাঁর মৃত্যুর আড়াই বছর আগেই রচিত হয়েছিল।

৩১ এই প্রথম চারজন সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, **'The first four for sometime acted as firebrands. Time moderated their impulsiveness.'**— ***'A Biographical Sketch of David Hare'***, **P. C. Mitra, P. 28.**

ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ডিরোজিওর উপদেশ ছাড়া চলতেন না। ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্য 'ইয়ংবেঙ্গল' (প্যারীচাঁদ মিত্র নাম দিয়েছেন 'ইয়ং ক্যালকাটা') ছিলেন স্বপ্নদর্শী, তাঁদের স্বপ্নকে বলতে পারি তরুণের স্বপ্ন।

ইয়ংবেঙ্গল নামে ইয়ং এবং বাস্তবিকই তাই। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে মতের মিল দেখা গেলেও ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও শিবচন্দ্র দেবের মতো রামমোহন-ভক্ত (তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক, শিবচন্দ্র দেব একজন উৎসাহী প্রচারক। ইয়ংবেঙ্গল তিরিশের শেষে পরিচিত হয়েছিলেন 'চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শন' নামে।) মাধবচন্দ্র মল্লিক ও রাধানাথ শিকদারের মতো সোচ্চার হিন্দুধর্মবিরোধী (মাধবচন্দ্র অন্তত তিরিশের দশকে বারংবার হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর তীব্রতম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। রাধানাথের অহিন্দু আচার-আচরণে তাঁর বৃদ্ধ পিতা ছিলেন অসুখী, আর রসিককৃষ্ণ মল্লিকের গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস না করার ঘটনা তো প্রবাদোপম), রামগোপাল ঘোষের মতো যুক্তিবাদী এবং অমৃতলাল মিত্রের মতো গোঁড়া প্রাচীনপন্থী— এঁরা সবাই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত। রামমোহন ও রামমোহন গোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকেই যেমন ছিলেন ধনী অথবা জমিদার, ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীর সকলের কিন্তু তেমন বিত্তকৌলীন্য ছিল না। দক্ষিণারঞ্জনের মতো ধনী এবং কৃষ্ণমোহনের মতো দরিদ্র (যাঁকে একবেলা রান্না পর্যন্ত করতে হত, কারণ সেইসময় তাঁর মা হাতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন[৩২]) সকলেই এই গোষ্ঠীভুক্ত। রামতনু লাহিড়ীর মতো দরিদ্রসন্তান, হেয়ার সাহেবের আনুকূল্য ছাড়া যিনি হয়তো বিদ্যালাভেই বঞ্চিত হতেন, বা রাধানাথ-শিকদারের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত (দারিদ্র্যের জন্য যিনি কলেজে একমনে পড়তে পর্যন্ত পারতেন না। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, কলেজে একবার মনে পড়ত পড়ার কথা, পরক্ষণেই মনে আসত খাওয়ার চিন্তা—বাড়ি ফিরে কি খাব, মা বুঝি এখনও কিছু খান নি, এসব চিন্তা পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত।[৩৩]) এবং রসিককৃষ্ণের মতো ধনীর দুলাল—সবাই ডিরোজিও সমীপে ছিলেন শ্রদ্ধানত।

৩২ 'আদর্শ চরিত-কৃষ্ণমোহন', দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১১।
৩৩ 'রাধানাথ শিকদার', 'আর্যদর্শন', কার্তিক, ১২৯১, পৃ. ২৯৫।

ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের অগতানুগতিক আচার আচরণে রক্ষণশীল অথবা আপসপন্থী সংস্কারক কাউকেই খুশি করতে পারেন নি। সে কারণে 'ধর্মসভা'পন্থী ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' আর রামমোহনপন্থী প্রসন্নকুমার-ঠাকুরের 'রিফর্মার' দুয়েতেই তাঁদের আক্রমণ করা হত। অন্যতম ইয়ংবেঙ্গল কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়ারার' পত্রিকার কলমে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন; ২৩ অগস্ট, ১৮৩১ তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে সংস্কারের আতিশয্যে পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণ শম্ভুচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপের বিখ্যাত ঘটনা ঘটল; প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হল; হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ পেল ১৮৩১-এ রচিত 'দি পার্সিকিউটেড' নাটকে; যাঁর মধ্যে তিনি হিন্দু-সমাজপতি, রক্ষণশীল পত্রিকা-সম্পাদক, আর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের রূপ খুলে ধরলেন। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুসংস্কারগুলিকে আক্রমণ করতে লাগল তীব্রভাষায়। রামমোহনপন্থীদের ভান ছিল তাঁদের কাছে অসহ্য। ডিরোজিও তাঁর 'ইস্ট-ইণ্ডিয়ানে' রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের চেহারা খুলে দিয়েছিলেন।[৩৪] প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একই সঙ্গে পৌত্তলিকতা-বিরোধিতা এবং বাড়িতে দুর্গাপূজা করা, এবং তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতি ইয়ংবেঙ্গলকে করে তুলল উত্তেজিত। সংস্কারপন্থী রামমোহন তাঁদের কাছে প্রতিভাত হলেন 'হাফ লিবারাল' রূপে।

শুধু ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়েও ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন এক নতুন পথের যাত্রী। অবশ্য তাঁদের চাহিদা ছিল মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, ইংরেজি-শিক্ষিত বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁরা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমরা আগেই বলেছি তাঁরা ছিলেন স্বপ্নদর্শী, এবং তাঁদের সে স্বপ্ন তরুণের স্বপ্ন। তাই তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কটাক্ষ করতে ইতস্তত করে নি, 'সাধারণ-জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ইস্ট ইণ্ডিয়া-

৩৪ দ্র. 'দি ইণ্ডিয়া গেজেট' ১৫.১০.১৮৩১ 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' থেকে উদ্ধৃত অংশ। (অংশটি তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে)

কোম্পানির শাসননীতি-বিষয়ক রাজনৈতিক প্রবন্ধপাঠ রিচার্ডসনকে প্রকাশ্য সভায় অশোভন আচরণ করার মতো উত্তেজিত করেছিল; রাজনীতি-বিষয়ে তাঁদের প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি শুনে 'মুসলমানের রাজা সময় হলে' তাঁদের 'কান কাটা' যেত বলে মন্তব্য প্রকাশ করতে 'সমাচার দর্পণে'র বাধেনি।[৩৫] অর্থাৎ সবদিক দিয়েই ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদল সেযুগে ছিলেন একক এবং নিঃসঙ্গ। কি হিন্দুসমাজ, কি দেশী রিফর্মার, কি বিদেশী সরকার, কি খ্রীষ্টান মিশনরি, কেউই তাঁদের বিশেষ সুনজরে দেখতেন না।

এই যে ইয়ংবেঙ্গল, যাঁরা উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে সমাজকে আলোড়িত করেছিলেন, বাংলার নবজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কি এবং কতখানি? তাঁরা কি শুধুমাত্র ভাঙনের গান গেয়েই বাঙালী সমাজজীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন 'স্মৃতির যাদুঘরে' তোলা থাকার জন্য, তাঁদের সব প্রয়াস কি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল উচ্ছৃঙ্খলতায়, যার প্রকাশ মদ্যপানে, গো-মাংস আহারে, এবং হিন্দুধর্মের কুৎসাপ্রচারে? রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাঁরা কি শুধুমাত্র ইংরেজের অনুগামী দাস, এবং তাদের পদচিহ্ন ধ্যান করেই মোক্ষলাভে প্রয়াসী?

একথা অস্বীকার করা যায় না, ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠী বাংলার সামাজিক মঞ্চ খুব অল্পদিনের জন্যই অধিকার করেছিলেন। ১৮২৮-এর পর থেকে তাঁরা শহরের জনজীবনে আলোড়ন জাগান। ১৮৩১-এ তাঁদের গুরু ডিরোজিওর মৃত্যু। ঐকালে তাঁদের সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য, ব্যাপকভাবে তাঁদের সমাজচ্যুতি, অভিভাবকদের কঠোরতা ইত্যাদির সঙ্গে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই গোষ্ঠীর অনেক ব্যক্তির উচ্চ সরকারী পদগ্রহণ, তাঁদের উন্মাদনাকে অনেকটা স্তিমিত করে দিয়েছিল।[৩৬] এছাড়াও এ সময় তাঁরা কর্মোপলক্ষে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, এবং অনেকে ঘর-সংসারে রীতিমতো জড়িত। কিন্তু তখনও তাঁরা 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে' মিলিত হতেন (১৮৩৯ পর্যন্ত 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর অস্তিত্ব

৩৫ 'শ্রীযুত জর্জ তামসন সাহেব', 'সমাচার দর্পণ', ৩০.৮.১৮৫১, পৃ. ১৩৯।

৩৬ ইয়ংবেঙ্গলের প্রধান ১৫জনের মধ্যে যাঁরা সরকারী কর্মে যোগ দেন তাঁরা হলেন--রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, অমৃতলাল মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী (খুব অল্প দিনের জন্য)।

বর্তমান ছিল।) সর্ববিধ জ্ঞান উপার্জনে পরস্পরের সহায়তা করায় ও পরস্পরের প্রীতিবর্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৩৮-এ স্থাপিত 'সাধারণ-জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, মহেশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, প্যারীচাঁদ-মিত্র, প্রসন্নকুমার মিত্র প্রভৃতিরা সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর পাতায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে এবং ইংরেজের আসল রূপ উদ্‌ঘাটনে কলম ধরতেন। ১ জুন, ১৮৪২ তাঁদের গুণগ্রাহী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর বহু বছর ধরে ঐ দিনটিতে মিলিত হতেন হেয়ার স্মৃতিসভায়। হেয়ারের স্মৃতির অবমাননার বিরুদ্ধে তাঁরা 'বেঙ্গল-স্পেকটেটর'-এ কলম ধরেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসী। শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম, বিভিন্নস্থানে ফ্রী স্কুল স্থাপন করে এদেশে শিক্ষার আলো তাঁরা ছড়াতে চাইতেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও তাঁরা ছিলেন আগ্রহী, প্যারীচাঁদ মিত্র আর রাধানাথ শিকদার প্রধানত স্ত্রীলোকদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' বার করেছেন ১৮৫৪-তে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়েও বাংলা ধর্মোপদেশ-সাহিত্য শাখার পুষ্টিবিধান করেছেন। বেথুন প্রস্তাবিত 'কালাকানুন'কে সমর্থন জানাতে তাঁদের অন্যতম নায়ক রামগোপাল ঘোষ দ্বিধা করেন নি, ১৮৪৯ এ তাঁর ***'Some Remarks on Black Acts'*** প্রকাশিত হলে ইউরোপীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে 'এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি' থেকে অপসারিত করে। 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এবং 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া-এসোসিয়েশন'-এ তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন না। অর্থাৎ সবদিক বিচার করে আমরা বলতে পারি রামমোহনের বিদেশ যাত্রার পর (১৮৩০), এবং বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশ, ও এই বিষয়ক আইন• প্রণয়নের সূত্র ধরে বাংলার জনজীবনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত (১৮৫৫-৬) বাংলার সমাজজীবনে (অবশ্যই প্রধানত কলকাতায় সীমাবদ্ধ) ইয়ংবেঙ্গলই ছিলেন সবদিক দিয়ে প্রথম।

কিন্তু একথাও সত্য, ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই প্রথম জীবনের উন্মাদনা শেষপর্যন্ত বজায় ছিল না। ডিরোজিও তাঁদের যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তা বজায় রাখতে পারেন-

নি। ডিরোজিও তাঁর তরুণ ছাত্রদলকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। তাঁর ছাত্রবন্ধুদের অনেকে পরবর্তীকালে নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গোঁড়া যুক্তিবাদী কৃষ্ণমোহন হয়ে দাঁড়ান যুক্তিহীন ধর্মান্ধ কৃষ্ণমোহন, তাঁর নাম হল 'কেষ্টা বান্দা', 'ঘর-মজানো কেষ্টা', 'কানকাটা কেষ্টা'। 'দি পার্সিকিউটেড' নাটকে যিনি সত্যের জয় ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই খ্রীষ্টান করার জন্য 'ছল' করে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে আসতেন।[৩৭] 'নাস্তিকাগ্রগণ্য' দক্ষিণারঞ্জন ফোঁটা তিলক কেটে হলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর সমাজ সংস্কার কর্মের শেষ সংস্কার হল, বর্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে বিয়ে করা, যা তাঁর মতে, একইসঙ্গে বিধবা, অসবর্ণ ও রেজিষ্ট্রি বিবাহ ! যদিও পরবর্তীকালে বসন্ত-কুমারীর গর্ভজাত নিজ পুত্রের সঙ্গে তাঁর তৎকালীন বাসভূমি অযোধ্যার এক ব্রাহ্মণ-কন্যাই খুঁজে পেতে বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমজীবনে ইস্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানির দোষ-ত্রুটি দেখালেও সিপাই যুদ্ধের সময় অন্ধ ইংরেজ ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ লর্ড ক্যানিং-এর কাছ থেকে অযোধ্যায় তালুকদারি পেয়ে তিনি হয়েছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন ! ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র হলেন প্রেত-চর্চায় নিবিষ্টচিত্ত। জীবনের অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন গুপ্ত আধ্যাত্মিকতায়। 'পাপের পরিত্রাতা জগদীশ্বর; তিনি অনুতাপ ঔষধেতে পাপ-বিষকে ক্রমে ধ্বংস করেন।' ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ শুধু একথা লিখেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের জীবনেও বোধহয় 'অনুতাপ ঔষধে' 'পাপ-বিষকে' ধ্বংস করার জন্য তিনি একান্ত ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠেন। 'ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা'র সার্থক দৃষ্টান্ত প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবন। যে প্যারীচাঁদ বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক, 'ক্যালকাটা রিভিউ' ও 'মাসিক পত্রিকা'য় বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপাদক, ৭.১২.১৮৫৬-তে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবাবিবাহ সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, তিনিই ১৮৭১-এ 'অভেদী'তে লিখলেন, 'যে স্ত্রীলোক পতিপরায়ণা সে কি অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে? যে কালেতে পতিকে ভুলে যায় সে কি পতি পরায়ণা? স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি? ইন্দ্রিয়দমন ও আত্মার শক্তিবর্ধন।'[৩৮] শুধু তাই নয়, এককালে গো-মাংসে যাঁর ছিল একান্ত রুচি, সেই প্যারীচাঁদ পরবর্তীকালে অন্যকে

৩৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৯।
৩৮ 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৪৪২।

'যবনস্পৃষ্ট' আহার গ্রহণ করতে নিষেধ করতে দ্বিধা করেন নি। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্যটি উপাদেয়। তিনি লিখেছেন, 'প্যারীচাঁদ বাবু অপ্রকাশ্যরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে খাইতে বিহিত বোধ করিতেন না।'[৩৯] রামতনু লাহিড়ী পিতৃ-অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে পৈতে ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর অনুরোধে 'পাচক ব্রাহ্মণের' সন্ধানে ধাবিত না হয়ে পারেন নি। নিজের বড় মেয়ের বিয়েও তিনি হিসেব করে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারেই দিয়েছিলেন। 'নরদেব' শিবচন্দ্র দেব হিন্দু-কলেজে ছাত্রাবস্থায় ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে একেশ্বরবাদী হলেও সাংসারিক অবস্থার জন্য প্রচলিত হিন্দু ক্রিয়াবিধি পালন করতেন। এমনকি হিন্দু কলেজের সোচ্চার হিন্দুধর্ম বিরোধী ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিকও ১৮৩১-এই পরম সহিষ্ণুভাবে বাড়িতে দুর্গাপূজা করতে ছাড়েন নি।[৪০]

দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইয়ংবেঙ্গলের পূর্বের উগ্রতা হ্রাস পেয়েছে, অনেককিছু তাঁরা মেনে নিয়েছেন, বা নিতে বাধ্য হয়েছেন। তার ফলে রক্ষণশীল ও ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যেকার বৈষম্য হ্রাস পেয়ে উভয়ে ক্রমেই পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ছিলেন। এর সূত্রপাত মিশনরি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মিশনরিরা ভেবেছিলেন, ডাফ-প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, হিন্দুধর্মকে আক্রমণকারী ইয়ংবেঙ্গল শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মেরই আশ্রয় নেবেন। তা না ঘটলে তাঁরা কতখানি রুষ্ট হয়েছিলেন, বোঝা যায় মিশনরি-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মন্তব্যে, 'In this crusade against Christianity we find men of all sects and parties meeting as on common ground···Young Bengal and Old Bengal, the well educated Hindoo youth who has studied Shakespeare and Bacon, and the old Hindoo who believes that the world rests on the back of a tortise, are all united in one general opposition to the truths of Christianity and in efforts to oppose its progress.'[৪১] ধর্মীয়

৩৯ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ২৩৬।

৪০ 'সমাচার দর্পণ', ৭০২ সংখ্যা, ২৯.১০.১৮৩১, পৃ. ৩৫৯।

৪১ '*The Hindoo Infidel Tracts*', 'The Friend of India', 4.12.1845, P. 770.

ক্ষেত্রে যে বোঝাপড়ার সূত্রপাত, তা ক্রমশ প্রসারিত হল অন্যান্য ক্ষেত্রেও। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এ তাঁরা রক্ষণশীলদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮৫৩-এ টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে রাধাকান্ত দেব রামগোপালকে আশীর্বাদ করেন, এবং রামগোপাল প্রত্যুত্তরে যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বলেন, 'আপনি দেশের আশা আপনি দেশের যে স্থায়ীহিত করিবেন, সে হিতসাধন আমার সাধ্যাতীত।' [৪২]

কালক্রমে ইয়ংবেঙ্গল কতখানি নরম হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাই ১৮৬৭-তে রাধাকান্তের মৃত্যুর পর আয়োজিত স্মৃতিসভায় কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশে। কৃষ্ণমোহন রাধাকান্তের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে, তাঁর (রাধাকান্তের) সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি যে যুগের পূর্ববর্তী তাও বলতে দ্বিধা করেন নি। [৪৩] যদিও প্রথম জীবনে একটি পুস্তিকায় কৃষ্ণমোহন তাঁকে 'গাধাকান্ত' বলতে এবং 'দি পার্সিকিউটেড' নাটকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেন নি। এসব ঘটনা থেকে আমাদের অনুমান, ইয়ংবেঙ্গলের অনমনীয় মনোভাব পরবর্তীকালে নমনীয় ও অনেকক্ষেত্রে আপসমুখী হয়ে উঠেছিল।

ইয়ংবেঙ্গলকে আমরা আগেই বলেছি ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী। হিন্দু কলেজ খোলার পর ইংরেজি শিক্ষার যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত না হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে কলকাতা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা ও সেইসূত্রে পাশ্চাত্য-চিন্তাধারার বিস্তার একদিকে যেমন এদেশে এনেছিল জ্ঞানের আলো, অন্যদিকে এনে দিয়েছিল ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতা। ইংরেজিশিক্ষিতরা চাকুরি ও ব্যবসাসূত্রে অর্থকৌলীন্য লাভ করে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হলেন, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিজেদের সুখসুবিধা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ইংরেজি শিক্ষাজনিত মানসিকতা তাঁদের জনসাধারণের সুখদুঃখের শরিক হতে দেয় নি। মূলত এইসব কারণেই ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠী বাংলার জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ অনুভব করতে পারেন নি। তাঁদের চিন্তাধারা, তাঁদের আন্দোলন, মূলত

---

৪২ 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র', মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ. ৬।

৪৩ *'Proceedings of a Public Meeting to Do Honor to the Memory of the Rajah Sir Radhakant Bahadoor, K. C. S. I,'* P. 20.

কলকাতাশ্রয়ী নাগরিক চিন্তাধারা ও আন্দোলন, বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। সে কারণে তাঁরা শিক্ষিত ভারতীয়দের উচ্চ-সরকারী পদলাভের আন্দোলনে তৎপর ছিলেন। রামমোহনপন্থীদের মতো তাঁরাও ব্রিটিশ অধিকারকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করতেন।[৪৪] তাঁদের অগতানুগতিক আচরণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাঁদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বৃহত্তর জনজীবনকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি।

বাংলার উনিশ-শতকী নবজিজ্ঞাসায় ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল ঠিক কি ভূমিকা পালন করেছেন, এককথায় প্রকাশ করা মুশকিল। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, প্রচলিত সংস্কার আন্দোলনে তাঁরা ছিলেন অগ্রপথিক, রাজনীতির দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন সচেতন, দেশবাসীকে শিক্ষার প্রদীপ জেলে পথ দেখাতে তাঁরা ছিলেন আগ্রহী, সংবাদপত্রে তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারাকে ভাষা দিয়েছিলেন, ইংরেজের অত্যাচার ও দেশের অরাজকতা তাঁদের চোখ এড়ায় নি, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর নামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন জড়িত নয়, যেমন জড়িত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের নাম।

তবু বাংলার নবচেতনার ইতিহাসে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের দান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগ কাটিয়ে এদেশে যে নতুন যুগ এল, এই যুগে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন তাঁরা; যুক্তিহীন বিশ্বাস আধুনিক যুগে অচল বলেই তাঁরা গঙ্গাজলের পবিত্রতায় কিংবা খাদ্যাখাদ্যে বিচার করতেন না। অগতানুগতিক পথে চলে তাঁরা প্রথাজীর্ণ সমাজে আঘাত হানতে পেরেছিলেন সন্দেহ নেই, যদিও তা কত দূরপ্রসারী হয়েছিল সন্দেহের বিষয়। পাশ্চাত্য-প্রভাবিত দৃষ্টিতে তাঁরা সবকিছুকে দেখে বিচার করতে চেষ্টা করেন। উনিশ শতকের নবজিজ্ঞাসায় যুক্তিহীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী আচারের সঙ্গে নবজাগ্রত যুক্তিবোধের যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখি, তাতে ইয়ংবেঙ্গল যুক্তিহীন আচার অনুসরণের পথ ত্যাগ করে কিছুটা যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের পথ গ্রহণ করেন।

---

৪৪ *'British Empire in India'*, reprinted from the 'Enquirer', 'The India Gazette', 10.2.1832.

অবশ্য দেশীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা পুরোপুরি যুক্তিবাদী হলেও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রতি সেই পরিমাণ যুক্তিবাদ বজায় ছিল না। দেশীয় ঐতিহ্যে অনেকটা আস্থাহীন হয়ে প্রতীচ্য-সংস্কৃতির আদর্শে তাঁরা সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের এই মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় বিজাতীয়তার, বলা হয় বিদেশীর পরগাছা, এও বোধহয় ঠিক নয়। ডিরোজিওর মাতৃভাষা ইংরেজি হলেও, তিনি বাংলা ভালোই জানতেন,[৪৫] আধুনিক যুগে ডিরোজিওই প্রথম তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উদ্দেশে কবিতা লেখেন ('To India my native land!')। ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের স্বাদেশিকতার প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন তাঁদের গুরু ডিরোজিওর কাছ থেকেই। 'সাধারণ-জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় ডিরোজিওর ছাত্রশিষ্যরা দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান ছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইয়ংবেঙ্গল পাশ্চাত্য-জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তাঁদের নবার্জিত জ্ঞান, সংস্কারমুক্তি লাভ করলেও স্বদেশ সম্পর্কে কোনরূপ অনীহা পোষণ করেন নি। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন-মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রশেখর দেব ডিরোজিওর এই তিন ছাত্রশিষ্য বিশ্বনাথ তর্ক-ভূষণের কাছে রীতিমতো সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। মধুসূদনের মতো বিলেত যাবার স্বপ্ন ডিরোজিওর কোন ছাত্রবন্ধু দেখেন নি, কেউ আক্ষেপ করে লেখেন নি, 'I sigh for Albions distant shore!' অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম, এমনকি গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়ও জাতীয় ভাব থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। ১৮৩১-এ 'দি-পার্সিকিউটেড'-এ তিনি লিখেছিলেন, 'Let us prove ourselves dutiful sons of our country by our actions, and exertions.'

ইয়ংবেঙ্গলের সীমাবদ্ধতাকে আমরা অস্বীকার করিনা, পরবর্তীকালে ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীর অনেকে (যেমন কৃষ্ণমোহন বা প্যারীচাঁদ বা দক্ষিণারঞ্জন) যে স্ববিরোধিতার শেষ পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু যেখানে এমন কি আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতির সন্দেহজনক উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন

৪৫ 'Bengali Writing in English in the 19th Century', Dr. Amalendu Bose,—'*The History of Bengal*' (C.U.), P. 515.

উঠেছে,[৪৬] সেখানে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সে-জাতীয় অভিযোগের সম্মুখীন হন নি। পাপের প্রতি ছিল তাঁদের অবিমিশ্র ঘৃণা, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁরা

৪৬ রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতির সন্দেহজনক উৎস সম্পর্কিত ধারণার জন্মদাতা হিসাবে কিশোরীচাঁদ মিত্রের নামই সাধারণ্যে প্রচারিত, কিন্তু এ সম্পর্কিত ধারণা সে যুগে ছিল দূর-প্রসারী। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একটি পত্রিকায় রামমোহন-সম্পর্কিত একটি লেখায় দেখি, রংপুরে ডিগবীর দেওয়ান থাকাকালীন '...he is said to have realised as much money as enabled him to become a zemindar, with an income of £1,000 a year, which is improbable.' (*'Rammohun Roy'*, 'Asiatic Journal,' Vol. XII, New Series, Sept-Dec, 1833, P. 198) যে কোনো কারণেই প্রবন্ধ লেখক এই ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। এর বারো বছর পর রামমোহন-অনুরাগী কিশোরীচাঁদ-মিত্র তাঁর 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে এরই প্রতিধ্বনি করে লেখেন, 'By Serving in this Capacity (Dewan), he is said to have realized as much money as enabled him to become a zemindar with an income of Rs. "ten thousand a year." If this assertion be true, it must raise in the mind a strong suspician of the moral character of this extra ordinary man...whether the apostle of Hindu reformer, like the high Priest of inductive Philosophy, sold justice, is a question which, however interesting, We are not competent to decide ...If Rammohun Roy did keep his hands clean, and abstain, as in the absence of all positive evidence to the contrary we are bound to suppose, from defeating the end of justice for a consideration,—he must have been a splendid exception' (*'Rammohun Roy'* 'The Calcutta Review', No. VIII, Vol. IV, 1845, P. 364-5) এর ২৪ বছর পর রেভা. ম্যাকডোনাল্ড তাঁর *'Rajah Rammohun Roy, The Bengali Religions Reformer'* (1879) গ্রন্থে ও লোকনাথ-ঘোষ তাঁর *'The Modern History of Indian Chiefs Rajas Zamindars E.C'*. (Part II) গ্রন্থে (পৃ. ৮৩) এই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন। জি. এস. লিওনার্ড ১৮৭৯-তে তাঁর *'A History of the Brahma Samaj'* গ্রন্থে (পৃ. ২১-২) ও মিস কলেটের *'The Life and Letters of Raja Rammohun Roy'* গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় (৩য় সং, ১৯৬২, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী সম্পাদিত) এই মত খণ্ডন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন (পৃ. ৫৪-৮)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন 'অপ্রশংসনীয়' কার্যকলাপের জন্য বোর্ড অব রেভেনিউ ডিগবীর অনুরোধ সত্ত্বেও রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করেন নি। (দ্র. 'রামমোহন রায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯-৩১)

ছিলেন অকুতোভয়,[৪৭] আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁদের প্রখর। তাঁরা প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন (এযুগে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা, 'ধর্মসভা'র বিভিন্ন সভ্যরা সবাই মদ্যপান করতেন), গো-মাংসে তাঁদের আসক্তির পেছনের মনোভাব ছিল প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙা (স্মরণীয়, রক্ষণশীলরা গো-মাংস না খেলেও দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাহেব স্ববোদের ডেকে গো-মাংস ও মদ্যে আপ্যায়িত করতেন)। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির যে-প্রভাব তরুণ মনের ওপর পড়েছিল, তারই শক্তিতে তাঁরা শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা যুক্তিবাক্যকে অনুসরণ করলেন। যুক্তির সাহায্যে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক আপাত অসঙ্গত কাজ তাঁরা করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার উনিশ শতকী নবজিজ্ঞাসায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানিই ইয়ংবেঙ্গলের দান। রামমোহনের প্রস্থান ও সামাজিক জীবনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের মধ্যবর্তীকালে নবজিজ্ঞাসায় জ্বলন্ত ইয়ংবেঙ্গলের ভূমিকা ইতিহাসে খণ্ডকালীন অত্যুজ্জ্বল এক অধ্যায়।

৪৭ রাধানাথ শিকদার সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন, এমন কি ১৮৪৩-এ সার্ভে বিভাগের সামান্য অফিসার হয়ে দেরাদুনের সুপ্রিণ্টেডেণ্ট সি. এইচ. বেন্সিটার্টের গরিব লোকদের বেগার খাটানোরও প্রতিবাদ করেন, ফলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টির অভিযোগ অভিযুক্ত হন, ও তাঁকে ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ বিষয়টি নিয়ে প্রচুর লেখালিখি করা হয়। (দ্র. 'দি বেঙ্গল স্পেকটেটর', ১.৯.১৮৪৩, ৯.৯.১৮৪৩, ১৬.৯.১৮৪৩)

৩. বাংলার ধর্মীয় অবস্থা (১৮২৬-৫৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী সমাজজীবনে যত কিছু মতভেদ, অনৈক্য, পরস্পর-বিদ্বেষ ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল, তার প্রায় সবটাই বোধহয় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে। এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রায় সমমনোভাবাপন্ন রামমোহনপন্থী ও ইয়ংবেঙ্গল এই দুই গোষ্ঠীও প্রধানত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই একত্রে কোনো গঠনমূলক কাজে হাতে দিতে এগিয়ে আসেন নি। এবং এই ধর্মীয় মতভেদের জন্যই এই পর্বে বহু সভায় (যেমন 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'বেথুন সোসাইটি', 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' ইত্যাদি) ধর্মীয় আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার অবস্থা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, দেখব মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, অথচ ইংরেজ শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, দেশের সর্বত্র অরাজকতা, শান্তিশৃঙ্খলার অভাব, জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য, প্রজাদের ওপর জমিদার অথবা তার প্রতিনিধির অসহনীয় অত্যাচার। এসবের ফলে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা মূল্যবোধে এল ভাঙন, সাধারণ মানুষের জীবনে এল শূন্যতা। একদিকে অপরিমিত বিলাসব্যসন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের শোচনীয় দুর্গতি-এই ছিল বাংলার সাধারণ অবস্থা। সামাজিক দিক দিয়ে ভারসাম্যচ্যুত এমন এক অবস্থায় প্রচলিত ধর্মের মধ্যে নানাপ্রকার বিকৃতি প্রবেশ করল। ধর্মের নামে বিকৃত আমোদ-প্রমোদ, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি দেখা দিল। সমাজপতিরা ভাঙন-ধরা সমাজের ভাঙনরোধের প্রচেষ্টায় পদে পদে মানুষকে নিষেধের ডোর পরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কৌলীন্যপ্রথা, সতীপ্রথা ইত্যাদি এই সময় শ্বাসরোধকারী হয়ে দাঁড়াল।

ইংরেজ অধিকারের আগে মুসলমান ছিলেন রাজা, ইসলাম রাজধর্ম, এবং হিন্দু প্রজা। ইংরেজ পলাশির মাঠে মুসলমান নবাবকে হারিয়ে বাংলার

রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রপাত করল। মুসলমানরা প্রত্যক্ষভাবে রাজত্ব হারানোর দুঃখ অনুভব করে ইংরেজের সংস্রব এড়িয়ে চলতে লাগলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যানধারণা ইত্যাদি থেকে নিজেদের সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখলেন। এর ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় স্নাত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিতে বিলম্ব হয়েছিল (১৮৩৫-এ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ খোলা হলে ভর্তির উপযুক্ত একটি মুসলমান ছাত্রও পাওয়া যায়নি। কলকাতা 'স্কুল বুক সোসাইটি'র মুসলমান সদস্যদের মধ্যে একজনও ইংরেজি জানতেন না), অন্যদিকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনড় বিশ্বাসী হবার দরুণ তাঁদের নিজস্ব ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ কোনো জিজ্ঞাসা বা সংশয় এ সময়ে নতুন করে দেখা দেয় নি।

পক্ষান্তরে ইংরেজ-অধিকারের পর হিন্দুরা নতুন রাজার অনুগ্রহলাভে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজত্ব হারানোর কোন প্রত্যক্ষ দুঃখবোধ না থাকায় তাঁরা সর্বান্তঃকরণে নতুন শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহভাজন হতে চাইলেন, এবং তাতে সফলও হলেন। রাতারাতি বহু বাঙালী ধনী হয়ে উঠল। ইংরেজ-রাজত্বের আগে যেখানে কলকাতায় ধনীর সংখ্যা ছিল বড়জোর জনাদশেক, ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় প্রচুর সংখ্যক বাঙালী প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠল।[১] কাঁচা টাকা তাদের জীবনে নিয়ে এল নতুন সৌভাগ্য। শুধু অনুগ্রহ-ভাজনই নয়, বিশ্বাসভাজন হবার জন্য কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী নতুন রাজভাষা ইংরেজী শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠল। প্রথম পরিচয়ের জড়তা কেটে যাবার পর তা পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের চাবি-কাঠি হয়ে দাঁড়াল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনেকটা আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠায় তার মধ্যে নানারকম বিকৃতির প্রবেশ ঘটে। চড়কের

১ '*The Amusements of Modern Baboo*', 'The Friend of India' (Quarterty), No XIII, October, 1825. P. 303.

বীভৎসতা ও কদর্য সঙ, দুর্গাপূজার সময় বাইজী এনে মদ-মাংস খেয়ে ফূর্তি করা ('তত্ত্ববোধিনী'র মতে এই তিনদিন পাপের স্রোত প্রবাহিত হত), রাসযাত্রার সময় আমোদ-প্রমোদ, মাহেশে স্নানযাত্রার সময় মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত হৈ হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী পর্যন্ত বাঁধা রেখে জুয়া খেলা, অমানবিক সতীপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করে দলে দলে তামাসা দেখতে আসা, শাক্তদের বীভৎস বামাচার, ব্রাহ্মণদের অনাচার এবং অত্যাচার, তারকেশ্বরের মোহন্তের 'স্বীয় ধর্ম-কর্ম সংস্থাপনার্থ' বেশ্যা রাখা, কবির দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউড় করা—সবই ধর্মের নাম নিয়ে চলত, এবং কলকাতা বা বাংলার হঠাৎ-নবাবরা ছিলেন এসবের প্রধান উৎসাহদাতা। বাইরে ঠাট বজায় থাকলেও সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শতাব্দীর সূচনা থেকেই অন্তত কলকাতা অঞ্চলে নিষ্ঠা ও ভক্তির অভাব ফুটে উঠছিল।[২]

এদেশে কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হবার পর কোম্পানির অন্যতম নীতি ছিল এদেশীয় ধর্মবিশ্বাস ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ না করা, বরং তাঁরা এদেশীয়দের ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির পোষকতাই করতেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার চেয়ে তাঁরা সংস্কৃত, আরবী, ফারসী চর্চারই উৎসাহ জোগাতেন, যার নিদর্শন সংস্কৃত কলেজ বা কলকাতা মাদ্রাসা। ইউরোপীয়দের কালীঘাটে পুজো দেওয়া, বা বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে কালীঘাটে কোম্পানির ভেট পাঠানো গল্পকথা নয়। কোম্পানির জনৈক কর্মচারী 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' নামে পরিচিত ছিলেন, যাঁর হিন্দু-ধর্মানুরাগ সে যুগে সুপরিচিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে স্টুয়ার্টের মতো 'Indianized Englishman' দুর্লভ ছিলেন না। স্টুয়ার্টের 'A Vindication of the Hindoos: By a Bengal-Officer' বইটি খ্রীষ্টধর্মানুরাগী অনেক ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল।[৩] কোম্পানি-রাজত্বের প্রথম দিকে খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের এদেশে এসে প্রচার-কার্য চালাতে মোটেই উৎসাহ দেওয়া হয় নি। কোম্পানির একজন ডিরেক্টর নাকি বলেছিলেন, 'he would rather see a band of devils in India than a band of missionaries'.[৪] ১৮০৬-৭

২ 'কলিকাতা কমলালয়', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা-১) পৃ. ১১-২।

৩ '*British Orientalism & Bengal Renaissance*', David Kopf, P. 140.

৪ '*The Life and Times of Carey Marshman and Ward* (Vol. 1), J. C. Marshman, P. 73.

খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের সহকারী অধ্যক্ষ পাদরি বুকানন কলকাতায় কয়েকটি বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন। এর ফলে দেশীয়দের মনে আঘাত লাগায় গভর্নমেন্ট বুকাননের বক্তৃতা বন্ধ করে দেন। বন্ধুর কাছে এক চিঠিতে বুকানন এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[৫] ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত ইসলামের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের অধিক মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী একটি পারসী পুস্তক সরকারী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করায় বইটির অবশিষ্ট ১৭০০ কপি মিশনরিদের কাছ থেকে নিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত বিভিন্ন ট্রাক্টে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কুৎসা ঘোষণায় উদ্বিগ্ন হয়ে ৪. ৯. ১৮০৭-এ সরকারের তরফ থেকে কেরীকে লেখা একটি চিঠিতে এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশ থেকে বিরত হতে বলা হয়।[৬] কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যানকে কোম্পানির কলকাতায় কর্মপরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা না থাকার জন্যই দিনেমারদের অধীন শ্রীরামপুরে তাঁদের ঘাঁটি স্থাপন করতে হয়।

এই অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে কেরীর সঙ্গে ওয়েলেসলির হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন থেকে শ্রীরামপুর মিশনের সুদিনের সূচনা। তাঁদের কর্মপ্রয়াস অতঃপর বহুমুখী হয়ে উঠতে থাকে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্টের পর থেকে কোম্পানি মিশনরিদের সম্পর্কে বিরূপতা ত্যাগ করে কিছুটা উদাসীন মনোভাব অবলম্বন করেন। মিশনরিরা অবশ্য কোন অবস্থাতেই নিরুৎসাহ না হয়ে তাঁদের জ্ঞান-বিশ্বাস মতো এদেশীয়দের 'অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোক-পথের যাত্রী' করতে চাইলেন। ১৮১৩-এর অনুকূল চার্টার-এ্যাক্টের পর তাঁদের প্রচার অভিযানে এল নব উদ্যম। লোভ দেখিয়ে, প্রলোভিত করে, স্কুল স্থাপন করে, খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের অবিরাম কুৎসা-প্রচার করে, খ্রীষ্টমাহাত্ম্য-সূচক অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁরা অক্লান্তভাবে এদেশের লোককে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চালাতে লাগলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

৫ 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ১৩৪।

৬ জে. সি. মার্শম্যানের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১৪-৬।

নিছক ধর্মপ্রেরণায় কেউ খ্রীষ্টান হয়নি, এই তথ্যটুকু তাঁদের প্রচার অভিযানের ব্যর্থতার চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতার দিকটি একাধিক গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল। রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে সমুন্নত হিন্দুধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম তাঁদের কাছে হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপ বলে প্রতীয়মান হল। পৌত্তলিকতাকে তাঁরা আক্রমণ করলেন, ১৮১৫-তে প্রকাশিত 'বেদান্ত-গ্রন্থ'-এ রামমোহন লিখলেন, 'এক ব্রহ্মবিনা অপরের উপাসনা করিবেক না।' একেশ্বরবাদী রামমোহনের সঙ্গে প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের মতানৈক্য ক্রমে সতী-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরিণত হল প্রকাশ্য বিরোধে। এইসব হিন্দুরা রামমোহনকে হিন্দু বলে স্বীকার করতেই রাজী হলেন না। তাঁদের মতে, রামমোহন হিন্দুধর্মের বিশেষ অনিষ্টকারী। ১৫ অক্টোবর, ১৮৩১ 'কস্যচিৎ নগরবাসী দর্পণ-পাঠকস্য' 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকের কাছে এক পত্রে রামমোহনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে বললেন, 'রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমাদের দেশের উপকারমাত্র নাই, যেহেতু তিনি এতদ্দেশের সর্ব-সাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে।[৭]

রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের কার্যকলাপ যখন হিন্দু ধর্মীয়-জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, সেইসময় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে তরুণ ডিরোজিওর নিযুক্তি সেখানে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে-তা আমরা আগেই বলেছি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকস্নাত ডিরোজিওর যুক্তিবাদী তরুণ ছাত্রশিষ্যদল প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম ও তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। এদিক দিয়ে তাঁরা রামমোহনপন্থীদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। রামমোহন-ভক্তরা নিজেদের 'হিন্দু'ই বলতেন, এবং হিন্দুত্বের সবকিছুকে বর্জন না করে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন পুরোপুরি বর্জনের পক্ষপাতী। সমকালীন একজন লেখকের চোখেও তা ধরা পড়েছিল, 'It is true that the Moderate Reformers less

৭ 'সমাচার দর্পণ', ৭০০ সংখ্যা, ১৫.১০.১৮৩১, পৃ. ৩৪২

bold than the Ultra Radicals, have not wholly and openly rejected the creed of their fore-fathers,···We believe that the Ultra Radicals reject entirely the Hindoo Creed··· The Moderate Party on the other hand, believe in the Hindoo Scriptures.' [৮]

জিজ্ঞাসু এবং যুক্তিবাদী মন নিয়ে ইয়ংবেঙ্গল কিভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাসকে বর্জন করেছিলেন, সে বিষয়ে 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার'-এর জনৈক লেখকের মত: [they] 'renounced both in theory and practice the whole system of Hindooism, pure and impure, ancient, modern, Vedantic and Pouranic, and who, being thus left in a region of vacancy as regards religion, have announced themselves to the world as free inquirers after truth.' [৯] রামমোহনপন্থীরা শাস্ত্রবাক্যকে গুরুত্ব দিলেন, তাঁরা দিলেন যুক্তিবাক্যকে, রামমোহনপন্থীরা যখন শাস্ত্রের আসল অর্থ ও মর্মসন্ধানে ব্যস্ত, ইয়ংবেঙ্গল তখন যুক্তির পথ ধরে তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ইয়ংবেঙ্গলের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও প্রথম জীবনে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না। তাঁর উৎসাহে ছাত্ররা টম পেনের 'এজ অব রীজনে'র ভক্ত হয়ে পড়েন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর জনৈক লেখকের মতে, খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে তাঁদের ধারণা টম পেন, বেন্থাম আর হিউমের চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, যা গোঁড়া খ্রীষ্টানদের পছন্দসই ছিল না। [১০] খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও ইয়ংবেঙ্গলের মনোভাবকে খুব অনুকূল বলা চলে না। মিশনরিদের বিকৃত বাংলা উচ্চারণের অনুকরণে, বাইবেলের কোনো কোনো অংশের ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতিতে, মিশনরি প্রচারকদের ভূমিকার বিদ্রূপাত্মক অভিনয়ে তাঁদের এই মনোভাব

৮ *'Hindoo Reformers'*, reprinted from the **'Bengal Hurkaru', 'The India Gazette', 26.10.1831.**

৯ *'General Characteristics of Native Newspapers'*, **'The Calcutta Christian Observer', October, 1832, P. 231.**

১০ *'History of Native Education in Bengal'*, **'The Calcutta Review', Vol. 17. 1852, P. 354.**

প্রকাশিত। তাঁদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপতার কথা ডাফও বলেছেন। ডিরোজিওর ছাত্রবন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাক 'রিফর্মারে' খ্রীষ্টধর্মকে সমালোচনা করে প্রবন্ধ পর্যন্ত লিখেছিলেন।

এইসব বিক্ষিপ্ত বিরূপ আচরণের কথা বাদ দিলে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁদের মনোভাবকে বলতে পারি অনুরাগহীন জিজ্ঞাসুর মনোভাব। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে কোনোরকম অনুসন্ধিৎসা তাঁদের মনে দেখা দেয় নি। জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁরা নব-জ্ঞানের উত্তেজনায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণে আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক পত্রিকায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তিনি ও তাঁর বন্ধুদের কাছে হিন্দুধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য বস্তু। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ্যে গঙ্গাজলের পবিত্রতায় অবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন। জনৈক কলেজ-ছাত্র বাবার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম্' বলে সম্ভাষণ জানালেন, মুসলমানের দোকান থেকে রুটি কিনে খেতে লাগলেন; ছাত্ররা পৈতে ত্যাগ করলেন, গায়ত্রীর জায়গায় তাঁরা ইলিয়ডের অংশবিশেষ আবৃত্তি করতে লাগলেন; রামায়ণ মহাভারতের জায়গা নিল পোপ ড্রাইডেনের কাব্য; বিভিন্ন মন্ত্রের প্যারডি তৈরী হল। কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণ বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষিপ্ত হল, দক্ষিণারঞ্জন 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ 'ইস্টদেবতাদের নিন্দা ও হিন্দুধর্ম বিদ্বেষতা' প্রকাশ করতে লাগলেন, কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়েরারে' হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন, লিখলেন, 'We have attacked Hinduism, and will persevere in attacking it, until we finally seal our triumph.'[১১] এবং 'দি পার্সিকিউটেড'-এ তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেন, হিন্দুদেবতা কৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেবসুলভ আচার আচরণ খুঁজে পেলেন না; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভণ্ডামি তীব্র আক্রমণের বিষয় হল ('এনকোয়েরারে' 'দি পার্সিকিউটেড'-এর আসন্ন প্রকাশ সম্পর্কিত একটি ঘোষণায় ব্রাহ্মণদের তীব্রভাবে আক্রমণ করা

১১ আলেকজাণ্ডার ডাফের 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া মিশনস'-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৬২৮।

হয় [১২]); জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলেন তাঁরা; কৃষ্ণমোহন সমস্ত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তদানীন্তন বিখ্যাত ইউরেশিয়ান নেতা জন রিকেটস-এর সম্মানে আয়োজিত কলকাতা টাউন হলের ভোজসভায় তাঁর যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে গোটা হিন্দু-সমাজকে চকিত করে তুললেন, ইত্যাদি। পরে অবশ্য তিনি নব্যবঙ্গের শুভার্থী হেয়ারের অনুরোধে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পাল্টেছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মনোভাবের জন্য তদানীন্তন সমাজে ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী অন্তত প্রথম দিকে ছিলেন নিঃসঙ্গ। খ্রীষ্টান মিশনরি, রামমোহনপন্থী সংস্কারক, এবং 'ধর্মসভা'পন্থী রক্ষণশীলের দল সবাই তাঁদের ওপর অপ্রসন্ন। গুরু ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রবন্ধুদের মূল্যও দিতে হল এজন্য। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরা ছাত্রদের হিন্দুধর্মে বিশ্বাস বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়ে সমস্ত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভায় ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দিলেন, এবং তাতেও কোনো কাজ না হওয়ায় ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ একটি সভায় মিলিত হয়ে ডিরোজিওকে সব গোলযোগের মূল ও জনসাধারণের আতঙ্কের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে কলেজ থেকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নিলেন, যার ফলে ডিরোজিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কলেজ থেকে পদত্যাগের মাত্র আট মাস পরে তাঁর মৃত্যু হয় (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীন ইয়ংবেঙ্গল পূর্বের উগ্রতা হারিয়ে কেউ হলেন খ্রীষ্টান, কেউ ব্রাহ্ম, কেউ সনাতন হিন্দু, আবার কেউ বা ধর্মবিষয়ে উদাসীন হয়ে রইলেন।

গো-হাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি না হওয়ায় কৃষ্ণমোহনকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হল। অহিন্দু আচার-আচরণের জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক যোগ্য শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও স্কুল থেকে কর্মচ্যুত হলেন। ডেভিড হেয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তাঁদের যোগ্যতার কথা স্মরণ করে। রক্ষণশীল হিন্দুরাও এই সময় তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এইসব নব্য-

১২ *'The Persecuted'*, reprinted from the 'Enquirer', 'The India Gazette', 17.9.1831. আক্রমণ কতখানি তীব্র ছিল তার উদাহরণ, 'In the true spirit of priest craft they consult nothing but their interest ;…it is not selfishness only which distinguishes the Bramin ; inhumanity and a barbarous disregard to the interests of others are also his characteristics…'

যুবকদের আক্রমণ করেছিলেন।[১৩] সবদিক বিচার করে আমরা বলতে পারি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ধর্মীয় জগতকে ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদল প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলেন।

বিস্ময়ের কথা, কেবল রক্ষণশীলদের সঙ্গে নয়, রামমোহনপন্থীদের সঙ্গেও ইয়ংবেঙ্গলের বিরোধ লেগেই ছিল। আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণে দুই গোষ্ঠীই ছিলেন তৎপর। ডিরোজিও তাঁর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ানে' লিখেছিলেন : 'রামমোহন রায় যে কিসে বিশ্বাস করেন, আর কিসে করেন না, তা তাঁর শত্রু-মিত্র কেউই জানেন না। এতো সর্বজনবিদিত যে রামমোহন বেদ, কোরান, বাইবেল সবকিছুর কাছেই আবেদন করেন, প্রত্যেকের ভালোটা উদ্ধৃত করেন, আর তাঁর কাছে কোনোকিছু খারাপ লাগলেই বাতিল করে দেন। তিনি সবসময় হিন্দুর মত থাকেন, তাঁর অনু-গামীদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনের আচার আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর নামের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ প্রমোদে গা ভাসিয়ে মদ মাংসে ডুব দেন, আবার ব্রাহ্মণকে প্রণামী দিতেও ভোলেন না। মুখে হিন্দু-ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বললেও বাড়িতে পুজো করতে ছাড়েন না।'[১৪] ইয়ংবেঙ্গল এঁদের 'হাফ লিবারাল' বলবেন তাতে বিচিত্র কি!

১৩ '*India & India Missions*', Alexander Duff, P. 624.

১৪ 'What his (Rammohan Roy's) opinions are, neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not than what they are,···Rammohun, it is well Known, appeals to the Veds the Koran, and the Bible holding them all probably in equal estimation, extracting the good from each, and rejecting from all whatever he considers apocryphal···He had always lived like a Hindoo··· His followers, at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name, they indulge to licentiousness in everything forbidden in the Shastras, as meat and drink; while at the same time they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism, and never neglect to have poojahs at home.' 'The East Indian,' October, 1831, reprinted in the India Gazette, 5. 10. 1831. Quoted in A. F. S. Ahmed's '*Sosial Ideas and Social Change in Bengal*' (1818-35), P.43. F. N. কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র ফাইলে ৫.১০.১৮৩১-এর সংখ্যাটি নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার সমাজজীবনে ধর্মের ধারাবাহিক প্রভাব ব্যাপক এবং সর্বাত্মক। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমন কি এই সময় রাজনীতিও ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত ছিল না। (রামমোহন আমাদের অধিকতর রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্য হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলই প্রথম রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন [১৫])। এই সময় খ্রীষ্টান মিশনরি, 'মডারেট রিফর্মার' ও ইয়ংবেঙ্গল—বাংলার এই তিন গোষ্ঠী প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যখন সোচ্চার হয়ে উঠলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সনাতনীদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়াস দেখা দিল। তাঁরা এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠলেন। ১৮২৯-এর ডিসেম্বরে বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীপ্রথা রদ করলে রক্ষণশীল ধনী হিন্দুরা ধর্মরক্ষার জন্য ১৮৩০-এর জানুয়ারিতে 'ধর্মসভা' গঠন করে একত্রিত হলেন। কলকাতার নামকরা ধনীরা হলেন এর প্রধান পুরুষ। তাঁরা অন্তত মৌখিকভাবে ঘোষণা করলেন, 'ধর্মসভার তাৎপর্য হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত ধর্ম কর্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ।'

এই 'ধর্মসভা' প্রধানত ধনীদের প্রতিষ্ঠান, 'ধর্মসভা'র বৈঠকের দিন গাড়িতে গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হয়ে যেত। 'ধর্মসভা'র শাখাও কোথাও কোথাও স্থাপিত হল। কিন্তু 'ধর্মসভা'পন্থীদের প্রচুর অর্থ থাকলেও চারিত্র-শক্তি ছিল না, ছিল না যুগোপযোগী চিন্তা ধ্যান ধারণা, নিষ্ঠার অভাব তাঁদের মধ্যে অতিপ্রকট, নিজেদের বিধি তাঁরা নিজেরাই প্রথম ভাঙতেন। 'রিফর্মার'-এর সংবাদদাতা মন্তব্য করেছিলেন, 'Dharma Sabha by name, but how different in character!' 'ব্রহ্মসভা'র সঙ্গে তাঁদের কলহ বেধে গেল। ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে মাঘ কাশীপুরের প্রাণনাথ চৌধুরীর বাড়িতে আহূত 'ধর্মসভা'র বৈঠকে স্থির হয়, 'যাঁহারা হিন্দু-কুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার থাকিবেক না।' [১৬] সনাতন হিন্দুধর্মের নিন্দাসূচক গ্রন্থ বা সংবাদপত্র মূল্য দিয়ে কেন, বিনামূল্যেও কোন ধর্মসভাপন্থীর গ্রহণ করা উচিত নয় বলে তাঁরা

১৫ *'Prospects of Hindoo Improvement'*, reprinted from the 'Enquirer', 'The India Gazette', 4.1.1832.

১৬ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩০৬-৭।

স্থির করেন। অবশ্য কার্যকালে, অন্যদের কথা বাদই দেওয়া যাক, 'ধর্মসভা'র পণ্ডিতরাও এসব বিধিনিষেধ মেনে চলতেন না। এ নিয়ে সমসাময়িক সাময়িকপত্রে লেখালেখিও হয়েছিল। 'ধর্মসভা'র উদ্যোক্তারা নিজমতাবলম্বীদের অনাচার সম্পর্কে উদাসীন হলেও 'ব্রহ্মসভা'র সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বদাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ব্যস্ত থাকতেন।

'ব্রহ্মসভা' ও 'ধর্মসভা'র দলাদলির সুযোগে 'খ্রীষ্টিয়ানসভা' তার প্রচার অভিযান নতুন উদ্যমে শুরু করে, বিখ্যাত খ্রীষ্টান মিশনরি আলেকজাণ্ডার ডাফ এইসময় কলকাতা এসে এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর অল্প পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান হলেন, ফলে সারা সমাজ আলোড়িত হল। নতুন করে সমাজপতিরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অতঃপর উচ্চবর্ণের আরও কটি হিন্দু তরুণ ধর্মান্তরিত হলেন (১৮৩৮ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে শিক্ষিত অন্তত ১০জন তরুণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন)। ১৮৩৬-এ 'জ্ঞানান্বেষণ' সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে জনৈক পত্রলেখক লেখেন, 'এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান সভা ও ধর্ম ব্রহ্মসভা এই তিন সভার তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনারদিগের ধর্মবৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপূর্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য দুই সভার দল তেমনি হ্রাসতা পাইতেছে…।'[১৭]

খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের প্রচারকার্যের প্রত্যক্ষ সমালোচনায় তখন এগিয়ে এল ব্রাহ্মসমাজ। খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় কঠোর ভাষায় মিশনরি প্রয়াস ধিক্কৃত হল। 'খ্রীষ্টানী হুজুগে'র বিরুদ্ধে বাংলার জনমন সচেতন হয়ে উঠল। 'সংবাদপ্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ১৮৪৫-এ সস্ত্রীক উমেশচন্দ্র সরকারের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে কেন্দ্র করে 'ব্রহ্মসভা' ও 'ধর্মসভা' একত্রিত হল খ্রীষ্টীয় আক্রমণের মোকাবিলায়, কিছুসংখ্যক একদা উগ্রপন্থীকেও তারা সঙ্গে পেল। মিশনরি স্কুলে ছেলে পাঠানো বন্ধ করার জন্য তাদের উদ্যোগে ও আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। নামকরা ধনী মতিলাল শীলও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এবং এসবের ফলে এই সময় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের

---

১৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৯৬-৭।

মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'[১৮] 'ব্রহ্মসভা' ও 'ধর্মসভা'র দলাদলি ও অনৈক্যের স্থানে এল কিছুটা ঐক্য, অনেকে আবার পুরানো ধর্ম-বিশ্বাসকে বরণ করে নিলেন।

(২)

খ্রীষ্টীয় মিশনরিরা এদেশে ধর্মপ্রচারে বহুদিন ধরেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভারতে পোর্তুগীজ আগমনের পর থেকেই খ্রীষ্টীয় প্রচার-অভিযানের সূত্রপাত। ধর্মপ্রচারে তাঁদের অতি উৎসাহ নানা অনুচিত ঘটনায় প্রকাশিত। ইংরেজ অধিকারের পর শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনরিরা শ্রীরামপুর, কলকাতা ও তার আশেপাশে এই কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং তাঁদের উদ্যমকে জোরদার করেছিলেন রামরাম বসু। বাইবেল অনুবাদে সহায়তা করে, খ্রীষ্টীয় গান ও কবিতা রচনা করে, 'জ্ঞানোদয়ে' হিন্দুধর্মাচার ও ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে, পদ্যে খ্রীষ্টচরিত অনুবাদ করে, রামরাম বসু মিশনরিদের কাছে নিজের কদর বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তিনি শেষপর্যন্ত খ্রীষ্টান না হলেও মিশনরিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে খ্রীষ্টতত্ত্বে সুপরিজ্ঞাত রামরাম হিন্দু-ধর্ম-কর্মেরও সমালোচক হয়ে ওঠেন।

শ্রীরামপুর মিশনরিদের উদ্যোগ সর্বপ্রথম সাফল্যমণ্ডিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর, বাঙালী ছুতোর কৃষ্ণ পালের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে। এই ব্যাপার নিয়ে ডেনিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের বিরাট হাঙ্গামা হবার উপক্রম হয়, কৃষ্ণের ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্কল্পে উত্তেজিত হয়ে প্রায় হাজার দুয়েক লোক তাঁর বাড়ীর সামনে হাজির হয়ে তাঁকে কোনো অপরাধ ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যায়। জল অনেকদূর গড়ায়, মিশনরিদের রক্ষার জন্য শেষে পুলিশি ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে হয়।[১৯] ব্যাপারটি ওয়েলেসলিকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তোলে। ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮০১ কৃষ্ণ পালের শালী জয়মণিও খ্রীষ্টান হন। কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের আন্তরিক চেষ্টায় ১৮১৭ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ জন দেশীয় ব্যক্তি ধর্মান্তর

---

১৮ 'আত্মজীবনী', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৬৫।

১৯ '*The Life and Times of Carey, Ward and Marshman*' (Vol 1), J. C. Marshman, P. 138-9.

গ্রহণ করে। অবশ্য এদের মধ্যে কেউই আদর্শগত কারণে খ্রীষ্টান হয় নি, হয়েছিল পার্থিব প্রলোভনে পড়ে। ধর্মান্তরিত করা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনরিদের অবদানের কথা স্বীকার্য। শিক্ষাবিস্তার, বাংলা গদ্যের চর্চা, বাংলা সাময়িকপত্রের সৃষ্টি, কাগজ উৎপাদনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ, সতী ইত্যাদি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি তাঁদের উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ।

পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোম্পানি বাণিজ্যই করতেন, এদেশীয়দের ধর্মান্তরিত করার বিশেষ কোনো তাগিদ ছিল না তাঁদের। পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতায় পাদরি একান্ত দুর্লভ হওয়াতে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত জন কিয়ারনেনডারকে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সস্ত্রীক ক্লাইভ কলকাতায় স্বাগত জানান। আগেই দেখেছি কোম্পানি তাঁদের রাজত্বকালের প্রথমপর্বে মিশনরি কার্যকলাপকে বিশেষ উৎসাহিত করেন নি, কোম্পানির ডিরেক্টরদের সঙ্গে পাদরিদের বনিবনাও হত না। বিলেত থেকে আগত কোনো মিশনরি যাতে কোম্পানির এলাকায় যেতে না পারেন, সেদিকে ডাইরেক্টর-সভার এবং ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ টমাসের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা কোম্পানির কাছে আপত্তিজনক বোধ হওয়াতে তিনি কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। মালদা গিয়ে তিনি নীলের ব্যবসায় মন দেন। অবশ্য অবসর সময়ে গ্রামের লোকদের তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে মার্শম্যান প্রমুখ চারজন মিশনরি ডিরেক্টরদের লাইসেন্স ছাড়াই কলকাতা পৌঁছলে ওয়েলেসলি তাঁদের ছদ্মবেশী 'র্যাডিকাল' মনে করে জাহাজের আমেরিকান ক্যাপ্টেনকে তাঁদের কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দিতে বলেন। শ্রীরামপুরে দিনেমারদের কাছে আশ্রয় না পেলে তাঁদের হয়তো ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হত।

পক্ষান্তরে কোম্পানি এদেশীয় ধর্মকর্ম বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন, হিন্দু দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণও করতেন সে কথার উল্লেখও আগে করেছি। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি প্রতি রবিবারে কালীঘাটে পুজো দিতে যেতেন। কোম্পানি-সরকার বছরে ষাট টাকার মত পুজো দিতেন কালীর কাছে। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের পর কোম্পানি-সরকারের তরফ থেকে তাঁদের প্রতিনিধি বিরাট শোভাযাত্রা করে কালীঘাটে গিয়ে কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন হিসাবে দেবীকে পাঁচহাজার টাকার উপচার দেন।[২০] এই সময় বা এর পরেও সাহেবরা দল বেঁধে দুর্গোৎসবের আনন্দে যোগ দিত, খানাপিনা করত, কালীর কাছে ভেটও পাঠাত। কোম্পানির ইংরেজ-কর্মচারীরা এদেশীয় লোককে পত্র লিখতে শিরোভাগে 'শ্রীকৃষ্ণ' দিয়ে পত্রারম্ভ করতে কুণ্ঠিত হত না। অনেক ফিরিঙ্গি চড়কে সন্ন্যাস পর্যন্ত নিত।

পরিবেশ ধর্মপ্রচারের খুব অনুকূল না হলেও মিশনরিরা কিন্তু নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন নি। ধর্মীয় প্রচারাকাঙ্ক্ষা সাধারণত যুক্তির পথ বেয়ে চলে না, একথা খ্রীষ্টান মিশনরিদের সম্পর্কে একান্তভাবে সত্য। তাঁরা যে ধর্মীয় ব্যাপারে একান্তভাবে যুক্তিবর্জিত ছিলেন তাই নয়, জঘন্য ভাষায় হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্মকর্ম, দেবদেবী, আচার-আচরণকে নিন্দা করতেও ইতস্তত করতেন না। সেজন্য সচেতন জনমানস ছিল কিছুটা বিক্ষুব্ধ। ধর্মীয় প্রচারাকাঙ্ক্ষা তাঁদের কতখানি অশালীন ও অমার্জিত ভাষা ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করেছিল তার একটু নমুনা দেখা যাক। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড হিন্দুদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, 'তারা প্রায় সবাই মিথ্যাবাদী, নৈতিক কোনো বোধ তাদের নেই, আর 'বিবেক' নামক কথাটির সন্ধান তাদের ভাষায় পাওয়া যায় না। অজ্ঞতা আর কুসংস্কার তাদের মজ্জায় মজ্জায়', আর এত কথা বলে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'the Hindoos are, therefore, exceedingly degraded by their religion.'[২১] এই লেখাটিতেই ওয়ার্ড একজন মিশনরির কথা বলেছেন যিনি বিশ্বাস করতেন, 'সতীত্ব' নামক বস্তুটি হিন্দু মেয়েদের মধ্যে নেই বললেই চলে। ওয়ার্ডের নিজের বিশ্বাসও অবশ্য এর চেয়ে উঁচুদরের ছিল না। তিনি অন্যত্র হিন্দুদের সম্পর্কে বলেন: '...if the vices of lying, deceit, and impurity, can degrade a people, the Hindoos have sunk to the lowest depths of human depravity'.[২২]

২০ '*The Christian Missionaries in Bengal*' (1793-1833), Dr. K. P. Sengupta, P. 56.

২১ '*A Letter to the Right Honourable J. C. Villiers, on the Education and Improvement of the Natives of India by William Ward*', 'The Friend of India' June 1820, P. 143-4.

২২ '*Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*' (Vol. 1), W. Ward, Preface. P. xx.

মার্শম্যান, ফরসাইথ প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনরিরা হিন্দুধর্ম, দেবদেবীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। জে. ম্যাণ্ডি খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হয়ে সাধারণ সৌজন্যের রীতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে হিন্দু দেবতাদের গালিগালাজ করতে, হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতে ইতস্তত করলেন না। 'দি মিশনারি স্কেচেস'-এ হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীকে অত্যন্ত বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করা হতে লাগল।

ক্লডিয়াস বুকানন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Memoir of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India'তে বললেন, হিন্দুধর্মই সব অনিষ্টের মূল, এবং তারপর স্বর আরও চড়িয়ে বললেন, 'The Hindoo children have no moral instruction···what branch of their mythology has not more of falsehood and vice in it, than of truth and virtue.'[২৩]

বিভিন্ন 'বাইবেল ট্রাক্ট'সেও হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ ছিল বিরামহীন। ১৮৩৭-এ 'মহাপ্রায়শ্চিত্ত'-এ হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও তীর্থমাহাত্ম্যকে আক্রমণ করা হয়। 'ধর্ম অবতার' নামক আর একটি ট্রাক্টে (৪র্থ সং, ১৮৩৮) কুৎসিত ভাষায় হিন্দু দেবদেবী ও অবতারদের নিন্দা করা হয়। জর্জ পিয়ার্স এ ধরনের একটি পুস্তকে প্রতিমা পূজা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এ 'সকল নিতান্ত অলীক ও অপকৃষ্ট আর ঈশ্বরের ঘৃণার্হ ও মনুষ্যদের সুখ বিনাশের হেতু।'[২৪] জে. টি. রিচার্ড, উইলসন প্রভৃতি পাদরিরাও হিন্দুধর্মের নিন্দায় ছিলেন পঞ্চমুখ।

১৮৩৯-এ আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া মিশনস্' গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে সরাসরি 'মিথ্যা ধর্ম' বলে অভিহিত করলেন। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এর তুলনা করে বললেন, 'Unlike Christianity, which is all spirit and life, Hinduism is all letter and death.'[২৫] হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে খোলাখুলি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতেও তাঁর বাধে নি। তাঁর চোখে কালীর রূপ: 'The supreme delight of this divinity, therefore, consists in cruelty and torture;

২৩ ডঃ কে. পি. সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭২।

২৪ 'প্রতিমা পূজা বিষয়ক বাইবেলোক্ত বিচার', জর্জ পিয়ার্স।

২৫ *'India & India Missions'*, A. Duff, P. 129.

her ambrosia is the flesh of living votaries and sacrified victims; and her sweetest nectar, the copious effusion of their blood.' [২৬]

অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল, এক্ষেত্রে বিশপ হেবারের নাম করা যায়।

মিশনরিদের হিন্দুধর্ম ও তার রীতিনীতিকে এইরকম বিকৃতভাবে চিত্রিত করার পেছনের কারণ দুটি বলে আমাদের অনুমান: (১) খ্রীষ্টধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করা; (২) হিন্দুধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করে নিজেদের কাজে সরকারের সহযোগিতার অনুকূলে জনমত গড়ে তোলা। উনিশ শতকের প্রথমদিকে কোম্পানির পরিচালকবর্গ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এই অবস্থায় এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাসকে আহত করা তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন নি। এছাড়াও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির অধিকাংশ কর্মীই ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, তাদের অনেকেই হিন্দু আচার-আচরণের ভক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই অমঙ্গলাশঙ্কায় তারা এর উচ্ছেদ যে চাইবে না-এতো স্বাভাবিক কথা। কর্নেল স্টুয়ার্ট শুধু হিন্দু দেবদেবীর পুজোই করতেন না, রোজ সকালে গঙ্গায় গিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে জপ-তপও করতেন। [২৭] কিন্তু কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু চার্চ ভারতে ধর্মপ্রচারে উৎসুক হয়ে ওঠে। ১৭৯৩-এ পার্লামেন্টে ভারতে খ্রীষ্টান পাদরিদের অবাধ প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত উইলবার-ফোর্সের প্রস্তাবটি হেস্টিংস, হালহেড প্রমুখদের তীব্র আপত্তিতে নাকচ হয়ে যায়। ১৭৯৯-তে স্থাপিত 'চার্চ মিশনরি সোসাইটি' ও ১৮০৪-এ স্থাপিত 'ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি'র উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। চার্লস গ্রান্টও এদেশে মিশনরি কার্যকলাপের বিস্তার চাইতেন। বিলাতের বিভিন্ন চার্চ জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিল ভারত-বাসীকে এইরকম 'অধঃপতিত' অবস্থা থেকে উদ্ধার করার নৈতিক দায়িত্ব তাদেরই, কাজেই ভারতে খ্রীষ্টজ্ঞানামৃত বিতরণের পথ যাতে সুগম হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা সকলেরই পবিত্র কর্তব্য! ১৮১৩-এ

২৬ ডাফের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪১।

২৭ জে. সি. মার্শম্যানের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৫৫।

চার্টারের নবীকরণের সময় বিভিন্ন সংস্থা কিছু জেনে বা না জেনে মিশনরিদের কাজের সমর্থনে পার্লামেন্টে আবেদন করে। ১৮১৩-র ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ৮৩৭টি এই ধরনের আবেদন পেশ করা হয়।[২৮]

মিশনরিদের চেষ্টা এবং তাঁদের সমর্থনে বিভিন্ন আবেদনের ফলেই ১৮১৩-র চার্টার এ্যাক্টের xxxiii সূত্রে 'পতিত ভারতীয়দের' ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য মিশনরিদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়; এ্যাংলিক্যান চার্চের পাদরিদের ব্যয়ভারও ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেবার প্রস্তাব করা হল। খ্রীষ্টধর্ম এই প্রথম রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করল। এসব কারণেই ১৮১৩-র পর থেকে অনেক বেশী সংখ্যক মিশনরি এদেশে আসতে শুরু করেন, এবং সাফল্যও লাভ করতে থাকেন বেশীমাত্রায়। সেকারণে ১৭৯৩ থেকে ১৮১২ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ১৮৮জন হলেও, ১৮১৩ থেকে ১৮২২-এ ৪০৩ জন, ১৮২৩ থেকে ১৮৩২-এ ৬৭৫ জন ও ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২-এর মধ্যে ১০৪৫ জনকে ধর্মান্তরিত করতে মিশনরিরা সক্ষম হয়েছিলেন।[২৯] রাজনৈতিক দিক দিয়ে পরাধীন, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত, ভারতীয়দের ওপর খ্রীষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হতে লাগল। ধর্মবিজয়ের মধ্য দিয়ে, তাদের নিজ ঐতিহ্যচ্যুত করে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পরাধীন করার প্রথম চক্রান্তের সূত্রপাত এইখান থেকেই। অবশ্য এদেশীয় কর্তৃপক্ষ মিশনরিদের প্রতি রাতারাতি খুব উদার হয়ে ওঠেন, একথা মনে করলে ভুল হবে। লর্ড আমহার্স্ট ও হেস্টিংস ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মিশনরি কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। এবং এই একই কারণে লর্ড বেন্টিঙ্কও তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ ছিলেন। মিশনরিরা স্বপ্ন দেখতেন রাতারাতি এদেশীয়দের খ্রীষ্টান করার। যে কোনো ভাবেই তাঁরা চাইতেন তাঁদের স্বপ্নকে রূপ দিতে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শোষণকার্য ব্যাহত হতে পারে, এমন আশঙ্কার মধ্যে যেতে না চাওয়ার জন্যই ধর্মবিজয়ে অতি উৎসাহী হয়ে ওঠে নি।

২৮ 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী', ফিলিপস, পৃ. ১৮৯। ডঃ কে. পি. সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৪।

২৯ '*Results of Missionary Labour in India*', **'The Calcutta Review', Vol. 16, 1851, P. 255.** এই হিসাব কৃষ্ণনগরকে বাদ দিয়ে।

ডাফ মিশনরিদের ধর্মপ্রচারের তিনটি উপায়ের কথা বলেছেন: (১) বয়স্কদের কাছে বাইবেল সম্পর্কিত বক্তৃতা; (২) তরুণদের তা শিক্ষাদান; (৩) বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ ও বিতরণ।[৩০] কিন্তু এর দ্বারা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য অর্জিত হয়েছিল বললে ভুল হবে, তাঁদের যা কিছু সাফল্য তা মুখ্যত অর্জিত হয়েছিল ভয় এবং প্রলোভন দেখিয়ে। সুখচরের জনৈক রামকমল মজুমদার ৮.৬.১৮৪৭-এ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এক পত্রে মিশনরিদের ধর্ম-প্রচারের তিনটি কৌশলের কথা বলেন: (ক) হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও দেবদেবীর প্রতি কুৎসামূলক পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ, (খ) বাঙ্গালিদের ঘরের সামনে কিংবা প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজধর্মের গৌরব ও পরধর্মের জঘন্যতা ঘোষণা, (গ) লোভে পড়ে কিংবা অন্য মানসে কেউ খ্রীষ্টান হলে তাকে যত্নপূর্বক প্রতিপালন ও কর্মে নিযুক্তকরণ-যাতে অন্যরা তাদের পথ অনুসরণ করতে উৎসাহ পায়।[৩১] রামমোহন এর বহুদিন পূর্বেই বাংলায় মিশনরিদের 'by means of abuse and insult, or by affording the hope of worldly gain' দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টাকে যুক্তি এবং ন্যায়নীতিবর্জিত বলে অভিহিত করেন। (স্মরণীয়, জনৈক বিশপ রামমোহনকে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রকারান্তরে প্রলোভন দেখাতে ছাড়েন নি, রামমোহন এই ঘটনার পরে সেই বিশপের আর মুখদর্শন করেন নি।)

মিশনরিরা তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই শিক্ষার প্রসার চাইতেন, (অন্তত বাইবেল বাঙালীরা বাংলা ভাষায় পড়ার যোগ্যতা যাতে লাভ করতে পারে, তার সহায়তা করা ছিল তাঁদের শিক্ষাপ্রচারের প্রথম উদ্দেশ্য) একই কারণে তাঁরা বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। জনসাধারণ ধর্মশিক্ষার বিরোধী হলেও আর্থিক কারণে ইংরেজি শেখার জন্য মিশনরি স্কুল সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিল না। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের একত্রে পড়া, মুদ্রিত গ্রন্থ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি সত্ত্বেও সেযুগে ডাফের স্কুলে ভর্তির জন্য কিরকম উৎসাহের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল, তা আগে বলা হয়েছে। ৭টি ছেলেকে নিয়ে তাঁর স্কুলের সূত্রপাত, কিছুদিন পরে ছাত্রসংখ্যা হয় ১২০০। ১৮৫২-তে মিশনরি স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৮১,৮৫০,

৩০ *'India & India Missions'*, **A. Duff, P. 285.**

৩১ 'সংবাদ প্রভাকর', ২৮২৮ সংখ্যা, ৮. ৬. ১৮৪৭।

১৮৭২-এ তা দাঁড়ায় ১৪২,৯৫২-এ, আর ১৮৯২-এ তা হয় ১,২০,০০০ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পাঁচগুণ। ৩২ অবশ্য এর দ্বারা ধর্মান্তরিত করার কাজে তাঁরা খুব সফল হয়েছিলেন মনে করলে ভুল হবে। মিশনরি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক হাজার ছাত্রের মধ্যে কয়েকজন মাত্র খ্রীষ্টান হয়েছিল। কোনো হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা যে সহজ ব্যাপার নয়, ডাফকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে। গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরি জি. ম্যাণ্ডি স্পষ্টই বলেছেন, ৫০ বছর ধরে পাদরিরা তাঁদের ধর্মের কথা কায়মনোবাক্যে প্রচার করলেও তাঁদের 'ধনব্যয়ের ও পরিশ্রমের অনুসারে ফলোদয় হইতেছে না।' ৩৩ হিন্দুদের খ্রীষ্টান করার চেষ্টা 'অত্যন্ত অযুক্তি ও অপকারকারী' একথা কর্নেল স্টুয়ার্ট ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দেই বলেন। হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'Those pious Preachers of the Gospel, who proceed to India, for the purpose of converting the Hindoos, merit the thanks of the Church, for their good intentions : but their zeal is misapplied, and their labours will be fruitless ; no Hindoo of any respectability will ever yield to their remonstrances.' ৩৪

নিম্নবর্ণের লোক, জাতিচ্যুত ও নিতান্ত দরিদ্ররাই খ্রীষ্টান হত, এর পেছনে লোভের হাতছানিটাই ছিল বড়। সেসময়ে বাজারে একটা গুজব খুব ছড়িয়েছিল যে, কোনো ভারতীয় ধর্মান্তরিত হলে তার নগদ হাজার টাকা আর একটা মেম বউ বা সেবাদাসী মিলবে। ২ মে, ১৮৩১-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদে দেখি : 'ঈশুখ্রীষ্ট ভজিবার যখন প্রথম গোল উঠিল তখন কোন ২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর একলক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্ত্যাশায় কয়েকজন ইতরজাতি মজিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহ বা দরয়ান কেহ বা খেজমতগার হইয়া দিনপাত করিতেছে।' ৩৫ কিছুদিন পরে ১ চৈত্র, ১৭৬৬ শকের 'তত্ত্ববোধিনী'র

৩২ *'Western Influence in Bengali Literature'*, **P. R. Sen, P. 52.**

৩৩ ***'Christianity and Hinduism Contrasted'***, **G. Mundy, P. 3.**

৩৪ **'*A Vindication of the Hindoos* : By a Bengal Officer' (Part 1), P. 27.**

৩৫ 'সমাচার চন্দ্রিকা', ২. ৫. ১৮৩১।

সম্পাদকীয়তে খ্রীষ্টানদের ধর্মান্তরিত করা সম্পর্কে বলা হয়, 'দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধন দ্বারা, কর্ম্মার্থি ব্যক্তিদিগকে বিষয়কর্মে নিয়োগ দ্বারা, বিদ্যাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগকে অধ্যাপন দ্বারা, খ্রীষ্টান ধর্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগি হইয়াছেন।'[৩৬] যারা এইরকম কোন লোভ বা প্রলোভনে পড়ে খ্রীষ্টান হত, হিন্দুধর্মের মতো খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কেও তারা ছিল অজ্ঞ, এবং তাদের আচার-আচরণ ধর্মান্তরিত হবার পরেও একইরকম থাকত, জন্মার্জিত কুসংস্কারগুলিও তারা নিষ্ঠাভরে মেনে চলত, এই থেকেই বোঝা যায় ধর্মান্তরগ্রহণ তারা অন্তর্নিহিত সত্যোপলব্ধির তাগিদে করে নি। যেমন, শ্রীরামপুর পাদরিদের দ্বারা ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদ খ্রীষ্টান হবার পরও উপবীত ত্যাগ করেন নি। শ্রীরামপুর পাদরিরা ধর্মান্তরিত দেশীয় ব্যক্তিদের নতুন নামকরণ করতেন না পাছে তারা অসন্তুষ্ট হয়। সেজন্য শ্রীরামপুর মিশনরিদের হাতে ধর্মান্তরিত কৃষ্ণদাস আজীবন 'কৃষ্ণদাস'-ই থেকে গেলেন। শুধু কি তাই, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হবার পরও সগর্বে নিজেকে 'ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান' বলে চালাতেন। রেভাঃ লালবিহারী দে আজীবন জাত্যভিমান বজায় রেখেছিলেন।

মিশনরিদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার ডাফ ছিলেন অতি ধুরন্ধর বুদ্ধিমান। শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার তিনি করতে চেয়েছিলেন। সমাজের উন্নততর শ্রেণী হয়েছিল তাঁর লক্ষ্য। সেজন্য 'হিন্দুধর্মের মস্তিষ্ক' কলকাতা তাঁর কর্মকেন্দ্র। সুযোগ-সন্ধানী ডাফ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে পূর্বগামীদের ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করে নতুনভাবে তাঁর কর্মপ্রয়াস ঠিক করলেন। এদেশে এসে প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করলেন রামমোহন রায়ের সঙ্গে। অদ্বৈতবাদী রামমোহন খ্রীষ্ট এবং বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হলেও মিশনরিদের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কলমও ধরেছিলেন। ফলে গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরিরা তাঁর ওপর একেবারেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। স্বভাবতই 'দি প্রিসেপ্টস্ অব যেশাস' এর লেখককে তাঁরা মনে করতেন খ্রীষ্টধর্মের শত্রু। ডাফের সঙ্গে এমন একজনের অন্তরঙ্গতা তাঁদের কাছে যথেষ্ট প্রীতিপদ মনে হয় নি। ডাফের অনুসৃত অভিনব ও আকর্ষণীয় শিক্ষাপদ্ধতিও তাঁর মিশনরি-বন্ধুদের খুশি করতে পারে নি।

৩৬ 'তত্ত্ববোধিনী', ২০ সংখ্যা, ১ চৈত্র, ১৭৬৬ শক।

তাঁর এক বন্ধু তাঁর ভারতে আসা শুভ না হয়ে অশুভ হবে বলে মত প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তীক্ষ্ণধী ডাফ কেন যে প্রচারকের কর্ম না করে বাঙালী ছেলেদের ইংরেজি বর্ণমালা শিখিয়ে সময় নষ্ট করছেন, তা তাঁদের মাথায় ঢোকে নি। আর ঢোকে নি বলেই তাঁরা যা পারেন নি, তাই পারলেন ডাফ। বাঙালী ছেলেদের পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনে দীক্ষিত করলে, তারা তাদের কুসংস্কার ও শাস্ত্রকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে—ডাফের এই উদ্দেশ্য যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয় নি, পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্যবহ।

হিন্দুকলেজের ছাত্রদের যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদের ধাক্কা খ্রীষ্টধর্মের ওপরও এসে পড়ায় (১৮৩২-এ মিশনরি হডসন লিখেছিলেন, বাঙালী তরুণরা আরো খোলাখুলিভাবে খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।) যুক্তিবাদের প্রেরণাগ্রন্থ টম পেনের 'এজ অব রীজন' খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের কাছে বিভীষিকা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় এগিয়ে এলেন ডাফ। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুকলেজীয়দের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণায় তিনি আনন্দিত থেকেও তাঁদের মধ্যে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের প্রসারে শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি।

এইসব যুক্তিবাদী তরুণ নিজেদের সত্যানুসন্ধানী বলে অহঙ্কার করতেন। তার সুযোগ নিয়ে ডাফ তাঁদের কাছে খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব জানার জন্য আবেদন করলেন, যা তাঁর নিজের ভাষায় 'Not only true, but TRUTH itself'. তাঁর এই আবেদন বিফলে গেল না। তিনি এইসব উৎসাহী যুবকদের খ্রীষ্টীয় সত্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে ১৮৩০, অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে তাঁর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত এক বক্তৃতামালার আয়োজন করলেন। মোট ৪টি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অগস্টের সূচনায় রেভাঃ মিঃ হিল প্রারম্ভিক ভাষণটি দিলেন। হিন্দুসমাজে এই বক্তৃতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, হিন্দুকলেজ কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগ দেওয়া সম্পর্কে একরকম পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসলেন। ম্যানেজারদের এই নির্দেশকে রক্ষণশীল ছাড়া কেউই স্বাগত জানায় নি। তদানীন্তন প্রগতিবাদী পত্রিকাগুলি এই আদেশের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল, 'ইণ্ডিয়া গেজেট' অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এই আদেশের সমালোচনা করে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ছাত্রদের এই সভায় যোগ দিতে আহ্বান জানাল।

যাইহোক, শ্রোতার অভাবে ডাফের প্রথম পর্যায়ের বক্তৃতামালার পরিসমাপ্তি ঘটল এইখানেই। কিন্তু সমাজে খ্রীষ্টাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

তারপরে অগস্ট, ১৮৩১-এ ডিরোজিওর 'ঘনিষ্ঠতম ছাত্রবন্ধু' কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে সংস্কারের উত্তেজনায় পার্শ্ববর্তী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপের ঘটনা (যার উল্লেখ করে এসেছি) যখন ঘটল, এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি না হওয়ায় কৃষ্ণমোহন যখন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সেই রাত্রিতে গৃহত্যাগে বাধ্য হলেন, তখন সুযোগসন্ধানী ডাফ আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন। একজন মধ্যবর্তী বন্ধুর সহায়তায় কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁর বর্তমান অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করে, তিনি তাঁকে খ্রীষ্টীয় সত্য না জানার জন্য অনুযোগ করলেন। কৃষ্ণমোহন নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে, এবং ডাফের বাকচাতুর্যে অভিভূত হয়ে, তাঁর বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মীয় উপদেশ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে রাজি হলেন। ডাফের চেষ্টায় খ্রীষ্টধর্মসম্পর্কিত দ্বিতীয় বক্তৃতামালার সূত্রপাত হল।

ডাফের এই উদ্যোগের প্রথম ফল হিন্দুকলেজ ছাত্র ডিরোজিও-শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষের ধর্মান্তরগ্রহণ। ২৮.৮.১৮৩২-এ 'এনকোয়েরার' পত্রে কৃষ্ণ-মোহন মহেশচন্দ্রের ধর্মান্তরগ্রহণের সংবাদ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, 'We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country.'[৩৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মুখ্যত ডাফের চেষ্টাতেই মহেশচন্দ্র ঘোষ ধর্মান্তরিত হলেও, ডাফ কর্তৃক তিনি ধর্মান্তরিত হন নি, অবশ্য ধর্মান্তরের জন্য তিনি যে ডাফের কাছে ঋণী, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।

এর পরেই ধর্মান্তরিত হলেন হিন্দুকলেজের নামকরা ছাত্র কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম একজন উচ্চশিক্ষিত, সুপরিচিত কুলীন ব্রাহ্মণ ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। ১৭ অক্টোবর, ১৮৩২ বুধবার সন্ধ্যাবেলা ডাফ তাঁকে ধর্মান্তরিত করলেন।[৩৮] তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের কথা হাটে বাজারে

৩৭ ডাফের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৪৯।

৩৮ কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য দ্র. 'দি ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার', নভেম্বর, ১৮৩২, পৃ. ৩১০।

লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। স্কুল-কলেজে, বাঙালী-পরিবারের অভ্যন্তরে তা হয়ে উঠল আলোচনার বিষয়। নিম্নবর্ণের হাজারজনকে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে এই একজনের ধর্মান্তরগ্রহণ সমাজমনকে অনেক বেশী নাড়া দিল।

কৃষ্ণমোহন শুধু যে খ্রীষ্টান হলেন তাই নয়, অন্যদেরও খ্রীষ্টান করতে উঠে-পড়ে লাগলেন। একদা হিন্দুসমাজ তাঁর প্রতি যে 'দুর্ব্যবহার' করেছিল, তিনি তা সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন, 'কেষ্টাবান্দা' অনেক হিন্দু অভিভাবকের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেন। নানা বিদ্রূপে বিদ্ধ হলেন তিনি, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে কবিতা পর্যন্ত লিখলেন।

এই বছরের ১৪ ডিসেম্বর, ডাফ গোপীনাথ নন্দীকে ধর্মান্তরিত করেন। অনেকে সরাসরি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করেও তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠল।[৩৯] ১৮৩৫-এ ইংরেজির সরকারী মর্যাদা স্বীকৃত হলে এদেশীয় অনেকের মনে এমন ধারণা জন্মায় যে এটা হিন্দু মুসলমানকে খ্রীষ্টান করার একটা কল। শিক্ষা ব্যবস্থায় পাদরিদের পর্যাপ্ত প্রাধান্য হিন্দু সমাজপতিদের চিন্তিত করে তুলল।

অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১৮৩৪-এ ডাফ সস্ত্রীক ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় যাজকরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সংঘ এই সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠল। ১৮৩৫-এ সেন্ট জেভিয়ার্স, ১৮৩৬-এ লা মার্টিনিয়ার ও ডিভোতা কলেজ, এবং ১৮৪১-এ লরেটো হাউসের যুবতী 'নান্'-রাও কলকাতায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন। আর এই সব কারণেই ১৮৩৬-এ 'জ্ঞানান্বেষণ' জানায় ধর্মসভা ও ব্রহ্মসভার চেয়ে বর্তমানে 'খ্রীষ্টীয়ানসভা'ই অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৮৪০-এ ডাফ আবার কলকাতায় ফিরে আসেন, এবং শুধুমাত্র তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই জনা পঞ্চাশ যুবক ধর্মান্তরিত হন।[৪০] এঁদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষিতরাও ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র

৩৯ '*The Opinions and the Circumstances of the Educated Hindoos*', 'The Cal. Christian Observer', June, 1833, P. 278-9.

৪০ 'Christianity in Bengal', Pierre Fallon, '*Studies in the Bengal Renaissance*', Ed. A.C. Gupta, P. 457.

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠল। এই সক্রিয়তা বিশেষভাবে দেখা দিল সস্ত্রীক উমেশচন্দ্র সরকারের ধর্মান্তর গ্রহণে। ১ আষাঢ়, ১৭৬৭ শকে 'তত্ত্ববোধিনী' এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মিশনরি দৌরাত্ম্য এখন 'সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত' হয়েছে বলে মত প্রকাশ করে। মিশনরি স্কুলে ছেলে পাঠানো বন্ধ করার জন্য নিজেদের একটি পাঠশালা স্থাপন যে একান্ত প্রয়োজন তা পত্রিকাটি জোরের সঙ্গে বলে। এরই ফলশ্রুতি 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, আশুতোষ দেব, মতিলাল শীল, নীলরত্ন হালদার, রমাপ্রসাদ-রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি এখানে মিলিত হলেন। মেদিনীপুরেও কয়েকজন ভদ্রলোক সভা করে 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ে'র আনুকূল্য করার জন্য চাঁদা তোলেন। মহাউৎসাহে ১ মার্চ, ১৮৪৬, চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়িতে 'হিন্দু হিতার্থী-বিদ্যালয়ে'র কাজ আরম্ভ হয়, প্রথম সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন। অবশ্য স্কুলটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৪৮-এ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল করলে এর অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্গীণ এবং এরই ফলে কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলটি উঠে যায়। এই সময়েই হিন্দু সমাজপতিরা ঘন ঘন খ্রীষ্টধর্মবিরোধী বৈঠকে মিলিত হতে লাগলেন।

এইসময়েই সরকার একটি আইনের সাহায্যে পৈতৃক সম্পত্তির ওপর ধর্মান্তরিত হিন্দু অথবা মুসলমানের পূর্ণ অধিকার থাকবে ঘোষণা করেন। রক্ষণশীল সমাজ বিচলিত হয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও কিছু উদারপন্থীও রক্ষণশীলদের সঙ্গে কণ্ঠ যোগ করে। অপরদিকে সরকারী আইনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানালেন ধর্মান্তরিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'অবিচার' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের 'একবিংশ রাজ-নিয়ম দ্বারা হিন্দুদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা' তার জন্য রীতিমত আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবন্ধের শেষাংশে লেখকের বক্তব্য, 'কেবল মিশনরীদিগের উপদ্রবেই লোকে সর্বদা সশঙ্কিত, তাহাতে রাজপুরুষেরা যেরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুদিগের দুঃখস্রোত ক্রমাগত প্রবল হইতেই চলিল।'[৪১] 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠা খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত বাদ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

৪১ 'অবিচার' 'তত্ত্ববোধিনী', ৯৭ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৭৭৩ শক।

এইসময়ও বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশন বিশেষত অনুন্নত ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে তাদের ধর্মপ্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছিল।[৪২] কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনচেতনার জন্য শিক্ষিতসমাজে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার অভিযান কিছুটা যে ব্যাহত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজপতিরা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। খ্রীষ্টান মিশনরিরা এতদিন একতরফা ভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করে আসছিলেন, কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করার পর, হিন্দুরাও খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রকাশ ও তা সুলভে প্রচার করতে লাগলেন এইসব পুস্তিকায় খ্রীষ্টধর্ম ও বাইবেলকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা হত। ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে মাসিক ইংরেজি পুস্তক প্রকাশ করতে লাগলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' মিশনরি উপদ্রবের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। খ্রীষ্টধর্মবিরোধী বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্রিকা প্রকাশ পেতে লাগল। ১৮৫৬-এ পেনের 'খ্রীষ্টিয়ানবিরোধী' 'এজ অব 'রীজনের' নতুন ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ব্রাহ্মধর্ম আর খ্রীষ্টধর্মের বিরোধও এইসময় পৌঁছল চরম পর্যায়ে।

খ্রীষ্টধর্মস্রোত রোধ করার উদ্দেশ্যে সামান্য নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের সাহায্যে ধর্মান্তরিতদের পুনরায় সধর্মে গ্রহণ করা হতে লাগল, গঠিত হল 'পতিতোদ্ধার সভা'। ২৫. ৫. ১৮৫১-তে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 'পতিতোদ্ধার সভা'র প্রথম অধিবেশন হয়। আমড়াতলায় শিবচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে এই সভা বসত। ৫. ৬. ১৮৫১-তে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই সভাকে হিন্দুদের পক্ষে এই শতাব্দীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করলেও এর ফলে সনাতনধর্মের কোনো ইষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে 'সংবাদ শশধর' নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। বরং মিশনরি স্কুলে ছেলে পাঠানো বন্ধ করলে অধিকতর ফল হবে বলে পত্রিকাটি মত প্রকাশ করে।[৪৩] কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতৃকধর্মে ফিরে এল (অবশ্য আদর্শগত কারণে যাঁরা খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, তাঁদের বিশেষ কেউই পূর্বধর্মমতে প্রত্যাবর্তন করেন নি), কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পতিতোদ্ধারে দেখা দিল নিষ্ঠার অভাব, তাই শেষপর্যন্ত 'পতিতোদ্ধার সভা' ব্যর্থতারই আর এক নাম।

---

৪২ দ্র. 'তত্ত্ববোধিনী', ২৯ সংখ্যা, ১ পৌষ, ১৭৬৭ শক।

৪৩ 'পতিতোদ্ধার সভা', 'সংবাদ শশধর' থেকে পুনর্মুদ্রিত, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২৬. ৮. ১৮৫২।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এইসব কারণে শিক্ষিত মনে খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'কার 'কৃশ্চানী হুজুগে'র বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'কৃশ্চানি হুজুগ রাস্তার চলতি লণ্ঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো।[৪৪] এবং ১৮৬৩-তে বিষণ্ণ ডাফের ভারতবর্ষ ত্যাগের সঙ্গে সচেতন জনমনে খ্রীষ্ট-ধর্মবিস্তার প্রয়াসের একরকম অবসান ঘটল বলতে পারি।

(৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের সমস্ত প্রয়াসের কথা মনে রেখেও একথা বলতে পারি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী হিন্দুসমাজে ধর্মীয় মতবাদের দিক দিয়ে প্রধান আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। রামমোহন নিজের চেষ্টায় আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত শেখেন, এবং একাধিক ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসে ইংরেজিও তাঁর আয়ত্তে আসে। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ সাহায্য লাভ করেন জন-ডিগবির কাছ থেকে। রামমোহন শুধু ভাষাই নয় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থের সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁর একেশ্বরবাদী পৌত্তলিকতাবিরোধী ধর্মমত প্রথম ব্যক্ত হয় ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্-হিদীন'-এ। এ সময় তাঁর বয়স ৩০ বছর।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাঁর ধর্মমতকে কেন্দ্র করে সম্ভবত তাঁর পারিবারিক মনোমালিন্যের সূত্রপাত; যার জন্য তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে পিতার শ্রাদ্ধ করেন (১৮০৩, মে-জুন)। অবশ্য এই মনান্তরের মূল শুধু ধর্মীয় কারণ নাও হতে পারে, এর পেছনে আর্থিক কারণও থাকতে পারে।[৪৫] তবে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদি নিয়ে রামমোহন ও তাঁর মার মধ্যে যে মতান্তর হত, তার প্রমাণ, ১৮১৭-তে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ভাইপো গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মামলায় রামমোহনের পক্ষ হতে তারিণী দেবীকে জেরা করবার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈরী হয় তাতেই পাই।[৪৬]

৪৪ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ), পৃ. ৫৩।

৪৫ 'রামমোহন রায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), পৃ. ৪৩-৪।

৪৬ প্রশ্নাবলীর জন্য দ্র. ঐ. পৃ. ৪৫-৬।

রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধার পর ধর্মসম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। এই সময়ই তিনি লাঙ্গুলপাড়ার পৈতৃক বাড়ির অর্ধাংশ ভাগনে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করে বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার থেকে মুক্ত হন।[৪৭] ১৮১৫-তে তাঁর 'আত্মীয়সভা'র সূত্রপাত এবং 'বেদান্ত গ্রন্থে'র প্রকাশ। অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি তখন তাঁর নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছেন।

ধর্মসংস্কারক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে রামমোহন দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সমস্ত শাস্ত্র খুঁটিয়ে পড়ে, সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সর্বধর্মজ্ঞান, বহুপাঠ ইত্যাদি দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি সমকালীন হিন্দু বা ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছিল তাঁর সহজ সাধ্যের মধ্যে।

রামমোহন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, তাঁর মতে প্রাচীন হিন্দুধর্মশাস্ত্রও এই কথাই বলে। তিনি তাঁর একেশ্বরবাদী মত প্রচার-কল্পে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ করতে লাগলেন, সভা স্থাপন করে আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে অপৌত্তলিক মতামত প্রচার করতে লাগলেন। একদিকে যেমন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন 'আত্মীয়সভা'র ধনী 'আত্মীয়'রা, অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল হিন্দুর দল তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। তাঁদের চোখে রামমোহন হিন্দুধর্মের বিশেষ অনিষ্টকারী রূপে প্রতিভাত হলেন। ব্রাহ্মণরা দুবার তাঁর জীবননাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেন।

রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'য় শাস্ত্রীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধি নিষেধ ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত, কিছুটা সামাজিক কল্যাণচিন্তা তাঁকে প্রচলিত ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। অবশ্য 'আত্মীয়-সভা'র মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বেদান্ত। সেই কারণে 'আত্মীয়সভা'র আত্মীয়রা সেযুগে 'বৈদান্তিক' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[৪৮] সমাজে রামমোহনের ধর্মীয় মতামত উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে অনেকে 'আত্মীয়সভা'র সংস্রব ত্যাগ করেন। 'আত্মীয়সভা'র সভ্যদের সাধারণে নাস্তিক ও স্বেচ্ছাচারী বলতে থাকে। জয়কৃষ্ণ সিংহ নামে রামমোহনের এক প্রাক্তন বন্ধু 'আত্মীয়সভা'য় গো-হত্যা হয়, এ কথা রটনা করতেও পেছপা হন নি। এবং এইসব কারণেই 'আত্মীয়সভা' খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৪৭ ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৬।

৪৮ 'বেদান্ত মত', 'সমাচার দর্পণ', ৫৩ সংখ্যা, ২২. ৫. ১৮১৯।

রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের এ সময় পৃথক কোন উপাসনাগার না থাকায় তাঁরা আডামের উপাসনামন্দিরে মিলিত হতেন। এক রবিবার তিনি আডামের উপাসনামন্দির থেকে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে ফিরছিলেন, যেতে যেতে চন্দ্রশেখর দেব তাঁকে বলেন, 'দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি। আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?'[৪৯] কথাটা রামমোহনের মনে ধরে। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, মথুরানাথ মল্লিক ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করে 'সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থ' চিৎপুরে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে সমাজের কাজ আরম্ভ করেন (মতান্তরে নিজের 'ইউনিটারিয়ান মিশনে'র ব্যর্থতা দেখে আডামই বিকল্প হিসাবে তাঁকে এ ধরনের একটি সভা স্থাপনের পরামর্শ দেন)[৫০]। সভার প্রথম অধিবেশন হয় ২০.৮.১৮২৮-এ, নামকরণ হয় ব্রাহ্মসমাজ, তখনকার লোকে এবং সাময়িক পত্রিকাগুলি বলত ব্রহ্মসভা। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় ৭টা থেকে ৯টা এখানে ব্রহ্মোপাসনা হত। প্রথমে দুজন তেলুগু ব্রাহ্মণের বেদপাঠের পর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশের পর গানের সঙ্গে সভা শেষ হত। গান করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, পাখোয়াজ বাজাতেন গোলাম আব্বাস। ডিরোজিও-শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী হলেন সমাজের প্রথম সম্পাদক।

ব্রহ্মসভা তার নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসে ২৩.১.১৮৩০-এ। এই-দিনই নতুন বাড়িতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। উদ্বোধনের দিন শ'পাঁচেক হিন্দু উপস্থিত ছিলেন, রামমোহনের বন্ধু মন্টগোমারি মার্টিন এসেছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য হলেন রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ। অদ্বৈতবাদী রামমোহনের ধর্মীয় উদারতার পরিচয় মেলে ব্রাহ্ম-সমাজের 'ট্রস্টডীডে'।[৫১] ধর্মপরায়ণ সকলশ্রেণীর লোকের বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু ট্রস্টডীডে স্পষ্ট বলা হয়েছে কোনো সাম্প্রদায়িক নামে বিশ্বস্রষ্টার উপাসনা এখানে হতে পারবে না। কোনোরকম চিত্র, প্রতিমূর্তি বা খোদিতমূর্তির ব্যবহার ছিল

৪৯ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৯৮।

৫০ '*History of the Brahmo Samaj*' (Vol. 1), Sivanath Sastri, P. 38-9.

৫১ মূল ইংরেজি ট্রস্টডীড ও বাংলায় তার সারকথার জন্য দ্র. 'তত্ত্ববোধিনী', ৯০ সংখ্যা, মাঘ, ১৭৭২ শক, পৃ. ১৫০-৩।

নিষিদ্ধ। প্রাণীহিংসা ও পানভোজনও নিষিদ্ধ ছিল। এখানে কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা চলবে না। প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতা প্রভৃতি যাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার প্রসার হয় এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেইরকম ছাড়া অন্য কোনো উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হবে না-তাও বলা হয়।

ট্রস্টডীডে এসব লেখা থাকা সত্ত্বেও কালে ব্রহ্মসভা কতখানি সংস্কার-মুক্ত হতে পেরেছিল সন্দেহের বিষয়। 'উদার অসাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এমনকি বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে ১৬, ১২, ১০, ৮, ৬, ৫, ৪, ৩, ২ ইত্যাদি টাকা প্রণামী দেওয়া হত। কেন তা বুঝতে অক্ষম হয়ে ডিরোজিওর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' মন্তব্য করে, 'It is the same humbug under another name'[৫২] ১৯শে ভাদ্র, ১২৩৮ শ'দুয়েক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করে এনে ব্রহ্মসভা প্রণামী দিতে কসুর করে নি।[৫৩] আর ব্রাহ্মসমাজে শূদ্রের সাক্ষাতে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ থাকার কথা তো বহুশ্রুত।

রামমোহন নিজেকে বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী মনে করতেন। ভারতের শাশ্বতবানী বেদান্তের মধ্যে নিহিত এবং এর মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তারই সাহায্যে হিন্দুধর্ম বিশ্বধর্মের শক্তি অর্জন করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। প্রচলিত আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মকে সমসাময়িক তুচ্ছতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি বেদান্তগ্রন্থ ও বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ করে, পৌত্তলিকতা বিরোধী মতামত প্রকাশ করে ও প্রচলিত অর্থহীন অনুষ্ঠানের সমালোচনা করে হিন্দু সমাজপতিদের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন। যুক্তিবাদী ইসলামী একেশ্বরবাদ, খ্রীষ্টের মানবপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ ও বৈদান্তিক ভাবধারা-এই তিনের সমন্বয় তাঁর ধর্মভাবনার মধ্যে লক্ষণীয়। রামমোহনের বৈদান্তিক মতামত গোঁড়া হিন্দুদের উত্তেজিত করে তুলেছিল, 'জবরদস্ত মৌলবী' হিসাবে পরিচিত হলেও কোরানের প্রতি তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদেরও তৃপ্ত করতে পারেনি, অন্যদিকে যুক্তিসহ অসাধারণ শ্রদ্ধা নিয়ে যখন তিনি খ্রীষ্টের বিচারে ব্রতী

৫২ *'The India Gazette'*, 20. 9. 1831, reprinted from *the 'East Indian'*.

৫৩ 'ব্রহ্মসভা' ('সংবাদ তিমিরনাশক' থেকে পুনর্মুদ্রিত), 'সমাচার দর্পণ', ৬৯৬ সংখ্যা, ১৭. ৯. ১৮৩১।

হলেন, তখন গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরিরাও বিচলিত হয়ে তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। রামমোহনও শালীন ও সংযত ভাষায় তার প্রত্যুত্তর দিলেন, খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদকে তিনি বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অর্থহীন আনুগত্যে পর্যবসিত হয় নি। ১৮২০-১৮২৩ এই চারবছর তাঁর খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন ও বিতর্ক কাল। খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধবাদী এদেশের প্রথম ব্যক্তি রামমোহন। 'সংবাদ কৌমুদী'তে তিনি এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন, 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কটূক্তির উত্তরদানে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও অন্যত্র খ্রীষ্টানদের প্রতি পাণ্টা প্রশ্নে তাঁর এই মনোভাবই অভিব্যক্ত। কলকাতায় প্রথম লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচয়কালে বিশপ মিডলটন তিনি খ্রীষ্টান হয়েছেন ভেবে 'উন্নততর ধর্মগ্রহণের জন্য' তাঁকে অভিনন্দন জানালে, তিনি সবিনয়ে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিয়ে জানান, 'এক কুসংস্কারের বদলে আর এক কুসংস্কারকে বরণ করার জন্য তিনি কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করেন নি।'[৫৪]

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লিখিত 'ঈশোপনিষৎ'-এর ভূমিকায় রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে সমর্থন জানিয়ে, নিম্নাধিকারীর জন্য সাকার উপাসনাকে নির্দিষ্ট করলেন। 'আত্মীয়সভা'র আলোচনার বাইরে সম্ভবত এই প্রথম তিনি ঘোষণা করলেন, 'পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।' (প্রসঙ্গত স্মরণীয় সনাতন হিন্দুরা হিন্দুধর্মকে 'a system of culture' মনে করতেন। এতে ধর্মীয়ক্ষেত্রে অধিকারভেদ স্বীকৃত-অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপাসনা পদ্ধতি।) অথচ এ সময় ব্রহ্মসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পূজা-পার্বণ ইত্যাদি ব্যাপারে রীতিমতো উৎসাহ বজায় রেখেছিলেন।[৫৫]

রামমোহনের জীবনে ধর্মীয় বিবর্তনের রেখাচিত্রটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে জীবনের প্রথম ৩০ বছর তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মে আস্থাবান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা ভাবনা তাঁর মনে জাগলেও তার কোনো প্রকাশ নেই। যে কারণে ১৭৯৬-এ যখন তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন, তখন সেই সম্পত্তি গ্রহণের অন্যতম শর্ত বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার

৫৪ 'The India Gazette', 8. 10, 1829, Quoted in '*Social Ideas and Social Change in Bengal*' (1818-35), A. F. Salahuddin Ahmed, P. 37.

৫৫ '*Some Particulars relative to the Institution of the Brumha Shubha*', 'The Calcutta Christian Observer', March, 1833, P. 109.

বহনের দায়িত্ব মেনে নিয়েছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, এই সময়ই অন্যান্য কারণের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর ধর্মমত নিয়ে পারিবারিক মতান্তরের সূচনা, যার জন্য তিনি কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন। (অর্থাৎ তখনও প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর বিশ্বাস পুরো শিথিল হয় নি) সমসময়েই আরবী ফারসীতে একেশ্বরবাদী পুস্তিকা 'তুহফাৎ' প্রকাশ করে তিনি আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন। (একথা ১৮২০-তে প্রকাশিত 'An Appeal to the Christian Public'-এর ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন।) এ সময়কে বলতে পারি তাঁর ধর্মীয় ভাবনার উন্মেষ পর্ব।

১৮০৪-১৫ এই সময়কাল আমাদের মতে রামমোহনের ধর্ম অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব। এ সময়ও তাঁর পদক্ষেপ কিছুটা দ্বিধা জড়িত। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদও তিনি পুরোপুরি পৌত্তলিকতা বিসর্জন দেন নি, এ সময়ও তিনি দেবপূজা করতেন ও প্রতিমা 'দর্শনার্থ' যেতেন, এ কথা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি।[৫৬]

এই সময়ে রামমোহন ঘোরতর বৈষয়িক পুরুষ, সুদে টাকা খাটাচ্ছেন, দেওয়ানী করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করছেন। যে সব কারণে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে নানারকম 'অপ্রশংসাসূচক' কথা শোনা যেত, এবং 'বোর্ড অব রেভিনিউ' তাঁকে স্থায়ীভাবে দেওয়ান নিযুক্ত করেন নি, এমনকি এ নিয়ে পেড়াপীড়ি করার জন্য ডিগবিকে মৃদু ভর্ৎসনাও সহ্য করতে হয়।[৫৭] কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পূর্বে তার দীর্ঘ প্রস্তুতি চলেছে বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার দ্বারা। যা প্রত্যক্ষভাবে রূপ পেল ১৮১৫-তে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠায় ও 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশে।

১৮১৫-৩০ পর্যন্ত সময়কালকে তাঁর ধর্মীয় জীবনের কর্মময় পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সময় তাঁর ধর্মমত পূর্ণ বিকশিত। এই সময়ে তাঁর কর্মপ্রয়াসের চারটি ভাগ: (ক) 'আত্মীয় সভা'য় বৈদান্তিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার আলোচনা, বিভিন্ন উপনিষদ অনুবাদ করে জনগণের মধ্যে একেশ্বরবাদী ধর্ম জিজ্ঞাসাকে প্রসারের চেষ্টা; (খ) ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে বিচার; (গ) খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের সঙ্গে বিচার ও বিতর্ক; (ঘ) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও তার ট্রস্টডীড প্রণয়ন।

৫৬ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪১।

৫৭ 'রামমোহন রায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩০।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলেত যান, এবং ১৮৩৩-এ ব্রিস্টলে তাঁর দেহান্ত ঘটে। অনেকে মনে করেন, ইংল্যাণ্ডে প্রবাসকালে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনের কথাও চিন্তা করেন। রামমোহন আজীবন খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও খ্রীষ্টীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কাজেই তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন করে পরিণত বয়সে 'অন্য এক কুসংস্কারের' শরণ নিতেন মনে হয় না। মৃত্যুকালেও তাঁর দেহে উপবীত বর্তমান ছিল, বিলেত থাকতে তিনি সবসময় জাত বাঁচিয়ে চলতেন। তাঁকে যেন হিন্দুমতে সৎকার করা হয়-তাঁর এই ইচ্ছাও আমাদের মতের সমর্থক প্রমাণ।

১৮২৮-এ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলেও রামমোহনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রচনাই ১৮২৩-এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এই সময়ই গোঁড়া হিন্দু ও প্রথানুগত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁর বিতর্কও এক রকম শেষ হয়। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেও নিজেকে হিন্দু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন না, তিনি বেদান্তগ্রন্থ ও উপনিষদ অনুবাদ করে হিন্দুধর্মের প্রকৃত একেশ্বরবাদী রূপটি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। মিঃ গর্ডনকে তিনি বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপক্ষ নন, তার সহায়ক। তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য চন্দ্রশেখর-দেবকে তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে তিনি বেদকেই পছন্দ করেন।[৫৮] হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানী আক্রমণের জবাব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন হিন্দু-ধর্মের অন্যতম তাত্ত্বিক রামমোহন। আসলে হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই তিনি তার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন খাদ্য ও পোষাকের ব্যাপারে অগতানুগতিক হলেও (যে কারণে 'পাষণ্ড পীড়নে'র লেখক তাঁকে কটাক্ষ করেন।) ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিসর্জন দেন নি। আগেই বলেছি পৈতে মৃত্যুকালেও তাঁর দেহে বর্তমান ছিল, বিলেতযাত্রার সময় ব্রাহ্মণ পাচক সংগ্রহ, বিলেত যাবার জাহাজে অন্যদের সঙ্গে একত্রে আহারগ্রহণে অসম্মতি, বিলেতে সর্বদা জাত বাঁচিয়ে চলার আগ্রহ, ব্রহ্মসভায় বেদপাঠের সময় অব্রাহ্মণের অনধিকার বিষয়ে সম্মতি, গুরুবাদ স্বীকার ইত্যাদি কারণে জাতিভেদ তিনি একেবারেই মানতেন না বলে আমাদের মনে হয় না। আসলে তিনি যতখানি ধর্মীয় পুরুষ ছিলেন,

৫৮ *'Reform and Regeneration in Bengal'* (1774-1823), **Dr. A. Mukherjee, P. 185.**

ততখানিই ছিলেন বৈষয়িক মানুষ, আর তারই প্রতিফলন এইসব পরস্পর-বিরোধী আচরণে।

রামমোহনের ধর্মীয় মতামত ও আচার আচরণ তদানীন্তন বাঙালী সমাজজীবনে (প্রধানত কলকাতায়) কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করলেও হিন্দুদের ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, প্রচুর বিত্ত, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, অগতানুগতিক আচরণ একদল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতকে আকৃষ্ট করলেও সাধারণ জনজীবনকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি।[৫৯] তাঁর একেশ্বরবাদ গ্রহণ ও পৌত্তলিকতা বর্জনের ডাকে সাধারণ বাঙালী সাড়া দেয় নি। তাই তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করার পর, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নামমাত্র অস্তিত্বই বজায় ছিল 'উদার অসাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মসমাজের: 'Brahma Sabha lives only in its weekly exhibitions of Native music and hired expositors of the veds. Its members are few and its spirits fled'.[৬০] এবং এই অবস্থার জন্য রামমোহন-অনুরাগীদের কার্যকলাপই প্রধানত দায়ী।

রামমোহনের আবেদন মুখ্যত মননশীল শিক্ষিত গোষ্ঠীর কাছে, 'আত্মীয়সভা' আর যাই হোক জনসভা ছিল না, বেদান্তগ্রন্থ বা উপনিষদের অনুবাদ পড়ে সাধারণ লোক কোনোরকম প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। রামমোহন ধর্মসাধক ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম সংস্কারক। তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন, নতুন একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত গড়ে তুলতে চান নি। সংস্কারক হিসাবে তিনি হৃদয় বা অনুভূতির কাছে তাঁর আবেদন না রেখে, রেখেছিলেন মনন ও বুদ্ধির কাছে। তাঁর আবেদনে আবেগের বিশেষ স্থান না থাকায় তাঁর গভীর দার্শনিক আবেদন জনমনে কোনো গভীর প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হয়েছিল।

রামমোহনের যে স্ববিরোধিতার কথা আমরা বলেছি, তাকে বহুগুণে

৫৯ ১৮৩১-এ কাঁচরাপাড়ার কাছে কয়েকজন 'নববাবু' 'পরম সত্য নামক বেদী' সংস্থাপন করে ৫০০০ লোককে এক পংক্তিতে বসিয়ে ভোজন করায়। ব্রাহ্মণ বিদায়, গীতা, বাইবেল, কোরান পাঠ সবকিছুই হয়েছিল। সবমিলিয়ে এটি 'নববাবুদিগের নবকীর্তি' ছাড়া আর কিছু নয়। দ্র. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), পৃ. ৫১৯।

৬০ *'Dharma Sabha'*, **'The Calcutta Christian Observer', May, 1838.**

অতিক্রম করেছিল তাঁর অনুরাগীদের কার্যকলাপ। বিষয়ী পুরুষ রামমোহন ব্যক্তিস্বার্থে মধ্যপন্থা অনুসরণ করলেও তাঁর অনুগামীদের মতো একই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার ও বাড়িতে সাকার উপাসনা করেন নি। কয়েকজন বিশিষ্ট রামমোহন অনুরাগীর কার্যকলাপের সামান্য পরিচয়ই তাঁর প্রচারিত চিন্তাধারার ব্যর্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রামমোহনের ছেলে রাধাপ্রসাদের প্রতিমাপূজার কথা না হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে বাদ দিলাম, কিন্তু তাঁর আর এক ছেলে, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রাস্টী রমাপ্রসাদ পিতার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পৌত্তলিক মতে মায়ের শ্রাদ্ধ করেন। হুতোমের ভাষায়, 'রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টী, মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন শুনে কার না কৌতুহল বাড়ে।'[৬১]

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনরায়ের প্রভাবে একেশ্বরবাদীতে পরিণত হলেও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন নি, প্রতিমা পূজা বা জপে তাঁর একটুও ভক্তি কমে নি। সাহেবসুবোদের সঙ্গে খানাপিনা করলেও খাবার শেষে গঙ্গাজল স্পর্শ ও বস্ত্রত্যাগ করে শুদ্ধ হতেন। তারপর যেদিন থেকে মেমসাহেবদের প্ররোচনায় তাঁদের সঙ্গে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হলেন, সেদিন থেকে দেবপূজা ত্যাগ করে ১৮ জন পুরোহিত নিযুক্ত করে তাঁদের দ্বারা সব কাজকর্ম করাতে লাগলেন। এ সময় হতে তিনি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেন না। পূজাপার্বণে ঠাকুরদালানে উঠতেন না, সাধারণ দর্শকের মতো উঠানে দাঁড়িয়ে দেবদেবী দর্শন করে প্রণাম করতেন। তাঁর ভ্রষ্টাচারের জন্য বাড়িতে তিনি একঘরে হন। কিন্তু তাঁর হিন্দু আচার-আচরণ ও বাড়িতে বারমাসে তেরপার্বণ অব্যাহত ছিল।[৬২]

পৌত্তলিকতাবিরোধী রামমোহনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও যে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন নি-তা সমকালীন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, 'শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে প্রকার

৬১ 'হুতোম পাঁচ্যার নকশা' (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ), পৃ. ৬৭

৬২ 'দ্বারকানাথ ঠাকুর', কিশোরীচাঁদ মিত্র (অনুবাদ: দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ), প্রসঙ্গকথা, পৃ. ২৬৩-৪।

জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই।... অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃকর্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উক্ত বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন...'[৬৩]

রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু 'আত্মীয়সভা' ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হলেও কোশাকুশি নিয়ে রোজ পূজা আহ্নিক করতেন, রামমোহনপন্থী ছাড়া অন্য কারো বাড়ি গেলে তুলসীর মালাটি গলায় ঝোলাতেও তাঁর ভুল হত না। সেকালে আরো অনেকেই যে এই ধরনের কপট আচরণ করত, ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী'ও তা স্বীকার না করে পারে নি। 'আত্মীয়-সভা'র নির্বাহক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের সামনে ব্রাহ্মধর্মে 'অচলাভক্তি' জানালেও, হরিমোহন ঠাকুরের কাছে রোজ গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মে 'দৃঢ় শ্রদ্ধা' প্রকাশ করতেন। 'অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেবনিন্দা ও পৌত্তলিকতার প্রতি দ্বেষ উক্তি করিতেন, ও আপনারদিগকে অতি শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন, রাজা আশুতোষ স্বভাবে তাঁহারদিগকে অতি সুবোধ জ্ঞান করিয়া ধন দান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা রাজার নিকেতন হইতে বহির্গত হইবামাত্র আপনারদিগের প্রচ্ছন্ন বেশ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি অতি কুশ্রাব্য কটূক্তি করিতে কিছু ত্রুটি করিতেন না।'[৬৪] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের দাদা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (যাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হরিহরানন্দনাথ-তীর্থস্বামী কুলাবধৌত) রামমোহনের 'সন্নিধানে ছায়াবৎ অনুগত' হলেও 'তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত' ছিলেন, 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনে' তাঁর একটুও নিষ্ঠা ছিল না। রামমোহন-অনুরাগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে 'সর্বদা স্বমতানুগত ব্যবহার' করতে পারতেন না। এমন কি 'লোকভয়ে' সহমরণ আইন রহিত করার জন্য রাজবিচারালয়ে সহমরণ পক্ষীয়দের আবেদনে তিনি সইও করেছিলেন।

৬৩ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), পৃ. ২৪১।

৬৪ 'তত্ত্ববোধিনী', ৫০ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৭৬৯ শক।

আরেক রামমোহন-অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের কর্তাব্যক্তি হয়েও বাড়িতে ঘটা করে দুর্গোৎসব করতে ছাড়তেন না। এজন্য ডিরোজিও তাঁর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ানে' তাঁকে কটাক্ষ করেন। প্রসন্নকুমারের এক ভক্ত অবশ্য 'রিফর্মারে' তাঁর আচরণকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। ব্যাপারটি নিয়ে সমকালে কিছুটা বাদানুবাদেরও সৃষ্টি হয়।[৬৫]

দেখা যাচ্ছে, রামমোহন-অনুরাগী ব্যক্তিদের কথার সঙ্গে কাজের বড় একটা মিল ছিল না। এই কারণেই 'ইয়ং বেঙ্গল 'হাফ রিফরমর' রামমোহনপন্থীদের খুব একটা প্রীতির চোখে দেখতেন না। 'এনকোয়েরারে' রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পর্কে বলা হয়, রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি মধ্যপন্থী। রামমোহনের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রামমোহনপন্থীদের মুখে এক, আর কাজে এক-তাঁদের কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়েছিল। সুবিধাবাদী রামমোহনপন্থীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো উপায়ে বিত্ত ও ক্ষমতা অর্জন। এর জন্য কোনোকিছু করতেই তাঁরা পেছপা ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের সুবিধামত কোনোরকম আচরণেই কুণ্ঠিত হতেন না, 'Before the bigots they are bigots ; before the liberals they are liberals ; before the whigs they are whigs ; and before the tories they are tories'.[৬৬] আলেকজাণ্ডার ডাফ রামমোহনপন্থীদের ধর্মীয় মতামতকে বলেছিলেন, 'scarcely half-liberalized'. ব্রহ্মসভার বিচিত্র কার্যকলাপ দেখে ডিরোজিওর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' এটিকে 'Brahminical Juggle' বলতে ইতস্তত করে নি।

ব্রাহ্মসমাজীদের এইসব আচরণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জনমনে বিশেষ কোনো দাগ কাটতে পারেন নি। প্রচলিত লোকাচারে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পায়নি, যে কারণে সাড়াও জাগেনি তাদের মধ্যে। রাজনারায়ণ বসুর মতে ধর্মসম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রধান তিনটি রামমোহনের সময় সিদ্ধ হয়নি। 'প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না ; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্তসূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ

---

৬৫ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. 'সমাচার দর্পণ', ৭০২ সংখ্যা, ২৯. ১০. ১৮৩১, পৃ. ৩৫৮-৯।

৬৬ 'দি ইংলিশম্যান', ১. ৬. ১৮৩৬, ডঃ সালাউদ্দিন আমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৩।

তখন ব্রাহ্মদল বলিয়া দলবদ্ধ কোনো সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য যাহা সকল ধর্মমূলে নিহিত আছে;...এক্ষণে যেমন সেই আত্মপ্রত্যয়-মূলক সত্যের উপর ব্রাহ্মধর্মকে স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না।' ৬৭

রামমোহনের বিলেত যাওয়ার পর ব্রাহ্মসমাজের দুর্দিন দেখা দিল। যাঁরা অর্থ সাহায্য করতেন, তাঁরা সাহায্য বন্ধ করলেন। শুধু দ্বারকানাথ ঠাকুর আজীবন সমাজের ব্যয় বাবদ প্রতিমাসে প্রথমে ৬০ টাকা ও পরে ৮০ টাকা করে দিতেন, সমাজের ব্যয় তাতেই কোনোরকমে চলত। দু'চারজন মাত্র লোক বুধবার সমাজে আসত, ব্রাহ্মসমাজের ক্ষীণ দীপশিখাটিকে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই কোনোরকমে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৩ শকে যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসেন, তখন তার অবস্থা ছিল শোচনীয়। রামমোহনের একেশ্বরবাদী আদর্শ থেকে অবতারবাদে তা নেমে এসেছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যখন যোগাযোগ ঘটল, তখন 'সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেইপ্রকারেই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন; ও তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন।' ৬৮

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে রামমোহন-প্রকাশিত ঈশোপনিষদের একটি উড়ে আসা ছেঁড়া পাতা থেকে, যার পরিণতি ১৮৩৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠায়। নিজের ধর্মজীবনের এই পরিবর্তনের কাহিনী দেবেন্দ্রনাথ 'স্বরচিত আত্মজীবনী'তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

৬.১০.১৮৩৯-এ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আচার্যপদে বরণ করে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ১০জন সভ্য নিয়ে এর কাজ আরম্ভ হয়, ১৮৪৬-এর মধ্যে সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩৮, ১৮৪৭-এ অর্থ সাহায্য-কারী সভ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭৪, অবশ্য ১৮৪৮-এ তা হ্রাস পেয়ে ৫০৫ জনে দাঁড়ায়। ৬৯ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতে পরবর্তীকালে এর সভ্যসংখ্যা বেড়ে ৮০০-র বেশি হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল, 'এদেশে কাল্পনিক ধর্ম নিবারণ-

৬৭ 'তত্ত্ববোধিনী', ২১১ সংখ্যা, ১৭৮২ শক।

৬৮ 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', পৃ. ১৬।

৬৯ '১৭৭০ শকের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় পুস্তকের ভূমিকা', 'তত্ত্ববোধিনী', শ্রাবণ, ১৭৭১ শক, পৃ. ৬৭।

পূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা' এবং 'বিবিধ উপায় দ্বারা' 'ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার' করা।[৭০] ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই হয়ে উঠল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র উদ্দেশ্য। ১৮৫৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেয়ে তা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। স্মরণীয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যদের মধ্যে শুধু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মরাই ছিলেন না, রামগোপাল ঘোষের মতো ডিরোজিও-শিষ্য কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ধর্মবিষয়ে উদাসীন মানুষও এই সভার সভ্য ছিলেন। আসলে এটি সে যুগের বিদগ্ধসভায় পরিণত হয়েছিল। কাজেই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সাফল্যের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সাফল্যকে এক করা যায় না। তার ওপর, এর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন নামেই সদস্য, সভার কাজকর্মে তাঁরা মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। যে কারণে, ব্রাহ্ম-সমাজের উজ্জ্বল যুগে, ১৮৪৯-এও নিয়মিত সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় 'সাম্বৎসরিক সভা' হতে পারে নি।[৭১]

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কাজকর্মের প্রতি ক্রমশ শিক্ষিত জনগণের কৌতূহল দেখা দিলে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মআদর্শের প্রতি যথার্থ আগ্রহীদের বাছার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। দীক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রও প্রস্তুত হয়। ১৮৪৩ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ আরও বিশজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজ পরিণত হল ব্রাহ্মধর্মে।

রামমোহনের আদর্শ থেকে দেবেন্দ্রনাথ বেশ কিছুটা সরে এসেছিলেন। 'ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ'কেই দেবেন্দ্রপন্থীরা বেদান্ত বর্লে গ্রহণ করতেন, বেদান্তদর্শনকে শ্রদ্ধা করতেন না। পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অদ্বৈত-বাদেরও বিরোধী হয়ে উঠলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে রামমোহনের 'উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি' পরিণত হল 'সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টি'তে। উপনিষদের ভাষ্য নতুন করে লিখে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশ করলেন। হিন্দুশাস্ত্র থেকে নিরাকার একেশ্বর উপাসনাপোযোগী সংস্কৃত বচন সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন, এটি হয়ে উঠল ব্রাহ্মদের ধর্মগ্রন্থ। 'রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদী ধর্মের আসন সরিয়ে, সেখানে সরল

৭০ 'তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৮ শক', 'তত্ত্ববোধিনী', ১ পৌষ, ১৭৬৮ শক।

৭১ 'তত্ত্ববোধিনী', জ্যৈষ্ঠ ১৭৭১ শক, পৃ. ৪০।

ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল, যা ছিল 'সমাজ', সর্বধর্মের ঈশ্বরবিশ্বাসীয় ব্রহ্মোপাসনার কেন্দ্র, The Universal Religion এর পীঠস্থান, তা হল 'মন্দির।'[৭২]

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারধর্মী হয়ে উঠল, নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ, উপাসনাবিধি, সহজ ভক্তিবাদী দৃষ্টি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল পরমতের প্রতি আক্রমণ। বৃত্তি দিয়ে ছাত্রদের ব্রাহ্মধর্ম অধ্যয়ন করান হতে লাগল, ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুশাস্ত্র থেকে মন্ত্রপাঠ ও 'খ্রীষ্টানীপ্রথায়' উপদেশ দানের ব্যবস্থা হল। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপন করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন ছাত্রদের সামনে ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যা করতে ও উপদেশ দিতে লাগলেন। বাংলাদেশের নানাজায়গায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। ১৮৫৮-এর মধ্যে বিভিন্নস্থানে ১৪টি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, বছর দশেক পরে ১৮৬৮-তে এই সংখ্যা পৌঁছল ৪৭-এ।

ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের মতো ভক্তিবাদী এবং অক্ষয়কুমারের মতো বস্তুবাদী দুইই ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে রামমোহন ও রামচন্দ্র-বিদ্যাবাগীশের মতো বেদবেদান্তের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করলেও পরে তাঁর বিশ্বাস পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের রীতিমতো লড়াই শুরু হয়। ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ শুরু করলে, খ্রীষ্টানরাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তিহীন বলে পালটা আক্রমণ করলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্তধর্ম, এবং বেদ তার অভ্রান্ত ভিত্তি-এই বলে প্রচার করতে লাগল। ব্রাহ্মরা প্রথমে বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাস করলেও, অল্পদিনেই সে বিশ্বাসে ভাঙন ধরে। ১৮৪৬-এর পৌষ-ফাল্গুনের 'জগদ্বন্ধু' পত্রিকায় 'বেদ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র নহে' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে এর প্রতিবাদ লিখতে বললে অক্ষয়কুমার তা লিখতে অস্বীকার করে বলেন; তিনি এরকম বিজ্ঞানবিরোধী মতের পোষকতা করতে পারবেন না, এবং ব্রাহ্মসমাজকেও এরকম কুসংস্কার-পূর্ণ ভ্রান্ত মতে ডুবে থাকতে দেবেন না। অক্ষয়কুমারের উত্তর শুনে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই প্রবন্ধ লিখতে অগ্রসর হলেন এবং রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে মিলে 'জগদ্বন্ধু' পত্রিকার রচনার প্রতিবাদ লিখে ১৭৬৮ শকের মাঘ ও চৈত্রের 'তত্ত্ববোধিনী'তে তা প্রকাশ করেন।[৭৩]

৭২ 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৫১।
৭৩ 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ২৭৬-৭।

বিষয়টি নিয়ে শুধু অক্ষয়কুমারের সঙ্গেই মতবিরোধ উপস্থিত হল না, এ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে বাইরে বিচার আরম্ভ হল। শেষপর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথও মানতে বাধ্য হন যে, বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নয়, কারণ এতে ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ বাক্য দেখা যায়। এর পরিবর্তে 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হয়। 'বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ১১ই মাঘ দিবসে সাংবাৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।'[৭৪]

বস্তুবাদী অক্ষয়কুমারের কাছে ব্রাহ্মধর্মের ভান অসহ্য মনে হয়েছিল। অক্ষয়কুমার মূলে বস্তুবাদী, কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে ধর্মের আওতায় এসে পড়েছিলেন। তার ফলে বিচিত্র বৈপরীত্য দেখা গেছে তাঁর ধর্মীয় আচরণে ও ভাবনায়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত না হবার জন্যই যেন ঈশ্বরকে 'সর্বশক্তিমান' না বলে তিনি বলেছেন 'বিচিত্র শক্তিমান', কখনও আবার হাত তুলে ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। আবার কখনও বা সমীকরণের সাহায্যে প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণে [পরিশ্রম = শস্য ; প্রার্থনা ও পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনার শক্তি = ০ ।][৭৫] ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার না করলেও 'গৃহপ্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। ঈশ্বরের সাকারনিরাকার তত্ত্বসম্বন্ধেও তাঁহার মত স্থির ছিল না।'[৭৬] দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীলোকদের দুর্বল অধিকারী স্থির করে পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যের দ্বারা তাঁরা ব্রহ্মোপাসনা করতে পারেন ঠিক করলেও অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় মত পালটাতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার মনে করতেন, 'মানুষের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।' জ্ঞানসাধক অক্ষয়কুমার ছিলেন মূলে বস্তুবাদী, আর সেজন্যই ধর্মবিষয়ে কথা বলার সময় বিচিত্র যুক্তির খেলা দেখাতেন।

দেবেন্দ্রনাথের সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রসার লাভ করে, অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে 'হিন্দু' এবং ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত রূপ বলে মনে করতেন। ১৭৭৮ শকের ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে লেখা হয়, 'একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ তাহা-

৭৪ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ৬৮।

৭৫ 'অক্ষয়চরিত', নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পৃ. ৩০।

৭৬ 'বাংলা সাময়িকসাহিত্য', কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ২৭৪।

হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্মের সেই একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।' জনৈক সমালোচকের অনুমান এটির লেখক স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ।'[৭৭] ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম নিষ্ঠাবান কর্মী রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে স্পষ্টই লিখেছেন, 'আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে করি।'[৭৮] হিন্দুধর্মকে তিনি সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৮২৬-৫৬) ব্রাহ্মধর্ম জনমনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথিতে ভোজ উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে খুব ভিড় হলেও বুধবার সমাজে লোক খুব কমই আসত, হুতোম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, 'ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত তাজিয়া পড়তে দেখতে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্জির বিড়াল?'[৭৯]

রামমোহনপন্থীদের মত দেবেন্দ্রপন্থীদেরও অনেকের আচরণ ছিল স্ববিরোধী। দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম আনতে না দিলেও পিতার কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। সনাতন হিন্দু গুরুবাদী রীতির অনুকরণে তিনিও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতদের মন্ত্রদান করতেন, অবশ্য ১৮৫০-এর পর এ রীতি পরিত্যক্ত হয়। অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ উভয়েই রামমোহন রায়ের পাষাণ মূর্তি স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। 'হিন্দুধর্মের সমুন্নত রূপ' ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগীরা হিন্দুদের যাবতীয় কুসংস্কার ইত্যাদিকে সযত্নে লালন করতেন। অনেক ব্রাহ্মকে সেযুগে বাড়িতে 'ভূতচতুর্দশীর প্রদীপ দিতে'ও দেখা যেত। অনেকে 'জগদীশ্বর একমাত্র' এটি জেনেও পুতুল পুজোয় আমোদ প্রকাশ করতে ছাড়তেন না। কলসী উৎসর্গ করা, কালীপূজা করা, বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর' খাওয়া কিছুতেই তাঁরা পেছপা হতেন না।

৭৭ 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী সভা', শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, 'ইতিহাস', ৫ম খণ্ড, ১ সংখ্যা পৃ. ৪৮।

৭৮ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ৮৬।

৭৯ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) পৃ. ৭১।

সমাজের কর্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, এই ধরনের ব্রাহ্মরা ব্রাহ্ম হবার পরও পৈতৃক ক্রিয়াকর্ম কিছুই বাদ দিতেন না (অনেকটা ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের মতো), একটু বেশ পরিবর্তন করে নিতেন এইমাত্র। ১৮৬৫-তে প্রকাশিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র' থেকে এ ধরনের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা তুলে ধরা যাক: 'একজন ব্রাহ্ম মাটির সরস্বতীর চূড়োর উপর "ওঁ তৎসৎ" লিখে পৌত্তলিকদের ঢাক ঢোলের পরিবর্ত্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়াম বাজিয়ে দুদণ্ড আয়েস কর্ব্বেন স্থির করেচেন। তিনি এজন্য দোষী হতে পারেন না। যখন ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম-অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্ম-জাতকর্ম্ম ব্রাহ্ম-সূতিকাপূজো ও ব্রাহ্ম-উপনয়ন প্রভৃতি চলচে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপূজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন?"[৮০] অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও এ বক্তব্যের সত্যতা এই পর্বের ব্রাহ্মদের আচার আচরণ থেকে অস্বীকার করা যায় না।

ব্রাহ্মদের এইসব পরস্পরবিরোধী আচরণ ও কার্যকলাপ সেযুগে তার প্রভাব বিস্তারের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল, একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

(৪)

১৮৩০ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা 'রাজা' রামমোহন বিলেত যাবার আগেই ইয়ংবেঙ্গলের অহিন্দু কার্যকলাপ সমাজে চাঞ্চল্য আনলেও রামমোহন তাঁদের কার্যকলাপকে ঠিক কি দৃষ্টিতে দেখতেন জানিনা, তবে ধর্মবিহীন 'উচ্ছৃঙ্খল' আচরণকে যে প্রীতির চোখে দেখেন নি-তা আগেই বলেছি। এবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মদৃষ্টির ঠিক কি রূপ ছিল।

ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে জানার পক্ষে আমাদের একান্ত সহায়ক হবে তাঁদের দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর ধর্মভাবনার সঙ্গে পরিচিতি। তিনি ছাড়া ডেভিড হেয়ারের প্রভাবও ইয়ংবেঙ্গলের ওপর যথেষ্ট পড়েছিল। ডিরোজিওর সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস যে তিনি নাস্তিক বা ঘোর সংশয়বাদী, হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্মচ্যুত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যে তিনটি অভিযোগ আনেন, তার প্রথমটি তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কিত। এই অভিযোগের উত্তরে তিনি সুস্পষ্টভাবে ডাঃ উইলসনকে জানান যে, তিনি

৮০ 'সমাজ কুচিত্র', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৬৯-৭০।

কখনও কারো সাক্ষাতে ঈশ্বরের অনস্তিত্বের কথা বলেন নি, তবে এই সঙ্গে এ বিষয়ে দার্শনিকদের মতভেদের কথা ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার কথা স্বীকার করেন। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধ বিশ্বাসী তৈরী করতে চান নি বলে, সবরকম মতামত নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহ জোগাতেন, ফলে অনেকের ধর্মবিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত নড়ে গিয়েছিল। চিঠিটি ডিরোজিওর সংশয়বাদী মনের রূপটি উদ্ঘাটিত করে। তিরিশের দশকের রক্ষণশীল বাংলা সাময়িকপত্রগুলি (যেমন 'সমাচার-চন্দ্রিকা' বা 'সংবাদ রত্নাকর') তাঁকে 'নাস্তিকের গুরু' বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করে নি।

ডিরোজিও যে শুধু হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের সমালোচনা-মুখর থাকতেন তাই নয়, খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও তাঁর মনোভাব খুব একটা অনুকূল ছিল না-অন্তত গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরিরা তাই মনে করতেন। টম পেনের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্রদের পরিচিত করেছিলেন। আর এজন্যই ডাফের চোখে ডিরোজিও নাস্তিক ও ঘোর সংশয়বাদী। 'Under such an influence, says Duff, the students "appeared merely a reflection of their master... Everything that was bad in the original became much worse in the copy. So that with such a teacher....the youngmen became perfectly outrageous in principle and practice." [৮১] মিশনরি সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, ডিরোজিওর প্রভাবে ছাত্ররা খ্রীষ্টধর্মের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর জনৈক লেখক হেয়ার এবং ডিরোজিওর খ্রীষ্টধর্মদ্বেষের কথা লিখেছেন, এমনকি বাইবেলের বিভিন্ন 'পবিত্র ঘটনা'কে ব্যঙ্গ ও অনুকরণ করতে যে তাঁদের বাধেনি, একথাও জানাতে ভোলেন নি। [৮২] খ্রীষ্টধর্মকে ডিরোজিও ঈশ্বর ও পতিত মানবাত্মার মধ্যে সংযোগসূত্র মনে করতেন না বলে 'ইনডিয়ান রেজিস্ট্রারে'র অজ্ঞাত-নামা লেখক জানিয়েছেন। [৮৩] ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী মনোভাব

৮১ Established Church of Scotland. Mss. Duff to Inglis, 31. 12. 1831. ডঃ কে. পি. সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৪।

৮২ *'History of Native Education in Bengal'*, 'The Calcutta Review', Vol. 17, 1852, P. 354.

৮৩ *'The India Gazette'*, 10. 2. 1832.

এই সময় প্রকট হয়ে ওঠে, পরবর্তীকালের গোঁড়া খ্রীষ্টান কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময় পাদরিদের বিকৃত বাংলা উচ্চারণের অনুকরণ করে মজা পেতেন। কলেজের ছাত্ররা একটি থিয়েটার শোতে মিশনরি ও তাঁর দেশীয় সহকারীর ভূমিকা অভিনয় করে মিশনরিদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন।[৮৪]

ডিরোজিওর এই সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সংশয়বাদের পেছনে আমরা সম্ভাব্য দুটি প্রভাব দেখতে পাই। প্রথম জীবনে তাঁর শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। এই ড্রামণ্ড ছিলেন ঘোর সংশয়ী এবং যুক্তিবাদী। তিনি হিউমের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন বলেও শোনা যায়। নাস্তিক এবং তার্কিক বলে সমকালে তাঁর কিছুটা অখ্যাতি রটেছিল। ডিরোজিওর যুক্তিবাদ এবং সংশয়বাদে দীক্ষা নিঃসন্দেহে কিছুটা তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডের প্রভাবে। কারণ, তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া সংশয়বাদের অনুকূল ছিল না। পিতার জীবৎ-কালে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময়ে বাইবেল পাঠ করতেন এবং ঐ বইটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, বাল্যকালে একবার তিনি বাই-বেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত রচনা পর্যন্ত করেছিলেন।[৮৫] তাঁর যুক্তিবাদী সংশয়ী মনকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন। এর ওপর সমকালীন বিশ্বের চিন্তাধারা ও ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিতি তাঁকে কুসংস্কারমুক্ত এক জগতে উত্তীর্ণ করেছিল, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের ছোঁয়া লেগেছিল তাঁর রোমান্টিক কবিমনে, যে বিপ্লব একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও চার্চের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে।

ডিরোজিওর ধর্মধারণা সম্পর্কে উল্টোদিকের সংবাদও আছে। অনেকের মতে জীবনের শেষমুহূর্তে ডিরোজিও স্বীকার করেন যে, তিনি একজন খ্রীষ্টান, এবং খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস নিয়ে তাঁর শেবনিঃশ্বাস পড়ে। ডিরোজিওর শুভার্থী ডাঃ গ্রান্টও অন্তিম মুহূর্তে তাঁর খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের কথা বলেছেন। 'ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার'-এর অজ্ঞাতনামা লেখকের মতে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর ('he had great respect for Christianity') যদিও ঐ একই প্রবন্ধে লেখক অন্যত্র বলেছেন, 'he did not view Christianity as a

৮৪ ডঃ কে. পি. সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৪।

৮৫ '*The India Gazette*', 10. 2. 1832.

communication from the Divinity to fallen man.'[৮৬] শেষশয্যায় ডিরোজিও নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে প্রার্থনা করার ইচ্ছা জানান, এবং তাঁর কাছে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য মৃত্যুশয্যাশায়িত ডিরোজিওকে রেভাঃ হিল যখন দেখতে আসেন, তখন সেখানে তাঁর অন্যতম ছাত্রশিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ (যিনি পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন) উপস্থিত ছিলেন, এবং ফিস ফিস করে বলা কয়েকটি কথা ছাড়া তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল, তা সবই তিনি শুনেছিলেন। তাঁর সাক্ষ্যানুসারে ডিরোজিও মৃত্যুকালীন কোনও স্বীকারোক্তি করেন নি, বা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করে কোনো কিছুতে সইও করেন নি।[৮৭] শেষ জীবনে ডিরোজিওর মানসিক পরিবর্তন রক্ষণশীল 'সংবাদ-রত্নাকরে'রও চোখ এড়ায় নি। যে কারণে ডিরোজিওর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, 'যদ্যপিও তিনি আমারদিগের ধর্মদ্বেষী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন তথাপি তাঁহার নিমিত্ত খেদ হয় যেহেতুক ড্রোজু পূর্বাপেক্ষা ইদানীং এমত হইয়াছিলেন ঈশ্বর একজন আছেন ইহা প্রায় স্বীকার করিয়াছিলেন...।'[৮৮]

উপরোক্ত দু'রকম মতামত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, এডওয়ার্ডস প্রমুখ একদলের মতে ডিরোজিও আজীবন সত্যানুসন্ধানী ছিলেন, এবং কখনও খ্রীষ্টধর্মে তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন নি। আবার অন্য এক-দলের (যেমন ডাঃ গ্রান্ট, 'ইণ্ডিয়ান রেজিস্ট্রার'-এর অজ্ঞাতনামা লেখক, 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে'র লেখক ইত্যাদি) মতে জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস জন্মেছিল, এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। মহেশচন্দ্র ঘোষ এ ধরনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্য রেভাঃ হিলের সঙ্গে ফিসফিস করে ডিরোজিওর যে কথা হয়েছিল, তা তিনি শুনতে পান নি। যাঁরা তাঁর অন্তিম মুহূর্তে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের কথা বলেন, তাঁদের কথাকে মূল্য দিতে গেলে আমাদের মেনে নিতে হয় রেভাঃ হিলের কাছে মৃদুস্বরে তিনি খ্রীষ্টধর্মে তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন, এবং এই কথাগুলিই মহেশচন্দ্র-

৮৬ '*The India Gazette*', 10. 2. 1832.

৮৭ '*Henry Derozio*', Thomas Edwards, P. 126.

৮৮ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৩।

ঘোষ শুনতে পান নি! তর্কের খাতিরে একথা মেনে নিয়ে আমরা বলতে পারি, যে ডিরোজিও যুক্তিবাদী, যাঁর দু'চোখে নতুন দিনের রঙীন স্বপ্ন—তিনি, আর যিনি অকালে কর্মচ্যুত, নানা আঘাতে জর্জরিত, সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতে বহুনিন্দিত, জীবিকার অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত, এবং মাত্র তেইশ বছর বয়সে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত, মৃত্যুপথযাত্রী শয্যাশায়ী সেই ডিরোজিও মানসিক শক্তির দিক দিয়ে একব্যক্তি নন। মৃত্যুশয্যায় যদি তাঁর খ্রীষ্টধর্মে সাময়িক বিশ্বাস এসে থাকে, বা তিনি পেশাদার ধর্মযাজকের সঙ্গে প্রার্থনা করতে স্বীকৃত হয়ে থাকেন, তা কি মৃত্যুভয়ভীত এক তরুণের অসহায় আর্তনাদ বলেই বিবেচিত হতে পারে না? কারণ মৃত্যুই তো মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় বিভীষিকা, তা নিয়ে আগে মানসিক বার্ধক্য। এ ধরনের স্বীকারোক্তির মূল্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। সে সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান রেজিস্ট্রার'-এর লেখকও অবহিত ছিলেন, এবং তা সত্ত্বেও দুর্বলকণ্ঠে তাকে সমর্থন জানাতে অবশ্য দ্বিধা করেন নি: 'Of this confession, some may be disposed to question the sufficiency; but we do not conceive anything more is necessary to salvation.' [৮৯]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যহৃত যুক্তিবাদী ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের খ্রীষ্টতত্ত্ব জানতে উৎসাহিত করতেন, একথাও আবার অস্বীকার করা যায় না। খ্রীষ্টীয় গোঁড়ামিকে সহ্য না করলেও খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের প্রতি তাঁর মনোভাবকে কিছুটা সহিষ্ণু উদাসীন বলতে পারি। সে কারণে তাঁর ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মকেই (খ্রীষ্টধর্মকে নয়) অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন, এবং প্রকাশ্যে তাঁদের অহিন্দু মনোভাব প্রকাশে দ্বিধা করতেন না। মাধবচন্দ্র মল্লিক ও তাঁর বন্ধুদের হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ-কোর্টে ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রকাশ্য আদালতে গঙ্গাজলের পবিত্রতায় অবিশ্বাস ঘোষণা, কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধবের পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণ বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপ, জনৈক কলেজ-ছাত্রের কালীঘাটে গিয়ে

৮৯ '*The India Gazette*', 10. 2. 1832. 'ইণ্ডিয়ান রেজিস্ট্রারে'র প্রবন্ধটি ১৩. ২. ১৮৩২-এর 'ক্যালকাটা গেজেটে' পুনর্মুদ্রিত হয়। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করে।

কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যডম্' সম্বোধন করা, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানান্বেষণে' হিন্দুধর্ম-কর্মের কুৎসা করা, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এনকোয়েররে' হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্রতম ঘৃণা প্রকাশ ইত্যাদির পাশে মিশনরিদের অদ্ভুত বাংলা উচ্চারণের অনুকৃতি বা মিশনরি প্রচার বা বাইবেলের কোনো ঘটনা বা চরিত্র নিয়ে একটু আধটু ঠাট্টা বিদ্রূপ করা তো তুলনায় নিতান্তই লঘু ব্যাপার। তবু যে মিশনরিরা ইয়ংবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিরূপ তার কারণ, কোনো প্রকার যুক্তিতর্কের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্মের বিচার ছিল তাঁদের কাছে অসহ্য, এমনই তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামি। তাই টম-পেন, হিউম ইত্যাদির নামেই তাঁরা শঙ্কিত। আসলে আমাদের মনে হয়, হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদল সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। জন্মসূত্রে হিন্দু হিসাবে তাঁরা হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে তাঁদের মূল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন।

ডিরোজিওর শিষ্যদের হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষের সুযোগ নিতে ডাফ কিভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, এবং ১৮৩০-এ তাঁর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত এক বক্তৃতাসভার আয়োজন করেছিলেন, তার উল্লেখ আগে করেছি। আমরা দেখতে পাই, দেখে বিস্মিতও হই, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের ডাফ-আয়োজিত এই আলোচনাসভায় যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন, যদিও ডেভিড হেয়ার ছিলেন এর বিপক্ষে। তারপর যখন সমাজে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, এবং হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের কলেজ ছাত্রদের কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আলোচনায় যোগ দেওয়া সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করার ফলে শ্রোতার অভাবে ডাফের প্রথম পর্যায়ের বক্তৃতামালার পরিসমাপ্তি ঘটল, তখন ম্যানেজারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমসাময়িক 'প্রগতিবাদী' পত্রিকাগুলি সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল, 'ইণ্ডিয়া গেজেট' তীব্র ভাষায় এভাবে খ্রীষ্টধর্মের কণ্ঠরোধ করার প্রতিবাদ জানিয়ে এমন কথাও বলল '...but a Christian Government and a Christian community will not tolerate that the managers of an institution, supported in part by public money, should single out Christianity as the only religion against which they direct their official influence and authority.' [৯০] শুধু তাই নয়, 'ইণ্ডিয়া-

৯০ টমাস এডওয়ার্ডসের 'হেনরি ডিরোজিও' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭২।

গেজেটে'র লেখক এই বক্তৃতামালার পুনরুজ্জীবন কামনা করে, ছাত্রদের ম্যানেজারদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এতে যোগ দিতে উৎসাহ যোগালেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র এই লেখাটির সঙ্গে ডিরোজিওর লেখার স্টাইলের গভীর সাদৃশ্য ডিরোজিওর জীবনীকার এডওয়ার্ডসের চোখে পড়েছে, পূর্বোক্ত বক্তৃতামালার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ডিরোজিও যে এর প্রতিবাদ করেছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রীও তা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ডিরোজিওর সঙ্গে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র গভীর এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, এবং এর সম্পাদক ডাঃ গ্রান্ট ছিলেন তাঁর একান্ত শুভানুধ্যায়ী। এই সমস্ত দিক বিচার করে আমাদের অনুমান, 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র পূর্বোক্ত লেখাটির লেখক স্বয়ং ডিরোজিও। আশ্চর্য ঘটনা 'যুক্তিবাদী' ডিরোজিও হিন্দুধর্মের স্থলে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজিত গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরিদের এই ধর্মালোচনাসভায় সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাঁর ছাত্রদের যোগ দিতে এবং খ্রীষ্টতত্ত্ব জানতে উৎসাহিত করেছিলেন!

খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে ডিরোজিওর ধারণাকে আমরা তুলনা করতে পারি রামমোহনের মতামতের সঙ্গে। রামমোহন ডাফ স্কুলের ছাত্রদের বাইবেল পড়ে, জেনে, বিচার করতে বলেছিলেন ('Read and Judge'), ডিরোজিওও তাঁর ছাত্রদের এ বিষয়ে জানতে এবং বিচার করতে উৎসাহিত করতেন, যার জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের ডাফের ধর্মালোচনা সভায় যোগ দিতে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। স্মরণীয়, রামমোহন এবং ডিরোজিও দুজনেই ছিলেন খ্রীষ্টীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, এবং খ্রীষ্টান মিশনরিরা তাঁদের শত্রু বলেই মনে করতেন। অবশ্য রামমোহন ছিলেন প্রধানত একজন ধর্মতাত্ত্বিক এবং ধর্মসংস্কারক, আর ডিরোজিও একজন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ, এবং সেযুগে অনেকের কাছে নাস্তিক বলেও পরিচিত। তাহলেও, তিনি সমস্ত ধর্মকেই একই দৃষ্টিতে দেখতেন মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি ছিলেন মূলত 'হিন্দু ধর্মদ্বেষী', যে কারণে 'সমাচার চন্দ্রিকা' তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনে বলে, 'তিনি বালকদিগকে অসদুপদেশ দ্বারা হিন্দুধর্ম পথে গমন রোধে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন⋯।'[৯১] কিন্তু তিনি খ্রীষ্টধর্মদ্বেষী ছিলেন কিনা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। 'ক্যালকাটা-রিভিউ'-এর লেখক খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ডিরোজিওর মনোভাবকে খ্রীষ্টধর্মবিরোধী

৯১ 'সমাচার দর্পণ' ('সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে পুনর্মুদ্রিত), ৭০৩ সংখ্যা, ৫. ১১. ১৮৩১।

('anti Christian') আখ্যা দিলেও[৯২] নিরপেক্ষ বিচারে, আমরা তা মানতে পারি না। প্রতিষ্ঠানগত ধর্মব্যবসায়ের বিরোধী হলেও ডিরোজিও মূল খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় সত্যে বিশ্বাস করতেন বলেই মনে হয়।

এইযুগে ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয় চিন্তাকে নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন ডেভিড হেয়ার। এদেশে শিক্ষাবিস্তারে নিবেদিত প্রাণ হেয়ারের সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গলের সম্পর্ক হৃদয়ঘটিত। নেপথ্য থেকে তিনি প্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল বা রামতনু উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতেন কিনা সন্দেহ, রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনকে প্রথম চাকরি দিয়েছিলেন তিনি, ব্যবসার ক্ষেত্রে রামগোপাল পরবর্তী কালে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার মূলেও তিনি। ১৮৩১-এ 'স্কুল-সোসাইটি' ও হিন্দুকলেজের ছাত্ররা যখন তাঁকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা জানান, তখন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে হেয়ারের কাছে তাঁদের ঋণ ভাষা পায়, 'Thou art the mother that suckest us.'

হেয়ার সাহেবের স্কুলে বাইবেল পড়ানো নিষিদ্ধ ছিল, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর কোনো পক্ষপাত ছিল না। খ্রীষ্টানরা তাঁকে 'আধা হিন্দু' বলতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনোপ্রকার ধর্মীয় হস্তক্ষেপের তিনি ছিলেন একান্ত বিরোধী। 'বাইবেল পড়া ছেলে' হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করবে এই আশঙ্কায় তিনি লালবিহারী দেকে নিজের স্কুলে ভর্তি করেন নি।[৯৩] তাঁর বিশ্বাস ছিল ডাফ স্কুলের সব ছাত্রই আধা খ্রীষ্টান। কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায় যখন খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে কৃতসংকল্প, তখন একদিন তাঁকে বিস্মিত করে হেয়ার তাঁর সঙ্গে দেখা করে 'এক কুসংস্কারের পরিবর্তে আর এক কুসংস্কার' গ্রহণ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃথাই।[৯৪] ঘটনাটি হেয়ারের ধর্ম সম্বন্ধে মনোভাব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। হেয়ার কোনো খ্রীষ্টান চার্চের অনুরাগী ছিলেন না, যে-কারণে খ্রীষ্টীয় কবরস্থানের পরিবর্তে তাঁকে **কলেজ স্কোয়ারে** সমাধিস্থ করতে হয় (স্মরণীয়, ডিরোজিওকে খ্রীষ্টীয় সমাধি ক্ষেত্রেই বিনা বাধায় সমাধিস্থ করা হয়)। ১৮৪২-এ তাঁর মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মৃতের

৯২ 'ক্যালক্যাটা রিভিউ'-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫৪।

৯৩ 'সেকালের লোক', মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ. ১৬৪।

৯৪ 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৪৯-৫০

প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাঁর বাইবেলের প্রতি বিরূপতা এবং দেশীয় যুবকদের ওপর তার ফলের আলোচনা করে, সেইসূত্রে তিনি যে সংশয়বাদী ছিলেন, এবং ছাত্রদের ধর্মতত্ত্ব জানার ব্যাপারে একটুও উৎসাহ যোগাতেন না, সেকথাও বলে। 'ফ্রেণ্ডে'র সুরে সুর মিলিয়ে 'চার্চ অব ইংলণ্ড ম্যাগাজিন'ও তাঁর ধর্মমতকে আক্রমণ করে তাঁকে নাস্তিক বলে, এবং তিনি খ্রীষ্টধর্মের কিছুই জানেন না, তাও। আমাদের মনে হয়, ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয় সংশয়, অন্তত প্রথম পর্বে, ধর্মের প্রতি গোঁড়ামিহীন ও আসক্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে হেয়ারের প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়।

ধর্মবিষয়ে ডিরোজিও এবং হেয়ার দুজনের তুলনা করে বলতে পারি, এঁদের দুজনেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, তবে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্ম জিজ্ঞাসাকে উৎসাহ যোগালেও, হেয়ার কখনও তা যোগাতেন না। ডিরোজিওর জীবৎকালে, তাঁর এবং হেয়ারের প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি বিরূপতা লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করা হতে লাগল।

৮.৯.১৮৩২-এ 'সমাচার দর্পণে' হিন্দু কলেজ সম্পর্কে লেখা হয়, 'হিন্দু কালেজের কএকজন ছাত্র নাস্তিক হইয়াছে, কেহ ২ খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে (এই সময় পর্যন্ত কেবল মহেশচন্দ্র ঘোষই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন), কেহ২ কখন হিন্দু কখন মুসলমান কখন বা খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বন করে ইহাতেই হিন্দুভদ্রলোকমাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, হিন্দু কালেজের দ্বারা যে দেশের উপকার হইবেক তাহা প্রায় কেহ স্বীকার করেন না বরঞ্চ ধর্ম-হানির সম্ভাবনা বুঝিয়া অনুপকার জ্ঞান করিতেছেন এইহেতুক গবর্ণমেণ্ট হিন্দুকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যদি ছাত্রসকল শিষ্ট শান্তরূপে ভদ্রসন্তানের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ সনাতন ধর্ম যাহা পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত তাহাই আচরণ করেন এবং তাহাতে কোন সন্দেহ উপস্থিত বা আপত্তি না করেন…।'[৯৫]

নাস্তিক হবার অর্থ যে সনাতন 'হিন্দুয়ানি মান্য' না করা তা 'সমাচার-চন্দ্রিকা' থেকেও বোঝা যায়। এ সম্পর্কে জুলাই, ১৮৪২-এর 'বেঙ্গল-স্পেকটেটর'-এ 'কস্যচিৎ পাঠকস্য'র অভিমত খুবই উপভোগ্য, '…এ দেশের যে সকল ব্যক্তিরা সুশিক্ষিত হইয়া হিন্দু ধর্মের কোন কোন অংশে অশ্রদ্ধা

৯৫ 'হিন্দুকালেজ', 'সমাচার দর্পণ', ৭৮২ সংখ্যা, ৮.৯.১৮৩২, পৃ. ৪২৬-৭।

করেন তাহাদিগকে পৌত্তলিক হিন্দু মহাশয়েরা নাস্তিক ও ম্লেচ্ছ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং মুসলমানেরাও, যে সকল ব্যক্তিরা কোরান না মানে, তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে…।' এই কারণেই ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী সে যুগে 'নাস্তিক' নামে পরিচিত ছিলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে ও সমসাময়িক পরিবেশের প্রভাবে হিন্দুধর্মকে যাঁরা যুক্তির সাহায্যে বিচারে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল কিন্তু নিতান্ত মুষ্টিমেয়। ৫. ৫. ১৮৩১-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা' এঁদের সংখ্যা ৩০/৪০ জনের বেশী নয় বলে মত প্রকাশ করে। অন্য সূত্র থেকেও আমরা একই হিসাব পাই। ডেভিড হেয়ার ৬. ৬. ১৮৩১-এ এডওয়ার্ড রায়ানকে সনাতন প্রথা আচার মেনে না চলায় অসহনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন ২০/৩০ জন যুবকের কথা লিখিত-ভাবে জানান।[৯৬]

'সনাতন ধর্মরক্ষা' বলতে 'ধর্মসভা'র মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' মনে করত, 'ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশজনের সাক্ষাৎ জিহ্মণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রাম নারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসীমালা ধারণ করিয়া সর্বদা হরিবোল ২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম রক্ষাকরণ পূর্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক বেটারদিগের তামাসা দেখুন।'[৯৭] বলা বাহুল্য ইয়ংবেঙ্গল এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই ছিলেন খড়্গহস্ত।

ডিরোজিওর মৃত্যু (২৬. ১২. ১৮৩১) ইয়ংবেঙ্গলের ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। সহসা তাঁরা নেতৃত্বহীন হলেন, আদর্শের দীপশিখাটি তাঁদের চোখের সামনে নিভে গেল, কোন পথে তাঁরা চলবেন তা তাঁরা সহসা ঠিক করে উঠতে পারলেন না। এবং ইয়ংবেঙ্গলের বয়সও বাড়ছিল। তাঁদের কাছে জীবিকার প্রশ্নটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছিল, তাঁদের অনেককে চাকরি নিতে হয়েছিল, ঘরসংসারেও তাঁরা জড়িয়ে পড়ছিলেন, এ সবেরই একত্রিত ফল-তাঁদের ধর্মীয় উগ্রতা হ্রাস। তাঁদের মিলনস্থল 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'

৯৬ 'Enclosure to Edward Ryan to Bentinck', 13.6.1831, 'Bentinck Papers', দ্র. এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৫ (পাদটীকা)।

৯৭ 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৯. ৫. ১৮৩১।

১৮৩৮-এ চরম সঙ্কটে পড়ে, ১৮৩৯-এর পর সম্ভবত এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ক্রমে দেখা গেল, ইয়ংবেঙ্গল বা 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে পরিচিত ডিরোজিওর ছাত্রবন্ধুদের উগ্রতা খুবই কমে গেছে, কেউ একেবারে উল্টোপথে গিয়ে হয়ে উঠেছেন গোঁড়া ধার্মিক, গোঁড়া খ্রীষ্টান বা গোঁড়া ব্রাহ্ম, বা গোঁড়া হিন্দু। দু'একজন অবশ্য তাঁদের যুক্তিবাদ আজীবন বজায় রেখে ধর্ম সম্পর্কে নিস্পৃহতা বা নাস্তিকতা বজায় রেখেছিলেন।

ডিরোজিওর ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই (দশমাসের মধ্যে) খ্রীষ্টান হন। মহেশচন্দ্র খ্রীষ্টান হবার অল্পদিন পরেই মারা যান, তবে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনের পর উচ্ছৃঙ্খল মহেশচন্দ্রের জীবনে নাকি পরিবর্তন এসেছিল। খ্রীষ্টান হবার পরে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রচারক ডাফের উদ্যোগে ধর্মান্তরিত হলেও, অল্পদিনের মধ্যে তিনি চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের মতামতের অনুরাগী হয়ে তাতে যোগ দেন, এবং মৃত্যুপর্যন্ত তার সভ্য থাকেন। কৃষ্ণমোহন খাঁটি মিশনরি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—যুক্তিহীন, ধর্মান্ধ-তাঁর নাম শুনলে সেযুগে অভিভাবকরা শঙ্কিত হতেন, ছেলে ভুলিয়ে এনে খ্রীষ্টান করা ছিল তাঁর কাজ। ডিরোজিওর উৎসাহে কৃষ্ণমোহনের মনে খ্রীষ্টধর্ম জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। অবশ্য ইউরোপীয় চালচলন ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অল্পবিস্তর দুর্বলতা তাঁর মনে বরাবরই ছিল (যদিও ডাফের সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি বলেছিলেন, খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না), তার প্রমাণ, গো-হাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে গৃহচ্যুতির পর বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের গৃহে অবস্থানকালে তাঁকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা, যে কারণে দক্ষিণারঞ্জনের বাবা তাঁকে জুতো ছুঁড়ে মারেন ও অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন।[৯৮] কৃষ্ণমোহনের অস্ফুট খ্রীষ্ট-অনুরক্তি দৃঢ়তর হল ডাফের প্রভাবে ও গৃহচ্যুতির পর অসহায় অবস্থায় নিছক বাঁচার তাগিদে। যুক্তিবাদী ডিরোজিওর শিষ্য অবশেষে 'যুক্তিহীন' ধর্মপ্রচারক! কৃষ্ণমোহনের পরবর্তী সকল কাজে কর্মে এবং রচনায় বিরামহীন ধর্মানুগত্য দেখা গেছে।

ব্রাহ্মধর্মীদের স্ববিরোধী কার্যকলাপ ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের তীব্র সমালোচনার বস্তু হলেও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মধ্যে রামমোহন-অনুরাগীর

---

৯৮ 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,' মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ. ৫৪-৫।

অভাব ছিল না, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার নেপথ্য প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তারাচাঁদ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদকও হন। ঘোরতর পৌত্তলিকতা-বিরোধী বলে খ্যাত তারাচাঁদ ডাফের ধর্মালোচনা সভাতেও অংশ নেন। ব্রাহ্মসমাজের আরেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শিবচন্দ্র দেব। যৌবনেই এঁর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হয় এবং মনে মনে একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েন, যদিও সাংসারিক অবস্থার জন্য তিনি 'প্রচলিত হিন্দু ক্রিয়াবিধি' পালন করতেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'When I was studying in the 4th class of the late Hindu College, under the tuition of Mr. D' Rozio,···my faith in the Hindu Religion was gone, and I became a believer in one God, or, in other words, a Deist. But my circumstances not permitting me to act according to my belief, I was obliged to conform to the rites and ceremonies inculcated in Hinduism'.[৯৯] (ইয়ংবেঙ্গল সবরকম ভণ্ডামি ও ভানের বিরোধী, যদিও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক শিবচন্দ্র দেব ঐ জিনিসগুলি বজায় রেখেই চলেছিলেন!) হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিত থাকতেন (১৮২৮-৩০), যদিও ১৮৫০-এ চল্লিশে পৌঁছে তবেই আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একদা ডিরোজিও-শিষ্য শিবচন্দ্র দেব আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। এর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ঐ ধর্মের আওতায় আনেন। ১৮৬৩-তে অবসর গ্রহণ করে তিনি স্বগ্রাম কোন্নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, এবং আন্তরিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম সাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'উন্নতিশীল ব্রাহ্ম'দের সঙ্গে যোগ দেন। দীর্ঘদিন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিও ছিলেন। তাঁর জীবন, শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় 'আদর্শ ব্রাহ্ম জীবন।'

প্যারীচাঁদ মিত্র বাল্যকালে সনাতন পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের আওতায় বেড়ে উঠেছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের সংস্পর্শে এসে তিনি কিছুটা যুক্তিবাদী হলেন; বিবিধ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে একেশ্বর-

৯৯ 'নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎ সহধর্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য', অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ২৪৩।

বাদে উপনীত হলেন; তাঁর এই বিশ্বাস জন্মাল, 'That there is but one God of infinite perfection, I became a theist or a Brahma',[১০০] এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেখা গেল অনেক বিষয়ে তিনি গোঁড়া রক্ষণশীল (সহমরণকে তিনি নারীর আত্মত্যাগের মহত্তম দৃষ্টান্ত মনে করতেন), 'নববিধান' দলের কার্যকলাপের তিনি সমালোচক, এবং 'উন্নত ব্রাহ্মদের' মধ্যে 'আসল ধর্ম-ভাবের' অভাবে বিচলিত। আসলে তাঁর সহানুভূতি ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের দিকে, সেই কারণেই অন্যান্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে তাঁর বাধে নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী-বিয়োগের পর প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে তিনি মনোনিবেশ করেন। বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেব হলেন এ বিষয়ে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা। প্রেততত্ত্ব থেকে থিওসফিতে পৌঁছতে তাঁর দেরী হল না। 'থিওসফিকাল সোসাইটি'র তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠলেন, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চায় নিজেই শুধু মনোনিবেশ করলেন না, অন্যদেরও উৎসাহিত করতে লাগলেন। ভণ্ডামি-বিরোধী ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম প্যারীচাঁদ, 'অপ্রকাশ্যরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্য-রূপে খাইতে বিহিত বোধ করিতেন না।'[১০১]

রামতনু লাহিড়ী ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ এবং নীতিপরায়ণ মানুষ। ক্ষেত্র-মোহন বসুর মতে, তিনি কোনো প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বরে তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি, এবং জীবনের প্রতিটি কাজ তাঁরই কাজ মনে করে সম্পাদন করতেন।[১০২] ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে ব্রাহ্মসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্তধর্ম ও বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলে একদিকে যেমন ঘোষণা করতে লাগলেন, অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বর্ষণ করতে লাগলেন কটূক্তি। এই দুইই ডিরোজিও-শিষ্যদের কাছে প্রীতিপদ মনে হয় নি। 'লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণের মুখে বেদের অভ্রান্ততাবাদ কপটতা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন; এবং খ্রীষ্টধর্মের নিন্দা অনুদারতা

১০০ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী'র ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১১।

১০১ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ২৩৬।

১০২ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৩৪৭।

বলিয়া প্রতীতি করিলেন, সুতরাং তিনি বেদান্তধর্মীদিগের সহিত সংযুক্ত হইলেন না; এবং তাঁহাদের মন্দিরের নির্মাণকার্যে বিশেষ সহায়তা করিলেন না।'[১০৩] রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে তিনি তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করে পরিশেষে লেখেন, 'Let the Votaries of all religions appeal to the reason of the fellow creatures and let him who has truth on his side prevail'.[১০৪] উত্তরকালে (১৮৬৯ থেকে) উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও আত্মীয়তা হয়, তিনি তাঁদের জন্য গর্বও অনুভব করতেন, কেশব সেনেরও তিনি ঘনিষ্ঠ হন। অবশ্য 'যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম' রামতনুর কিন্তু 'পাচক ব্রাহ্মণ' না হলে চলত না, বড় মেয়ের বিয়েও তিনি জাত বাঁচিয়ে ঠিক হিসাব করেই দিয়েছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম গোঁড়া ধনী হিন্দু পরিবারে, ইয়ংবেঙ্গল-রূপে তিনি হিন্দুধর্মদ্বেষী হয়ে ওঠেন, এবং 'জ্ঞানান্বেষণে'র পৃষ্ঠায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লড়ায়ে নেমে পড়েন। উত্তরকালে সেই একই ব্যক্তি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে 'টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।'[১০৫] রাজনারায়ণ বসু পরিবর্তিত দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে বলেন, 'দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত, কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন।' তিনি উপনিষদে বিশ্বাস করলেও বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করতেন না। উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। এজন্য রাজনারায়ণ বসু তাঁকে 'ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম' বলেছেন। প্রণবের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা, আর তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করতেন, তখন তাঁর চাপরাশীদের 'ওঁ অঙ্কিত তকমা পরিধান করাইতেন।'[১০৬] 'ব্রাহ্ম' দক্ষিণারঞ্জন অবশ্য 'প্রাণাধিক পুত্র' মনোহরলাল মুখোপাধ্যায়ের 'শুভোপনয়ন' কার্যে ঘটা করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত

১০৩ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৬৪।

১০৪ ঐ, পৃ. ১৬৫।

১০৫ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ১১১-২।

১০৬ ঐ, পৃ. ১১৩।

বিদায় করতে ভোলেন নি।[১০৭] দক্ষিণারঞ্জন অবশ্য নিজেকে শুধু ধর্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকই মনে করতেন না, নিজের আচরণকেও 'হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত' জ্ঞান করতেন।

ডিরোজিওর শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্র বরাবরই ছিলেন প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কারে বিশ্বাসী রক্ষণশীল মানুষ। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে তাঁদের কোনো উৎসাহ ছিল না। কর্মজীবনে উৎকোচ গ্রহণের হাজারো প্রলোভন সত্ত্বেও তা জয় করে তাঁরা সৎ কর্মচারী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। আচার আচরণে রক্ষণশীল হলেও কাউকে ক্ষুব্ধ করার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। গোঁড়া হিন্দু-সমাজপতি রাধাকান্ত দেবের জামাই অমৃতলাল মিত্র বন্ধুত্ব বজায় রেখেও কখনও ইয়ংবেঙ্গলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন নি।[১০৮]

রামগোপাল ঘোষ ডিরোজিওর প্রভাবে যুক্তিবাদী এবং সনাতন হিন্দু সংস্কারের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মনোভাব বজায় ছিল না। প্রথম জীবনে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা একাধিক ঘটনায় প্রকাশিত। তাঁর পিতামহের মৃত্যু হলে তাঁর স্ব-সমাজের লোকেরা রামগোপালকে 'হিন্দুধর্মবিদ্বেষী' বলে গোলমাল করার উপক্রম করলে তাঁর বাবা ভয় পেয়ে, তিনি যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ বিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন নি, তা বলার জন্য অনুরোধ করেন। বাবার এই অসহায় অনুরোধে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেও কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলতে অস্বীকার করেন। রামগোপালের অহিন্দু আচরণের জন্য লোকে তাঁর বাবাকে বলত 'গোখোর গোবিন্দ ঘোষ।' 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে যখন ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ দেখা দিল, তখন ব্রাহ্মদের তিনি 'কপট' ও 'ভণ্ড' বলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি হিন্দু হয়েছিলেন-একথা তাঁর জনৈক জীবনীকার 'সাহস' করে বলেছেন।[১০৯] তাঁর বাড়ির বিশাল পূজার দালানে দুর্গাপূজা, দোল সবকিছুই হত। কথকতা, মহাভারত পাঠ এসবও বাদ যেত না। তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীর প্রেতকৃত্য সম্পাদন করেন, এবং হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করেন। মায়ের শ্রাদ্ধও তিনি মহাসমারোহে নিষ্ঠাবান হিন্দুর

১০৭ 'সংবাদ প্রভাকর', ৪২৫৯ সংখ্যা, ২৫. ২. ১৮৫২।

১০৮ '*Henry Derozio*', Thomas Edwards, P. 130-1.

১০৯ 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৮।

মতো করেছিলেন।[১১০] অবশ্য খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাঁর ছিল না। তাঁর প্রথম যৌবনের মনোভাবের শেষপর্যন্ত কি পরিণতি হয়েছিল তা বোঝার জন্য একটু উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যাক, 'It is a pity that such a man in his latter days when Hindu society had undergone a complete bouleversement and caste was simply a badge of nominal social distinction without any of its former rigorous discipline, should have thrown himself at the feet of Dalopattees for the sake of 'caste' and thus belied his past'.[১১১]

রামতনু লাহিড়ী রসিককৃষ্ণ মল্লিককে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, প্যারীচাঁদ মিত্রও ডিরোজিও-শিষ্য চারজন 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গের' অন্যতম হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করেন। ডিরোজিওর প্রভাবে তিনি সনাতন হিন্দু আচার আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, এবং নিজের অহিন্দু আচার আচরণ ও বিশ্বাসের জন্য ঘরে বাইরে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ডিরোজিও-শিষ্যগোষ্ঠীর অন্য কাউকে তাঁর মতো লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। ১৮৩৪-এ জনৈক মধুসূদন দাসের মোকদ্দমায় জুরি হিসাবে শপথ গ্রহণের সময় রসিককৃষ্ণ প্রকাশ্য আদালতে গঙ্গার পবিত্রতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করে সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন (অবশ্য এর ক'বছর আগেই জনৈক রামমোহন-অনুরাগী প্রচলিত প্রথায় শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ১৮৩১-এ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ কোর্টে 'এনকোয়েরারে'র জন্য লাইসেন্স গ্রহণকালে এফিডেবিট করার সময় গঙ্গার পবিত্রতায় তাঁর অবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন), **'বেঙ্গল হরকরা'** এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, রসিককৃষ্ণ এই বলে শপথ গ্রহণে আপত্তি জানান যে তিনি তা বোঝেন না, এবং কোনো ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই। রসিককৃষ্ণ অবশ্য এক পত্রে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সাধারণের 'ভুল ধারণা' নিবারণের জন্য এই অপবাদের প্রতিবাদ করে লেখেন, কোনো ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই, এ কথা তিনি বলেন নি। 'কেবল গঙ্গাজলের শপথে আমার আপত্তি আছে এবং সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ যে একজন পণ্ডিত মন্ত্র পাঠপূর্বক

১১০ 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৮।

১১১ '*Ram Gopal Ghose*', Kristodas Paul, 'The Hindu Patriot', 27. 1. 1868, Vide '*Speeches of Ram Gopal Ghose*', P. xiv-xv.

শপথ করান ঐ মন্ত্র বুঝিতে না পারাতেও কিছু আপত্তি আছে।[১১২] এই প্রসঙ্গে তিনি বিচারপতির কাছে স্পষ্টভাষায় বলেন, 'ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য করি। আমি এখানে বলিতেছি যে, এক ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস কাহারও অপেক্ষা কম নহে।'[১১৩] রামমোহন-অনুরাগী রসিককৃষ্ণ যে একেশ্বরবাদী ছিলেন তা তাঁর লেখা চিঠিতেই প্রকাশ। অবশ্য প্রচলিত প্রতিমা-পূজায় তাঁর কোনো সহানুভূতি না থাকলেও হিন্দুধর্মকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নতুন কোনো ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয় বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, 'হিন্দুধর্মের বিশাল ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের সমস্ত সাধন প্রণালী বর্ণিত আছে এবং আনুষ্ঠানিকগণ কর্তৃক সেই সাধন প্রণালী অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন কোন ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নহে।'[১১৪] সব ধর্মের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, সেজন্য কোনো ধর্মেরই নিন্দা করা তিনি অনুচিত মনে করতেন। তিনি ধর্ম সমন্বয়েরও চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর ধর্মমতের একখানি পাণ্ডুলিপি ('Ethics of Religion') রেখে যান, তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী রসিককৃষ্ণর 'ধর্মভীরুতার' কথা জানিয়েছেন।

গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রথম জীবন থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতেন। পলি এবং অন্যান্য ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের রচনা তিনি পাঠ করেছিলেন বলে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর হেয়ার-জীবনীতে জানিয়েছেন। প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের 'রিফর্মারে' তিনি খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, 'এনকোয়েরারে'র পৃষ্ঠায় রস্ ডোনেলি ম্যাংগলস তার প্রত্যুত্তর দেন। গোবিন্দচন্দ্র পরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন বলে আমাদের অনুমান।

শান্ত প্রকৃতির নীরব অনুসন্ধিৎসু সোচ্চার হিন্দুধর্ম বিরোধী মাধব-চন্দ্র মল্লিক ১৮৩১-এ 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদকের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করে সগর্বে লেখেন, 'পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই।

১১২ 'সুপ্রীম কোর্ট। জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক', 'সমাচার দর্পণ', ১০১৪ সংখ্যা, ২০.১২.১৮৩৪।

১১৩ 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৮৩।

১১৪ 'সত্যনিষ্ঠ রসিককৃষ্ণ মল্লিক···মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত', কানাইলাল পাল, পৃ. ৫৩।

হিন্দুধর্ম কুকর্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোন প্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না।'[১১৫] মাধব মল্লিকের পত্র সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' মন্তব্য করে, 'বাবুর ঐ পত্র অতিশক্ত ও সাহসিকরূপে লিখিত আছে ফলতঃ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধোক্তি তাহাতে যেমত আছে তাদৃশ শক্ত ও হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ কথা আমরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের রচিত কখন দেখি নাই।'[১১৬] 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও মাধব মল্লিকের স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানায়। এমনকি খ্রীষ্টান মিশনরিরাও হিন্দুধর্মের কুৎসা প্রচারের সময় 'অতি বিজ্ঞ' মাধব মল্লিকের কথা উদ্ধৃত করতে লাগলেন।[১১৭] কিন্তু এই মাধব মল্লিকই এত শত লেখার পরও বাড়িতে দুর্গাপূজা করতে ভোলেন নি। চিৎপুর নিবাসী 'কস্যচিৎ এতদ্দেশীয়স্য' 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে লেখেন, 'শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক এত লিখনের পরও আপন বাটিতে দুর্গোৎসব করিয়াছেন ইহাতে দেরজু সাহেব কি কহেন ও তাঁহার মিত্র বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যাই বা কি বলেন।'[১১৮] ধরে নিলাম, এ সময় তিনি ছাত্র মাত্র, তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য বাড়ির অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে গৃহীত নাও হতে পারে। কিন্তু এসব ঘটনার বছর বারো পরেও 'ডেপুটি' মাধবচন্দ্র পারিবারিক শান্তির জন্য ধুমধাম করে বাড়িতে দুর্গাপূজা করতে ছাড়েন নি। এদিক দিয়ে তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরই সমগোত্রীয়।

ডিরোজিওর শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে 'মাত্র' একজনই বোধ হয় শেষপর্যন্ত যুক্তির পথ ধরে চলেছিলেন, সেখানে তিনি গুরুকেও অতিক্রম করেছিলেন—তিনি রাধানাথ শিকদার। যুক্তিবাদ এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে নিয়ে যায় না, সকল ধর্মেরই বিরোধী করে তোলে। নাস্তিকতাই তার পরিণতি।

১১৫ 'সমাচার দর্পণ', ৬৯৯ সংখ্যা, ৮.১০.১৮৩১ ; মাধবচন্দ্র মল্লিকের চিঠিটি ১.১০.১৮৩১-এর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১১৬ 'হিন্দু ফ্রী স্কুল', 'সমাচার দর্পণ', ৬৯৯ সংখ্যা, ৮. ১০. ১৮৩১।

১১৭ '*Wilson's Exposure of the Hindoo Religion*'(1847), P. 4.

১১৮ 'সমাচার দর্পণ,' ৭০২ সংখ্যা, ২৯.১০. ১৮৩১।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী, আজীবন যুক্তিবাদী রাধানাথ পরিণত বয়সেও গোঁড়ামি বা কুসংস্কারের কাছে মাথা নত করেন নি। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিস্পৃহতা শেষ জীবনেও পরিবর্তিত হয় নি। শারীরিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী রাধানাথ বিশ্বাস করতেন, কোনো জাতির চরিত্র ও কর্মক্ষমতা তাদের খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। গো-খাদকরা জগৎ শাসন করছে, কাজেই ভারতীয়রা যতদিন না প্রচুর পরিমাণে গোরুর মাংস খাওয়া অভ্যাস করবে, ততদিন তারা জগৎসভায় বড় আসন পাবে না—এই ছিল তাঁর মত। আজীবন গো-মাংসভোজী রাধানাথের মৃত্যুও নাকি হয় অতিরিক্ত গো-মাংস ভক্ষণজনিত চর্মরোগে। তাঁর অহিন্দু জীবনযাপন তাঁর বাবাকে যে দুঃখ দিয়েছিল,[১১৯] একথার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। রাধানাথ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, এবং অন্য কোনো ধর্মের আশ্রয় নেন নি। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্ভবত শেষদিন পর্যন্ত প্রথম যৌবনের যুক্তিনিষ্ঠাকে ধরে রেখেছিলেন, এবং কখনও ধর্ম বা ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করে, আপস করে পথ চলেন নি।

সুতরাং আমরা দেখলাম—ইয়ংবেঙ্গল শেষপর্যন্ত কোথায় পৌছেছিলেন। একমাত্র রাধানাথ শিকদারকে বাদ দিলে বাকি সকলেই কোনো একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরেছিলেন—'এক কুসংস্কারের বদলে অন্য কুসংস্কারকে।' কিন্তু তাঁদের যৌবনের যুক্তিবাদের প্রভাব সমাজজীবনে পড়েছিলই—যার প্রভাবে এযুগে কিছুসংখ্যক যুবক যুক্তির পথ ধরে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুতার্কিক এইসব যুবকদের সম্পর্কে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' মন্তব্য করে, 'এই সকল কতিপয় অল্পাশয় ক্ষীণ জাতি মনুষ্য নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় কুপথগামী হওত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেছে হায় কি ভগবানের চমৎকার খেলা'—[১২০] মানসিকতার দিক দিয়ে অক্ষয়-কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও আমরা এই দলে ফেলতে পারি। বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার শেষপর্যন্ত বোধহয় নিরীশ্বরবাদে পৌছেছিলেন, আর ঈশ্বরচন্দ্র নিরীশ্বরবাদী না হলেও, ঈশ্বর যে তাঁকে কামড়াতে আসবেন না একথা ভালভাবেই জানতেন। চিঠির শিরোভাগে 'শ্রীহরি সহায়' লিখলেও বা হিন্দু-মতে বাবা-মার শ্রাদ্ধ করলেও ছাত্রজীবনেই তিনি সন্ধ্যাপ্রার্থনা ভুলে গিয়ে-

১১৯ 'রাধানাথ শিকদার' (২য় প্রস্তাব), 'আর্যদর্শন', কার্তিক, ১২৯১, পৃ. ২৯১।
১২০ 'প্রেরিত পত্র', 'সমাচার চন্দ্রিকা', ২০৭৩ সংখ্যা, ৩১. ৭. ১৮৪৫, পৃ. ৩০৮।

ছিলেন। পাদরি সাহেবের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে হাসি-মসকরা ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ধর্ম সম্পর্কে তিনি অনেকটাই নিস্পৃহ ছিলেন। আর এর পেছনে ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাব অনেকখানি বলে আমাদের অনুমান।

(৫)

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোরতর দুর্দিন। পুঞ্জীভূত অনাচার, গ্লানি, হাজারো বিধিনিষেধে এই সময় প্রচলিত হিন্দুধর্মের অসহনীয় আকার। ধর্ম মানে তখন লোকাচার, কুসংস্কার, যার সুযোগে অধিকারভোগীদের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা। অতঃপর যখন নানাদিক থেকে হিন্দু-ধর্মের ওপর আক্রমণ হতে লাগল, তখন সনাতনীরা যুগধর্মের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাচীন সংস্কারকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্মের মর্যাদারক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা। কলকাতার হঠাৎ-ধনী সম্প্রদায় হয়ে উঠলেন তার সতর্ক প্রহরী। অনেক সময়ই তাঁরা মুখে যা বলতেন, কাজে তা করতেন না। মুখে হিন্দু আচারের গুণগান করে, সামনে না হলেও আড়ালে তাঁরা তাকে ভাঙতে দ্বিধা করতেন না। 'দি পার্সিকিউটেড' নাটকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্র-সম্পাদক লালচাঁদের মুখ দিয়ে তাকে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন।[১২১] প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-এ হেমচন্দ্রের মুখ দিয়ে এই একই কথা বলিয়েছেন, 'এক্ষণে হিন্দুয়ানীর মাহাত্ম্য বুঝিলাম লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই, প্রকাশ্যরূপে খাইলে পাপ। কপটতা পূজ্য-সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফেরেবি জুলুম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রীহরণ এ সকল কুকর্ম বলিয়া ধর্তব্য নয়—এসব কর্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না…দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মদ্যপানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিতরূপে

১২১ লালচাঁদ উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'Why do they not eat and drink in private? Why do the fools excite a noise about it? Who does not eat and drink in this age? Those who are looked upon as examples in virtues indulge in excesses.' '*The persecuted*', K. M. Banerji, Act 3, Scene 1.

করিলে জাতিচ্যুত হইবে'[১২২]—বলাবাহুল্য প্যারীচাঁদের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। হুতোম কলকাতার অনেক 'প্রকৃত হিন্দু দলপতির' আসল রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন: 'সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে একথা আমরা পূর্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে করতে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতে প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদায় দিয়ে স্নান করে পূজো কত্তে বসেন।'[১২৩] হুতোমের এই অনাবৃত বিবরণ যে অপ্রকৃত নয়, তার সমর্থন সমসাময়িক সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে আছে। 'জ্ঞানান্বেষণ' এইসব 'বিড়াল ব্রহ্মচারির' আসল রূপটি তুলে ধরে।[১২৪] নিকি, নিক্কণ ইত্যাদির নাচের তালে তালে এইসব সমাজপতিদের মনও দুলত। 'কোন ভাগ্যবান লোক'-এর সে যুগের প্রধান নর্তকী নিকীকে রক্ষিতা রাখার সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়েছিল। সেকালের নামকরা ধনী রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে রাসলীলার সময় 'তায়ফা নর্তকী'দের নাচ দেখে, সুখাদ্য খেয়ে এবং মদিরা পান করে নিমন্ত্রিতরা আমোদিত হয়েছিলেন।

বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে রক্ষণশীল হিন্দুরা সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতেন। হিন্দুয়ানি অবাধ ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অন্যতম উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৫. ১১. ১৮৩১-এ 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদকের কাছে একটি চিঠিতে জনৈক পত্রলেখক চন্দ্রিকাকারের উদ্দেশে লেখেন, 'চন্দ্রিকা সম্পাদক লিবারালেরদের প্রতি নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্মসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু বাবুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যুলঙ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহার্য না করেন, হইতে পারে যে তাঁহারা সতীধর্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন ঐ ধনের দ্বারা তাঁহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধর্মসভা সম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়েরা দুর্গোৎসবাদিতে মাংসাদ্যাহরণ করিয়া

---

১২২ 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ১৭৩।

১২৩ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ), পৃ. ৯৪।

১২৪ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৬৭ ৯।

ইষ্টসিদ্ধ করেন তাহা হিন্দুর বিধ্যনুসারে কিনা। গো-মাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কি নিমিত্ত তাঁহারা দুর্গার্চন বাটিতে বিফষ্টেক মটন্ চাপ ও বৎস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি ইত্যাদি নানাপ্রকার মদিরা আনয়ন করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্রিকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে এমত কোন ব্যক্তি কি ধর্মসভান্তঃপাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত দুর্গোৎসব সময়ে কাহার বাটিতে ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতিসুস্বাদু মাংসসকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর সাহেবেরদের স্থানে ভূরি ২ খাদ্যসামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল। হরিবোল ২ অতিধার্মিক শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে।

'প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক ঐ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু কহেন না ইহাতে তাঁহার অপরাধ নাই। যেহেতুক তৎসম্পৃক্তেরা পাথুরিয়াঘাটাতে স্ব ২ বাটিতে তদ্রূপ ভোজ নাচ করাইতেন, তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মৌনাবলম্বী আছেন।'[১২৫]

স্পষ্ট কারণে, পত্রলেখক এইসব ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেন নি। ৫.১০. ১৮৩১-এ 'A Guest at Each House' স্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি 'জন বুলে'র সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে, গত দুর্গোৎসবের সময় বিভিন্ন ধনী-গৃহে নাচ, গান ও আমোদ-প্রমোদের বিস্তৃত বিবরণ দেন। চিঠিটি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পুনর্মুদ্রিত করে। চিঠিটি থেকে জানা যায়, মহারাজা শ্রীকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণের নাতি কালীকৃষ্ণ ও তাঁর ভাইরা, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব—এঁরা সবাই দুর্গাপূজার সময় বাড়িতে নাচগানের জমজমাট আসর বসান। সাহেবদের আপ্যায়নের সবরকম ব্যবস্থাও করা হয়। 'They all observed the Doorgah festival and given their guests an excellent meal (?), for they feasted upon wines and liquors of all kinds, and had enough of eatables.'[১২৬] বলাবাহুল্য

১২৫ 'সমাচার দর্পণ', ৭০৩ সংখ্যা, ৫. ১১. ১৮৩১।
১২৬ '*The India Gazette*', 22. 10. 1831.

পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিরা সবাই ছিলেন 'ধর্মসভা'র উৎসাহী সদস্য এবং সনাতন হিন্দুধর্মের সদাজাগ্রত প্রহরী!

এখানেই শেষ নয়, হিন্দু সমাজপতিরা সমাজে নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্মের নামে দলাদলি, বিত্তের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে সতীপ্রথা নিবারিত হলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তার বিরুদ্ধে 'আপীল করণার্থ ও ধর্মবজায়' রাখার জন্য 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয়। 'ধর্মসভার তাৎপর্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্মকর্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি।'[১২৭] এরই অনুষঙ্গ স্বধর্মত্যাগীদের সংস্রব ত্যাগ। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার বৈঠকের দিন স্থির হয়। কলকাতা আর তার আশ-পাশের রক্ষণশীল প্রভাবশালী ধনীরা মিলিত হলেন এখানে। তাঁদের প্রথম কাজ হল সতী আইনের বিরুদ্ধে আপীল করা। ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' সোৎসাহে এঁদের মুখপত্র হয়ে উঠল। প্রথমদিকে এইসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ তিমিরনাশক' ও 'সংবাদ রত্নাকর' 'ধর্মসভা'র সমর্থকরূপে দেখা দিল। কাজ চালানোর জন্য প্রচুর টাকা উঠল। সমাজপতিরা ফরমান জারি করলেন 'সতীদ্বেষী'দের সঙ্গে কোনোরকম সংস্রব রাখা চলবে না। অবশ্য কার্যকালে, সাধারণ সভ্যদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, বিধান দেনেওয়ালা, জাত মারতে ওস্তাদ 'ধর্মসভা'র পণ্ডিতরাও এ নিয়ম মেনে চলতেন না। 'ধর্মসভা'র একটি বৈঠকে জনৈক উদয়চাঁদ দত্ত 'ধর্মসভা'র তিনজন পণ্ডিতের বিরুদ্ধে সতীদ্বেষীদের সঙ্গে সংস্রব রাখার অভিযোগ তোলেন।[১২৮] গোকুলনাথ মল্লিক ও রাধাকান্ত দেব 'ধর্মসভা'র এই দুই দলপতির বিরুদ্ধেও এ ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ' রাধাকান্ত দেবের নামে সরাসরি অভিযোগ এনে বলে, 'তিনি ধর্মসভার এক অধ্যক্ষ ও সতীদাহের দরখাস্ত আপনি প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি কি প্রকারে সতীদ্বেষীদিগের সংসর্গীয় শ্রীযুতবাবু হরলাল মিত্রজ মহাশয়ের সহিত সর্বদা নিমন্ত্রণামন্ত্রণ ব্যবহার করিতেছেন…।'[১২৯] এক-দিকে 'ধর্মসভা' সতীদ্বেষীদের মোকাবিলায় প্রস্তুত হল। অন্যদিকে ডিরোজিও

১২৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৮১।

১২৮ '*Annual Meeting of the Dhormo Shobha*', 'The Calcutta Christian Observer', June, 1833, P. 282.

১২৯ 'সমাচার দর্পণ' (জ্ঞানান্বেষণ থেকে পুনর্মুদ্রিত), ৭৬৪ সংখ্যা, ৭.৭. ১৮৩২।

ও ইয়ংবেঙ্গলের কার্যকলাপ তাদের ভাবিয়ে তুলল। 'ধর্মসভা'র কর্তাব্যক্তিরা জোর করে 'হিন্দুয়ানি' মান্য করাতে চাইলেন, ডিরোজিওকে পদচ্যুত করলেন, তাঁর ছাত্রশিষ্যদের একঘরে করলেন, ফলে মনে হল—তাঁরা জয়ী হয়েছেন।

কিন্তু জয় দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রিভি-কাউন্সিলে সতীপক্ষীয়দের চূড়ান্ত পরাজয়ে এবং আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে 'ধর্মসভা' শীঘ্রই শ্রীহীন হয়ে পড়ল, এর অস্তিত্ব বজায় রইল নামমাত্রই। 'ধর্মসভা' যে বাহ্যিক আচার-আচরণ রক্ষাতেই তার সব উদ্যম নিঃশেষ করে দিয়েছিল, তার প্রমাণ সমসাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে আছে। কে সতীদ্বেষীর সঙ্গে সংস্রব রাখছে, কে দোষ ক্ষালনার্থ 'শ্রীশ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করছে—এইসব ছিল 'ধর্মসভা'র আলোচ্য বিষয়। 'ধর্মসভা'র কার্যবিবরণীতে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব থাকত না, কোনো বৃহত্তর সমস্যাও আলোচিত হত না। এর আলোচ্য বিষয়ের দু'একটির উদাহরণ: সভার একটি বৈঠকে 'সতীদ্বেষী' কালীনাথ মুন্সীর কাছে যাবার জন্য জনৈক ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং তাকে তা মঞ্জুর করা হয়। আর একজন 'ধর্মসভা'র কাছে জানতে চায়, যেখানে আগে কোনো ম্লেচ্ছ থেকেছে, সেখানে কোনো হিন্দুর থাকা উচিত কিনা? সে যুগের প্রভাবশালী ব্যক্তি মতিলাল শীল জানতে চান, বিষ্ণু-উপাসক শূদ্ররা ব্রাহ্মণের কাছে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য কিনা? অন্য একজনের প্রশ্ন: 'if a Shudra has the privilege of offering libations?'[১৩০]

'আত্মীয় সভা' বা 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে'র তুলনায় 'ধর্মসভা'র দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। প্রাচ্য ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী 'ধর্মসভা'র কাজকর্ম কিন্তু পরিচালিত হত 'ইঙ্গরেজী নকশায়।'[১৩১] অন্যদের আচার-আচরণের নিষ্ঠাবান বিচারক 'ধর্মসভা' অবশ্য তার দলপতিদের আচারাদি সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা পালন করত। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখে, 'ধর্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিজ ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগের নিয়মভঙ্গ করিতেছেন…আমরা প্রার্থনা করি এক্ষণে যেন দলপতি মহাশয়েরা স্বীয় পরিবারগণের চরিত্র অবলোকন করিয়া অন্য ব্যক্তিকে শ্রেণীচ্যুত

---

১৩০ '*Annual Meeting of the Dhormo Shobha*', 'The Calcutta Christian Observer', June, 1833, P. 280-3।

১৩১ 'সমাচার দর্পণ', ৮২৬ সংখ্যা, ৯.২.১৮৩৩, পৃ. ৭২।

করেন।'[১৩২] ব্যাপার-স্যাপার দেখে শ্যামবাজারের জনৈক ব্রাহ্মণ ৫.৪.১৮৩৪-এ 'সমাচার দর্পণে' একটি চিঠিতে 'ধর্মসভা'র অধ্যক্ষ মহাশয়দের কাছে ৪টি প্রশ্ন করে তার উত্তর চান। চতুর্থ প্রশ্নটি এইরকম: 'এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্নিজান ও সুপনজান ও নিক্কি প্রভৃতি জবনী নর্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপসের সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একন্নভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে ঐ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদলির উদ্যোগে বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিনা।' শেষে পত্রলেখক মারাত্মক এক প্রশ্ন করে বসেছেন:

'যদি উপরিউক্ত মহাশয়েরা হিন্দুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্মসভার বিধিব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে থাকে তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো প্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্মসভায় অগ্রাহ্য হয়।'[১৩৩]

সতী আইন রদে ব্যর্থ হবার পরেও 'দেশের মঙ্গল ও ধর্মস্থাপনার্থ' 'ধর্মসভা'কে বজায় রাখার সিদ্ধান্ত যদিও করা হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সভার কার্যকলাপ নিছক দলাদলিতে পর্যবসিত হয়। 'ধর্মসভা'র দলাদলির কারণে পিতাপুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটত। দল বজায় রাখতে ও বিত্তবান দলপতির অনুগ্রহ লাভের আশায় এ ধরনের অমানবিক ঘটনাও ঘটত। ধর্মসভা-পন্থীদের এই ধরনের কার্যকলাপকে ধিক্কার জানিয়ে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল-স্পেক্টেটর' লেখে, 'ধর্মসভা স্থাপিত হইয়া এতাবৎকাল পর্যন্ত কি ফল জন্মিল? সভ্যগণেরা যাবজ্জীবন অন্যায়াচরণ করিয়া বরং কেবল অধর্মেরি বৃদ্ধি করিলেন এবং এক্ষণেও হিন্দু ধর্মাভিমানী হইয়া কেবল দলপতিত্ব রূপ স্ব ২ সম্ভ্রম মাত্র রক্ষা করিতেছেন।'[১৩৪] রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব—এঁরা সকলেই দলাদলিতে লিপ্ত ছিলেন। যে কারণে 'কস্যচিৎ পক্ষপাত রহিতস্য' ব্যক্তি 'সম্বাদ কৌমুদী'তে এক পত্রে 'ধর্মসভাতে শিশ্নোদর-পরায়ণ মনুষ্যই অধিক' বলতে দ্বিধা করেন নি।[১৩৫] 'সুকৃতিভঙ্গ', 'মিথ্যাশপথ', টাকা আত্মসাৎ প্রভৃতি 'ধর্মসভা'র ভূষণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রেত-শ্রাদ্ধে অনুমতি

১৩২ 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১.১১.১৮৪২, পৃ. ১২৯।

১৩৩ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৯৩-৪।

১৩৪ 'ধর্মসভার গত বৈঠক', 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১.৯.১৮৪২, পৃ. ৮৩।

১৩৫ 'সমাচার দর্পণ', ৮৪৪ সংখ্যা, ১৮.৪.১৮৩৩, পৃ. ১৮০।

দান করে, বা কেউ খ্রীষ্টান হলে তার পরিবার থেকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মোটা টাকা আদায় করে 'ধর্মসভা' ধর্মরক্ষা করত। 'ধর্মসভা'র এ ধরনের সংকীর্ণতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' লেখে, 'ধর্মসভা হয় স্বীয় লীলা সম্বরণ করুন অথবা সত্য ও ধর্মপরায়ণ হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি-করণের উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন।'[১৩৬] এসব কারণেই সমকালীন একটি পত্রিকা ধর্মসভা সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'The causes of the decay and dissolution were within itself.'[১৩৭]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রক্ষণশীল বাঙালী হিন্দুসমাজে গঠনমূলক এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কোনো একক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৩৪), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), বা ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) ব্যক্তিত্বের সবটাই নেতিবাচক (negative) না হলেও, তা ছিল স্ববিরোধে ভরা। যে কারণে নিজ পরিবারে যেখানে সতীপ্রথা নেই, তখনও রাধাকান্ত সতীপ্রথা নিবারণের বিরোধী! বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং বহুবিবাহকে শাস্ত্রানুমোদিত বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী রাধাকান্ত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শ সযত্নে বর্জন করতে চেয়েছেন, যদিও একটির সঙ্গে অপরটির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক রাধাকান্ত কিছুতেই প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানো সমর্থন করতে পারেন নি। নিজ গৃহে দুর্গোৎসবের সময় 'বীফষ্টীক বৎসমাংস ও মদিরা'র স্রোত প্রবাহিত করলেও, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গো-হাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণকে স্কুল সোসাইটি পরিচালিত পটলডাঙ্গা স্কুল থেকে কর্মচ্যুত করার ব্যাপারে তিনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরমবৈষ্ণব রাধাকান্ত দেবের সমস্ত আচরণ যে বৈষ্ণবোচিত ছিল না বলাই বাহুল্য। তাঁর মৃত্যুর পর আয়োজিত শোক-সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর প্রশংসা করে, তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় অগ্রবর্তী বলেন, একথা জেনেও আমরা বলতে পারি, রক্ষণশীলদের মধ্যে হয়তো তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পদক্ষেপ প্রায় কখনই সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে ঘটে নি। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁকে 'Patron of

১৩৬ 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১.১১.১৮৪২, পৃ. ১৩০।

১৩৭ '*Dharma Sabha*', 'The Calcutta Christian Observer', May, 1838, P. 295.

errors' বলে অভিহিত করে, তাঁর প্রতি কোনো অবিচার করেন নি। আর এক রক্ষণশীল নেতা হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ এডবোকেট ধর্মনিষ্ঠ চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকেও তিনি সতীপ্রথা পুনঃপ্রবর্তনের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্ত্রীশিক্ষার নামেই শঙ্কিত, কৌলীন্যপ্রথার সমর্থক। ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্য তিনি 'ধর্মসভা'র আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেন। 'ধর্মসভা'র কয়েকজন অধ্যক্ষ এজন্য তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হন। এ ব্যাপারে সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে হিসাব-প্রকাশ করতে পরামর্শ দেওয়ায়, তিনি 'সমাচার দর্পণ' ও 'রিফর্মার'-এর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন।[১৩৮] এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রচলিত হিন্দুধর্মকে সঠিক কোনো পথনির্দেশ যে করতে পারেন নি, সেকথা বলাই বাহুল্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমরা তাই দেখতে পাই—(ক) রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীরা হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চাইছেন, কিন্তু স্ববিরোধিতায় বহুলাংশে তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে; (খ) খ্রীষ্টান মিশনরিরা প্রবল উৎসাহে ধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছেন, কিছু সাফল্য পাচ্ছেন, কিন্তু এই চেষ্টাকালে দেখা যাচ্ছে পরধর্মের যুক্তিহীন কুৎসা করাকেই তাঁরা ধর্ম বিবেচনা করেছেন; (গ) এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের সমর্থক রক্ষণশীলেরা ইয়ংবেঙ্গল, রামমোহন ও রামমোহনপন্থী সংস্কারক এবং খ্রীষ্টান মিশনরিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আত্মসংস্কারের চেষ্টা না করে অচলায়তনের ঘণ্টাধ্বনি করে যাচ্ছেন প্রাণপণে।

১৩৮ 'সমাচার দর্পণ', ১০৩৯ সংখ্যা, ১৩. ৬. ১৮৩৫।

অচলায়তনে ফাটল ধরল, অচলায়তনের নাম মধ্যযুগীয় বাঙালীসমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্থিতিশীল, মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক জগতের অধিবাসী গ্রামীণ বাঙালীসমাজের কাছে বাইরের বৃহত্তর জগতের পরিচয় ছিল অনেকটাই অজানা। আর তাই প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বহুপ্রকার বিধিনিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালীসমাজ অচলায়তনেরই আর এক নাম।

কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর সেখানে দেখা দিল ফাটল। নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হল। ইংরেজি শিক্ষা এবং সেইসূত্রে আগত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের জন্ম দিল, সমাজ হল চঞ্চল, আলোড়িত। কিন্তু এতো পরের কথা, ইংরেজ অধিকারের ঠিক পরেই কি ঘটল দেখা যাক।

ইংরেজ-অধিকারের আগে পর্যন্ত বাঙালীসমাজে বংশমর্যাদাই ছিল সামাজিক প্রতিপত্তির প্রথম ধাপ। নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ক'বছরের মধ্যেই আপন শোষণ-কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখল। এল মন্বন্তর। আর এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার অগণিত মানুষই প্রাণ হারাল না, বাংলার প্রাচীন অভিজাত বংশের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হল।[১] তাঁদের শূন্যস্থান দখল করল ইংরেজ সংস্রবে অর্থশালী ভুঁইফোড় এক সম্প্রদায়। ইংরেজের অনুগৃহীত বংশ-মর্যাদাশূন্য শহরবাসী এই হঠাৎ-নবাবের দল বাঙালী সমাজজীবনে রাতারাতি আপন আসন করে নিল। বাঙালীসমাজে জন্মকৌলীন্যের দিন শেষ হল, এল বিত্তকৌলীন্যের দিন। বিত্তকুলীন, বংশমর্যাদাশূন্য এইসব হঠাৎ-নবাবদের রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত স্থূল। তাঁরা বাইনাচ দেখতেন, ইয়ারবক্সী নিয়ে মদ-মাংস খেয়ে লাম্পট্য করতেন, ছেলেমেয়ের বিয়ে বা বাবা-মার শ্রাদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খরচ করতেন, বাঁদরের বিয়ে দিতেন ঘটা করে, দুর্গাপূজার সময় সাহেবসুবোদের ডেকে এনে মদ-মাংস ও আনুষঙ্গিকে তৃপ্ত করতেন। মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে, উৎকোচ দিয়ে বা নিয়ে, জাল-জুয়াচুরি

১ 'from the year 1770 the ruin of two-thirds of old aristocracy of lower Bengal dates'. '*The Annals of Rural Bengal*' (1868), W. W. Hunter, P. 56-7

যা হোক করে কিছু পয়সা করতে পারলেই, সমাজে যে কেউ হয়ে উঠত মান্যগণ্য বিশিষ্ট। অর্থ যার-সম্মান তার, প্রতিপত্তি তার, সারা সমাজ তার পায়ের তলায়। এযুগের এক হঠাৎ-নবাব রামদুলাল সরকারের কথায় এ অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো কারণে তাঁর একদা আশ্রয়দাতা মদনমোহন দত্তের বংশধর কালীপ্রসাদ দত্তকে জাতিচ্যুত করা হলে তিনি সগর্বে তাঁর টাকার বাক্সে হাত রেখে বলেন, 'জাত আমার বাক্সের ভেতর।' আর শেষপর্যন্ত লাখ তিনেক টাকা খরচ করে জাতিচ্যুত কালীপ্রসাদকে জাতে তুলে নিজের কথা রাখেন।[২] টাকার জোরেই আর এক হঠাৎ-নবাব নবকৃষ্ণ কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে 'শ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর' নামে শিবমূর্তি স্থাপন করেন, ব্রাহ্মণরাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন।[৩] টাকার জোরেই অব্রাহ্মণ রাধাকান্ত দেব হয়ে দাঁড়ালেন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি। হিন্দুধর্মের যাবতীয় রীতিনীতির সতর্ক প্রহরী বলে কথিত 'ধর্মসভা'য় বিত্তবান অব্রাহ্মণরাই একাধিপত্য বিস্তার করলেন। বিত্তকৌলীন্য কিভাবে বর্ণকৌলীন্যকে অতিক্রম করেছিল, তার পরিচয় এযুগের এক নামকরা ধনী নিমু মল্লিকের আচরণে প্রকাশিত। এক ব্রাহ্মণ নিমু মল্লিকের চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁর কাছে প্রতিবিধানের জন্য গেলে, তিনি চাকর ডেকে 'বর্ণশ্রেষ্ঠ' ব্রাহ্মণকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেন। এই অপমানে সেই ব্রাহ্মণ পরের দিন তাঁর বাড়ির সামনে আত্মহত্যা করেন।[৪] ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট হঠাৎ-ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজন—এই বাবু সম্প্রদায় একদিকে যেমন জনসাধারণকে শোষণ করেছেন, অন্যদিকে নিজেদের স্বার্থেই এঁরা ইংরেজের প্রতি অতি বিশ্বস্ত, এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার সামাজিক স্থিতিতে একান্ত বিশ্বাসী। সামাজিক পরিবর্তন এঁরা আনেন নি, বা আনতেও চান নি। তা চাইলেন অন্য একদল।

এই 'অন্য একদল' নটীর নূপুরে আর মদের পেয়ালায় ডুব দিলেন না, চোখ খুলে সামনের দিকে তাকালেন, নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখলেন। এঁরা আলালের ঘরের দুলাল নন, এঁরা মধ্যবিত্ত। নবাবী আমলে ক্ষীণাকার অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান, প্রধানত চাকুরিজীবি এই মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরেজ আমলে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। আধুনিক সমাজ ইতিহাসে মধ্যবিত্তের যে একটি বিশেষ

২ '*A Lecture on the Life of Ramdoolal Dey*' (1868), G. C. Ghosh, P. 51.
৩ '*Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur*', N. N. Ghose, P. 179.
৪ '*Selections from Calcutta Gazettes*' (Vol. II), S. Karr, P. 230-1.

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে[৫], আধুনিক বাংলার সমাজ ইতিহাসে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তা পালন করেছেন, সে ভূমিকা সমাজ ইতিহাসের পালাবদলের। আগেই বলেছি, ইংরেজ অধিকারের পর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা বিস্তৃত হল। ইংরেজি শিক্ষা মানে 'ফিলজফর বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান চাষা'—এরকম ছড়া মুখস্থ করা শিক্ষা নয়, সেই শিক্ষা যা এক নতুন জগতের পরিচয় বহনকারী। আধুনিক যুগে অর্জিত এই বিদ্যা সামাজিক প্রতিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। তা একদিকে যেমন আনল সত্যনিষ্ঠা, পাপের প্রতি ঘৃণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধতা-অন্যদিকে নবার্জিত বিদ্যার জোরে চাকুরিসূত্রে বিত্ত অর্জন করে অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। বিদ্যাই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার। এ বিদ্যা অবশ্য শুধু নবার্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যাই নয়, কালপ্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাও সমাজে নতুন করে শ্রদ্ধামিশ্রিত স্থান পেল। বিদ্যা ও চারিত্রশক্তির জোরে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' রূপে সমাজে সম্মানিত হলেন, অন্যদিকে ইংরেজি-শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলও নিজের আসন করে নিলেন। ১৮৩৩-এর চার্টার এ্যাক্টে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী বেণ্টিঙ্কের আমলে ভারতীয়দের যখন উচ্চ সরকারি পদ দেওয়া হতে লাগল, তখন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল। ইংরেজি শিক্ষা বাংলার মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্তের সামনে এক নতুন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।[৬] কিছুসংখ্যক বাঙালীর মনে ধীরে ধীরে আসতে লাগল নবচেতনা, নবজিজ্ঞাসা। সতী, কৌলীন্য, দাসপ্রথা ইত্যাদি প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। সমাজ নাড়া খেল।

আর এই আলোড়নের সূত্র ধরেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীসমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল। রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরা সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক স্থিতিতে বিশ্বাসী, এবং এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অনেকক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে প্রবৃত্ত। দ্বিতীয় একদল মধ্যপন্থী (সমাজে এঁদের পরিচয় 'হাফ লিবারাল', 'হাফ রিফর্মর' ইত্যাদি নামে) প্রাচীন আচার রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে কিছুটা সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

৫ ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন, 'Where you had no middle class, you had no Renaissance and no reformation.'—শ্রীবিনয় ঘোষের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'য় উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৮।

৬ স্মরণীয়, ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ৯৫% ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা বৈদ্যসন্তান। দ্র. 'Social Change', Benoy Ghosh, '*Renascent Bengal*', P. 19.

দু'কূলই তাঁরা বজায় রাখতে চেয়েছেন,[৭] বিত্তের দিক থেকে সম্পন্ন, মধ্যবয়সী এইসব সংস্কারকরা সমাজে সামান্য আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, বৃহত্তর কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন নি। তৃতীয় একদল উগ্রপন্থী সংস্কারক—যাঁরা কিছুটা যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আচার-আচরণে দীক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, নবীনবয়স্ক এইসব সংস্কারকরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইলেন। শুধু সামাজিক বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধেই তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করলেন না, সামাজিক স্রোতকেও পরিবর্তিত করতে চাইলেন, অনেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক ধারণাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে প্রয়াসী হলেন। আর এসবের সাক্ষী রইল বাংলার অগণিত দরিদ্র মূক জনসাধারণ, যারা পল্লীবাসী, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত বা সর্বহারা, এবং বাংলার উনিশ শতকী শহুরে নবজিজ্ঞাসার আলোক বঞ্চিত।

নবজিজ্ঞাসা যাঁদের মনে এল, তাঁরা তাকে কিছুটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। সমাজে কিছুটা যুক্তিবাদ এলেও, সংস্কারের ক্ষেত্রে যুক্তিই একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠল না। যুক্তি জন্ম দিল সংশয়ের, তা থেকে এল জিজ্ঞাসা। আর এই জিজ্ঞাসার জবাব পাবার ও দেবার জন্য সংস্কারকরা শুরু করলেন শাস্ত্র ঘাঁটতে। রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী অথবা উগ্রপন্থী—সবাই নিজের মতো করে শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। সতীপ্রথা, কৌলীন্য, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে শাস্ত্র থেকে প্রমাণ খোঁজা হতে লাগল। প্রশ্ন জাগবে, সংস্কারকরা হঠাৎ শাস্ত্রবচনের ওপর এত গুরুত্ব দিতে লাগলেন কেন? নবজিজ্ঞাসার আলোকবঞ্চিত বাংলার অবহেলিত জনসাধারণের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত মনোভাবই এর অন্যতম কারণ। তাই সংস্কারকরা সংস্কারপ্রয়াসে শাস্ত্রবাক্যকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য সাধারণ লোক শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, প্রচলিত দেশাচারকেই তারা শাস্ত্রের বিধান মনে করত।[৮] এছাড়া এসময়ের বেশির ভাগ সংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায়, সংস্কারকরা শাস্ত্রবচনের সাহায্যেই সেগুলির

৭ দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্যতম মধ্যপন্থী-সংস্কারক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১-৬৮) কথাই ধরা যাক। 'ব্রাহ্ম' হয়েও তিনি বাড়িতে ঘটা করে দুর্গাপুজো করতেন। কৌলীন্যপ্রথার বিরোধী হলেও 'রক্ষণশীল' রাধাকান্ত দেবের মতো বিধবাবিবাহ ও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' এই অতি উৎসাহী সভ্যটি সরকারি চাকরি পাবার পরই এই এসোসিয়েশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেন।

৮ এই কারণেই রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে এগিয়েও প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। অবশ্য রামমোহন ও বিদ্যাসাগর শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলেও দুজনেই তাঁদের শেষ আবেদন রেখেছেন মানবিকতার কাছে।

যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই সময় সমাজমন সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী না হওয়ায় তাকে প্রস্তুত করার প্রাথমিক দায়িত্বও সংস্কারকদের নিতে হয়েছে—আর এ দায়িত্ব তাঁরা পালন করতে চেয়েছেন শাস্ত্রবচনের সাহায্যে। তাই সতীদাহর মতো অমানবিক প্রথার উচ্ছেদকল্পেও রামমোহন শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে, এ প্রথার সমর্থন যে শাস্ত্রে নেই তা দেখাতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগরও বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, বহু শাস্ত্র উদ্ধার করে তা প্রমাণ করেন। বহুবিবাহ 'যে শাস্ত্রানুমত বা ধর্মানুমত ব্যবহার' নয়, এবং তা নিবারিত হলে 'শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্মলোপের অণুমাত্র' সম্ভাবনা যে নেই, তা শাস্ত্রের সাহায্যেই তাঁকে প্রমাণ করতে হয়। এমনকি, উগ্রপন্থী ইয়ংবেঙ্গলও তাঁদের সীমিত সংস্কার প্রচেষ্টায় শাস্ত্রকে বিসর্জন দেন নি। এপ্রিল, ১৮৪২-এ ইয়ং-বেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' 'কোন পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত' 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামক পত্রপ্রবন্ধে বিধবাবিবাহ যে কেবল যুক্তিসঙ্গত নয়, এমনকি শাস্ত্রসম্মতও-তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই পত্রিকাতেই জুলাই, ১৮৪২-এ 'বিধবার পুনর্বিবাহ' প্রবন্ধে পূর্বোক্ত পত্রপ্রবন্ধটির আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়, 'এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না···উক্ত নিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রের বিপরীত।'[৯]

কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজমনকে প্রস্তুত করে সামাজিক পরিবর্তন আনা সময়সাপেক্ষ। তা জেনেও সমাজমনকে তৈরী না করে অনেক সংস্কারক সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। সতীপ্রথার অন্যতম বিরুদ্ধবাদী রামমোহন আইন করে এই প্রথা দূর করা যাবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ায় লর্ড বেণ্টিঙ্ককে আইন না করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বত্র সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না। 'রাজনিয়ম' দ্বারা বহুবিবাহ নিবারিত হলে 'আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল ?'—বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার দত্তও একথা না বলে পারেন নি।

পক্ষান্তরে আইনের সাহায্যে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনও অনেকে আনতে চাইলেন। খ্রীষ্টান মিশনরি, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। তাঁরা সরকারি আইন প্রয়োগ করে সামাজিক ধারণাকে পরিবর্তিত করতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য

৯ 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ৫ম সংখ্যা, জুলাই, ১৮৪২।

আরও বহু ব্যক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন জানান। বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য সরকারি আইনের সাহায্যপ্রার্থী হয়েও তিনি বিফল হয়েছিলেন। অবশ্য আইন করে সর্বক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন আনা যায় কিনা—এবং সমাজমন তাকে স্বীকার করে নেয় কিনা—এ এক অতি জটিল প্রশ্ন।

আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি—উনিশ শতকে বাঙালী সমাজজীবনে যে প্রথাগুলি অমানবিক, (যেমন সতী, দাসপ্রথা ইত্যাদি) সেইসব অমানবিক প্রথারোধে প্রণীত সরকারি আইনকে জনমন মেনে নিয়েছে। কিন্তু যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নটি মানবিকের চেয়ে বেশি সংস্কারগত সেখানে আইন করেও ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনা যায় নি, সমাজমনও তাকে স্বীকার করে নেয় নি। বিধবাবিবাহ আইনের ব্যর্থতাই তার প্রমাণ।

উনিশ শতকে বাঙালী সমাজজীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারী-জাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় বেদনার্দ্র, এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার-আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এসময় বাংলার চিন্তানায়করা নারী-কল্যাণেই যেন তাঁদের সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। যার প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ আইনে, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত এদেশীয় সংস্কারকদের কাছে স্বদেশীয় নারীর অসহায় লাঞ্ছিত রূপটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ সময়ের বাঙালী নারী যেন 'ক্যাপটিভ লেডি', আর তার উদ্ধারেই যেন তাঁরা কৃতসঙ্কল। বিস্ময়ের কথা, সংস্কারকরা যেখানে উৎপীড়িত নারীর দুঃখ মোচনে অগ্রসর, সেখানে তাঁরা সর্বস্বান্ত জনগণের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে উদাসীন। এই কালে শোষণে ও অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ে জনসাধারণ চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে থাকলেও নবোদিত সমাজচেতনায় তারা রয়ে গেল অবহেলিত ও উপেক্ষিত।

সব মিলিয়ে উনিশ শতকে এই নবোদিত সমাজচেতনা সমাজকে কিছুটা চঞ্চল করে তুলল, বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বাদ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। অচলায়তনও ভাঙতে আরম্ভ করল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে প্রথাটি সমাজকে সবচেয়ে আলোড়িত করে সেটি সহমরণ-বিষয়ক। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সতীপ্রথা প্রচলিত। শুধু ভারতবর্ষে কেন, প্রাচীনকালে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর আত্মবিসর্জন কম বেশি সারা পৃথিবীতে ছিল।[১০] স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার জন্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যসমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করত। বাংলাদেশে প্রাচীনকালেও যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, তা 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।[১১]

দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলায় সতীপ্রথা অতি প্রচলিত হয়ে ওঠে, সমাজও একে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করে নেয়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের পাতায় পাতায় সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণদেব ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে', মুকুন্দরাম ও দ্বিজমাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে', 'ময়নামতীর গানে', ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' এর উল্লেখ মেলে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এতবার এ প্রথার উল্লেখ এর অতি প্রচলনেরই প্রমাণ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সর্বত্রই বাঙালী লেখকরা অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে এই প্রথার উল্লেখ করেছেন, এর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন নি। কিন্তু শুধু কি স্ত্রীই স্বামীর সঙ্গে আত্মবিসর্জন দিতেন? ইতিহাস কি বলে?

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, শুধু স্ত্রীই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতেন তা নয়, পাঞ্জাব আর রাজস্থানে, অনেক মা ছেলের সঙ্গে পুড়ে মরতেন, তাঁদের বলা হত 'মা-সতী'। অনেক সময় বোনেরা ভায়ের সঙ্গে সহমরণে যেতেন। গুজরাট আর রাজস্থানে দাসরা প্রায়ই প্রভুর সঙ্গে সহমরণে যেত, বা যেতে বাধ্য হত। মুসলমানকে পোড়ানো হয়েছে, আর তাঁর স্ত্রী সহমরণে গেছেন—এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।[১২] মুসলমান রমণীর স্বামীর সঙ্গে কবরে সহগমন করার কথাও শোনা যায়। এমনকি ভাবী স্বামীর মৃত্যুতে সহগমন করার একটি ঘটনা আমাদের কাছের শহর চন্দননগরেই ঘটেছিল।

অতি সাধারণ স্ত্রীলোকও সতী হবার পর রাতারাতি লোকের সম্ভ্রমের

১০ '*Suttee*' (1928), E. Thompson, P. 24.
১১ 'বাঙালীর ইতিহাস' (সংক্ষেপিত সংস্করণ), নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ২৯২-৩।
১২ '*Suttee*', E. Thompson. P. 37-9.

পাত্রী হয়ে দাঁড়াতেন। সহমরণ এতই প্রচলিত হয়ে পড়েছিল যে, ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে জীবন্ত মায়ের চিতায় অগ্নিসংযোগ করতে দ্বিধা করত না। প্রাণভয়ে চিতা থেকে পলায়নপর মাকে ছেলে জোর করে চিতায় তুলছে এমন ঘটনাও বিরল ছিল না।[১৩] 'অসতী' নারীরা, এমন কি রক্ষিতারাও এযুগে সতী হতেন। কে সতী হবেন—তাই নিয়ে মৃত ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে রক্ষিতার বাদ-বিসংবাদের ঘটনাও অনেক সময় ঘটত। রক্ষিতাকে উৎকোচ দিয়ে স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা নারীর সহমরণে যাবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।[১৪] সতী দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসত—এটা ছিল তখনকার মানুষের কাছে উৎসবের নামান্তর। যেকারণে, কালীঘাটের এক সতীদাহের ঘটনার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন ইউরোপীয় সেখানে উপস্থিত হলে সতীর ভাই দুঃখের সঙ্গে তাদের জানায়, 'We were too late for the tamasah !'[১৫]

সতী হওয়াটা তখন একটা সহজ আচারের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, স্বামী মারা যাবার ১২/১৪ বছর পরে সতী হওয়া বা স্বামীর ভূত দেখে সতী হবার ঘটনাও ঘটত। স্বামী মারা গেছে—এই কথার সত্যাসত্য যাচাই না করেই কেউ কেউ সতী হতেন। স্বামী মারা যাবার পর, প্রথম শোকের প্রাবল্যে ঝোঁকের মাথায় অনেকে সতী হবার সংকল্প ঘোষণা করেও, শোকের তীব্রতা কেটে গেলে তা পালটে ফেলতেন।

সব বর্ণের মেয়েরাই সতী হতেন। ১৮১৯-এ ২৪-পরগণায় যে ৫২ জন সতী হন, তার মধ্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ, ১০ জন কায়স্থ, ২ জন বৈদ্য, বাকিরা সদগোপ, যোগী, কাঁসারী, গোয়ালা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়ের। সতীর ক্ষেত্রে বয়সের কোনো বাছবিচার ছিল না। ৮ বছরের বালিকা থেকে ১০০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই সতী হতেন। কিন্তু কেন ?

এই কেনর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখব, মেয়েদের সতী হবার বিভিন্ন কারণের মধ্যে আছে—বংশ মর্যাদা রক্ষা ও বংশকে পবিত্র করার ইচ্ছা, রাতারাতি লোকের চোখে 'দেবী' হয়ে ওঠার লোভ, পরজন্মে স্ত্রীপশু হয়ে জন্মের আশঙ্কা থেকে মুক্তি, বৈধব্যের অসহ্য যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্টের পরিবর্তে

১৩ 'সতীদাহ' (১৩২০). কুমুদনাথ মল্লিক, পৃ. ৭২।

১৪ *'Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos'* (Vol. II), (1811), W. Ward, P. 556-7,

১৫ *'The Suttees' Cry to Britain'* (1828), J. Peggs, P. 18.

স্বর্গে অনন্ত সুখভোগের[১৬] ও স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধারের বাসনা। রামমোহন ১৮২২-এ প্রকাশিত তাঁর 'Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu law of Inheritance'-এ বলেন, শুধু ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের জন্যই নয়, বাঙালীসমাজে বিধবার অশেষ গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা সবকিছু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠে ভবিষ্যতে অনন্ত সুখভোগের আশায় জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। অন্য একজন স্ত্রীলোকের মুখের কথায় অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, বিধবা হলে 'I shall be compelled to keep a fast twice a month, and shall never have a pleasant meal; and the morsel allowed to me will be only once a day. My relations will look cold upon me as a burden on the family. I shall be the sport of every oppressor; be subject to suspicion and abuse. If through temptation I am overcome, and a widow is never free from the attacks of licentious, my good name here and my hopes hereafter will be annihilated. All this misery will attend me if I live. If I die, I shall be honoured here, all these millions of years of happiness await me after death.'[১৭] এছাড়া বিধবা আত্মীয়ার আজীবন বোঝা বহনের হাত থেকে অব্যহতি পাবার ও তার সম্পত্তি কিছু থাকলে তা গ্রাস করার জন্য অনেকে মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সতী হতে বাধ্য করত। কোনো মেয়ে সতী হলে আর্থিক দিক থেকে ব্রাহ্মণরাই হতেন সবচেয়ে লাভবান। কোনো কোনো ধনী পরিবার থেকে এজন্য তাঁদের ২০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটত। আর এই অর্থপ্রাপ্তির লোভে ব্রাহ্মণরা অনেককে সতী হবার প্ররোচনা দিতেন। দুর্বল মুহূর্তে তাঁদের বাগ্‌জালে অভিভূত হয়ে অনেকে সতী হতেন। অনেক সন্দিগ্ধ বৃদ্ধ স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে সতী হবার প্রতিশ্রুতি আদায়

---

১৬ মেয়েরা তাঁদের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বয়সী স্বামীদের সঙ্গে অনন্ত স্বর্গসুখের প্রলোভনে সতী হতেন—একথা অনেকে সঙ্গত মনে করেন নি। '*On the Burning of Widows*', 'The Friend of India', July, 1819, P. 319.

১৭ '*Female Immolations*', 'The Friend of India', March, 1822, P. 93.

করত। মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর ওপর দখলী স্বত্ব কায়েম রাখতে অনেক বৃদ্ধ স্বামী তাদের তরুণী স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ দিয়ে যেত, অথবা স্ত্রী যাতে সতী হয় উত্তরাধিকারীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলত।[১৮] এছাড়া ছিল প্রেম নামক একটি বস্তু, অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়, শুধুমাত্র স্বামীকে ভালোবেসে অনেক স্ত্রী চিতায় গিয়ে উঠতেন। এইসব বিভিন্ন কারণে যেসব মেয়ে সতী হতেন, তাঁদের সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। এঁরা কি স্বেচ্ছায় সতী হতেন; নাকি এঁদের সতী হতে বাধ্য করা হত।

প্রচলিত উত্তর, মেয়েদের জোর করে পুড়িয়ে মারা হত, তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। রামমোহনের মতে সতীদাহর অধিকাংশ ঘটনাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র জনৈক লেখকের মতে, প্রতি চারটির মধ্যে তিনটি সতীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাঁশের সাহায্যে বলপ্রয়োগ করা হয়। বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটত, অনেকক্ষেত্রে তা বীভৎসতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা যে স্বেচ্ছায় সতী হতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। সতীদাহের ঘোর বিরোধী খ্রীষ্টান মিশনরিরাও বহু সতীর কথা বলেছেন, যাঁরা শান্তভাবে অবিচলিত চিত্তে অগ্নিপ্রবেশ করতেন। সহমৃতা হতে কৃতসংকল্প অনেক মেয়ের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শান্ত সহিষ্ণুতা হিন্দুবিদ্বেষী উইলিয়ম ওয়ার্ডের কাছেও অতুলনীয় মনে হয়েছে।[২০] জুলাই, ১৮২৯-এ 'Bengalensis' স্বাক্ষরে সতীর বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু আইন প্রণয়ন করে তা নিবারণে অনাগ্রহী জনৈক ব্যক্তি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে স্পষ্ট লেখেন, 'The sacrifice of the widow is voluntary,'[২১] দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মেয়েই যে স্বেচ্ছায় সতী হতেন, একথা বেশির ভাগ ইউরোপীয় লেখকও স্বীকার করেছেন। অন্য প্রমাণও আছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে'র সবকটি সংখ্যা আমরা দেখেছি। এতে কমপক্ষে ২৫টি সহমরণের ঘটনায় ৩৪ জন

১৮ '*Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India*' (Vol. 1, 1828), Bishop Heber, P. 72-3.

১৯ '*On the Burning of Widows*' 'The Friend of India', December, 1818, P. 309-10.

২০ '*Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*' (Vol.II), W. Ward. P. 564.

২১ '*Burning of Hindoo Widows*', reprinted from the 'India Gazette', 'The Calcutta Monthly Journal', July, 1829, P. 171.

স্ত্রীলোকের সহমৃতা হবার সংবাদ আছে। এই ৩৪টির মধ্যে ৩৩টির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কোনো ঘটনা ঘটেনি। একটি মাত্র ক্ষেত্রে[২২] বলপ্রয়োগের উপক্রম হলে বিচারকর্তা সাহেবের হস্তক্ষেপে মেয়েটি রক্ষা পায়। অধিকাংশ মেয়ে যে শুধু স্বেচ্ছায় সতী হতেন তাই নয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তাঁরা অবিচলিত থাকতেন, যে কোনোভাবেই তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হত। সমসাময়িক পত্রিকা থেকে দু'একটা এ ধরনের ঘটনার পরিচয় নেওয়া যাক। মিশনরি পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সেপ্টেম্বর, ১৮২৪-এ একটি সতীর বর্ণনা দেয়। এই মহিলাটি স্বেচ্ছায় সতী হন, এবং যারা তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করবে তাদের বংশ লোপ পাবে, আর স্থান হবে নরকে-বলে তিনি অভিশাপ উচ্চারণ করেন। তাঁকে অনেকে অনেকভাবে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলে '....the infatuated woman played with a piece of fire like a child, and when her hand was pressed upon a coal she showed no resolution.' বলাবাহুল্য, এ ধরনের ঘটনা এযুগে বিরল ছিল না। রামমোহন নিজে কালীঘাটে অনুষ্ঠিত এক সতীদাহে শিববাজারের এক হিন্দু-চিকিৎসক নীলুর ২৩ ও ২৭ বছর বয়সী দুজন বিধবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। দুজন মহিলাই অবিচলিতভাবে অগ্নিপ্রবেশ করেন। কনিষ্ঠ বৌটি অগ্নিপ্রবেশ করার আগে রামমোহন ও সেখানে সমবেত অন্যান্যদের হিন্দু-মেয়েদের সহমৃতা হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা ত্যাগ না করলে সতীর অভিশাপ লাগার ভয় দেখান।[২৩] এমনকি সতী হতে উদ্যত মায়েদের সঙ্কল্প চোখের সামনে তাঁদের শিশুসন্তানকে দেখেও বিচলিত হত না। সব বন্ধন, সব মায়া ছিন্ন করে তাঁরা সতী হতেন। কিন্তু সতী অধিকাংশ মেয়ে স্বেচ্ছায় হলেও এ প্রথা যে অমানবিক, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না। এবং শুধু আধুনিক যুগেই নয়, প্রাচীন ও মধ্য যুগেও তাই এ প্রথাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সেজন্যই পুরাণকারেরা অনেকেই সতীপ্রথার কথা বললেও কেউই একে আবশ্যিক বলেন নি। সতীপ্রথা সেকালে সামাজিক পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হলেও অনেকে এই অমানবিক প্রথাকে সমর্থন জানাতে পারে নি। বানভট্টের 'কাদম্বরী'তে সতীদাহের বিরুদ্ধে একটি অনুচ্ছেদ আছে, এবং

২২ 'সমাচার দর্পণ', ৩৩৫ সংখ্যা, ১৬. ১০. ১৮২৪।

২৩ '*The Asiatic Journal and Monthly Register*', March, 1818, P. 290.

বানভট্টের সমর্থক বেশী না থাকলেও সে যুগে নিশ্চয়ই কিছু ছিলেন।[২৪] অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই সতীকে একদল যেমন সমর্থন করেছে, মুষ্টিমেয় অন্য একদল তার জন্য ব্যথাও অনুভব করেছে।

মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী এই প্রথাকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হন। আকবর সতীদাহর ওপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে জোর করে কাউকে সতী করা নিষিদ্ধ করেন. কিন্তু এসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। জনসাধারণ সতীপ্রথাকে অতি সম্ভ্রমের চোখে দেখত, এবং একে মনে করত ধর্মের অঙ্গ। মধ্যযুগীয় বাঙালীসমাজ ধর্মীয়ক্ষেত্রে কোনোরকম আপসের পক্ষপাতী ছিল না। শিখ এবং মারাঠারা এই প্রথাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখত না। পোর্তগীজ, ফরাসী, ডাচ, ডেন—সবাই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কিছু চেষ্টা চরিত্র করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলেও উনিশ শতকে ব্রিটিশ ভারতে এ প্রথা সগৌরবে বর্তমান ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে (বিশেষকরে পশ্চিম বাংলায়) সতীপ্রথা খুব বৃদ্ধি পায়। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এই মধ্যযুগীয় প্রথা সম্পর্কে সচেতন হলেও (কোলব্রুক রামমোহনের সতী বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের বছর কুড়ি আগেই বিভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বনে দেখিয়েছিলেন সতীর আত্মদান প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী নয়, তার বিকল্প আছে। বৈদিক যুগেও এ সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না[২৫]) এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। এসময়, এদেশীয় কিছু সচেতন ব্যক্তিকে বাদ দিলে, অধিকাংশ মানুষই ছিল এ প্রথা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ বা উদাসীন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুৎসা প্রচারে ক্লান্তিহীন খ্রীষ্টান মিশনরিরা সতীপ্রথাকে করলেন তাঁদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। ১৮০৩-এ শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরি উইলিয়ম কেরী এর বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। শ্রীরামপুর মিশনরিরা এ প্রথার নৃশংসতার প্রতি সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর হয়ে উঠলেন।

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ৫. ২. ১৮০৫-এ সতীপ্রথা সম্পর্কে নিজামৎ আদালতের মতামত সরকারিভাবে জানতে চাওয়া হয়। নিজামৎ আদালতের

২৪ *'Reform and Regeneration in Bengal'* (1774-1823), Dr. A. Mukherji, P. 238.

২৫ *'On the duties of a Faithful Hindu Widow'*, Henry Colebrooke, 'Asiatick Researches', Vol. IV, P. 209-219.

পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মার উত্তরের ওপর ভিত্তি করে নিজামৎ আদালত ৫. ৬. ১৮০৫-এ সরকারি প্রশ্নের জবাব পাঠান। এতে গর্ভকালে, ঋতুকালে, ঋতুমতী হবার আগে, শিশু সন্তানকে দেখার কেউ না থাকলে, এবং ঔষধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে সহমরণে পাঠানো অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার-বিরুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। অবশ্য যাঁরা সহমৃতা হন তাঁরা যে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করেন, এবং স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করেন, একথাও বলা হয়। জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে আহত না করে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করা যে সম্ভব নয়—তাও সরকারকে জানান হয়। কিন্তু কয়েকটি জেলায় যেখানে এটি প্রায় অপ্রচলিত, সেখানে একে নিষিদ্ধ, এবং অন্যত্রও আদালত-নির্দেশিত পথে একে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে বলে নিজামৎ আদালত মত প্রকাশ করেন। কিন্তু নিজামৎ আদালতের মতামতকে আংশিকভাবে রূপ দিতেই চলে গেল বেশ কটি বছর। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বিষয়টি নিয়ে নিজামৎ আদালতের সঙ্গে সরকারের আবার কিছু চিঠি চালাচালি হয়।[২৬]

অবশেষে ১৮১৩-তে নিজামৎ আদালতের অভিমতের ভিত্তিতে সরকার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-দারোগাদের সতীর ক্ষেত্রে জবরদস্তি ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেন। সেইসঙ্গে গর্ভবতী ও অল্পবয়সী মেয়েদের সতী হওয়া নিষিদ্ধ করে পুলিশকে প্রতিটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এইসব নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার আদেশ দেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ম্যাজিস্ট্রেটদের তাঁদের এলাকার বাৎসরিক সতীর হিসাব দাখিল করতে বলেন। ১৮১৭-তে সতীর ওপর আরো কিছু বিধিনিষেধ জারি করে যাঁদের শিশুসন্তানকে দেখার কেউ নেই—তাঁদের সতী হওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কেউ সতী হবার সংকল্পের কথা জানালে তার আত্মীয়স্বজনকে তা পুলিশকে জানাতে বলা হয়, না জানালে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার ভয়ও দেখানো হয়। এইসময়ে ব্রাহ্মণদের অনুমরণ, এবং কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মেয়েরা মৃত স্বামীর সঙ্গে সমাধিস্থ হবার যে প্রথা পালন করতেন তাও নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এইসব সরকারি নিষেধে ফল হল কতটুকু?

২৬ সরকার ও নিজামৎ আদালতের এই সব যোগাযোগের জন্য দ্র. '*Rammohun Roy and progressive Movements in India*', J. K. Majumdar, P. 97-112.

সরকারি বিধিনিষেধগুলি প্রধানত কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা এই প্রথাকে হ্রাস তো করতেই পারেনি, বরং সরকারি পর্যায়ে এই প্রথার মর্যাদা স্বীকার করে নিয়ে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল। সে কারণে এই সব বিধিনিষেধ জারি হবার পর সতীর সংখ্যা কমল তো না-ই, বরং বেড়ে গেল। তাই ১৮১৫-তে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে যেখানে ৩৭৮টি মেয়ে সতী হয়েছিলেন, ১৮১৮ তে সেখানে সতী হলেন ৮৩৯ জন। অবশ্য অন্য কারণও ছিল। সরকারি বিধিনিষেধগুলি যাদের ওপর কার্যকরী করার ভার ছিল, সেইসব সরকারি কর্মীরা সতীর ক্ষেত্রে প্রায়ই নিছক সশ্রদ্ধ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করত। অনেকক্ষেত্রে আবার সতীকে আগুন থেকে উদ্ধার করে তারা নিজেরাও বিপদে পড়ত। আর আমরা আগেই তো দেখিয়েছি, সতী অধিকাংশ মেয়েই হতেন স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে—কাজেই যে কোনোভাবেই তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। ১৮২১-এ লর্ড হেস্টিংস এই প্রথা নিবারণে শিক্ষিত ভারতীয়রা ক্রমে সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু করেন নি। ১৮২৩-এ লর্ড আমহার্স্ট হলেন নতুন গভর্নর জেনারেল। তিনি সতীপ্রথা সম্পর্কে সচেতন হলেও, সৈন্য-বিভাগে বৃহত্তর অসন্তোষের আশঙ্কায় আইন করে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ না করে, এর ওপর আরো কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ভবিষ্যতে প্রগতির তালে তাল মিলিয়ে এ মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান ঘটবে—এই ছিল তাঁর ধারণা।

আগেই দেখেছি, নিজামৎ আদালত বেশ কিছুকাল ধরেই এ প্রথা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করছিলেন। সতীর ওপর নতুন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ না করে ভবিষ্যতে সমগ্র দেশে সতী নিষিদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত বলে ২৩. ৭. ১৮২৩-এ নিজামত আদালতের অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন। নভেম্বর, ১৮২৬-এ মিঃ কর্টেনি স্মিথ এবং মিঃ আলেকজাণ্ডার রস-নিজামৎ আদালতের এই দুজন বিচারক অবিলম্বে সতীপ্রথা সম্পূর্ণ বিলোপের কথা বলেন। তাঁদের অভিমত গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে রাখা হলে কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ বেলি তাঁদের প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও দিল্লী, সাগর, কুমায়ুন প্রভৃতি কোনো কোনো অঞ্চলে এটি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। মিঃ হ্যারিংটনের মতো অনেকে আবার এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানের বিকিরণের মাধ্যমে এই প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব

—এমন কথাও বিশ্বাস করতেন। দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমদিকেই বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এ প্রথার অমানবিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতি ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বৃহত্তর অসন্তোষের আশঙ্কায় আইন করে তা নিষিদ্ধ করেন নি।

কিন্তু এইসময় বাঙালীরা কি তাঁদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ইউরোপীয়দের জন্যই তুলে রেখেছিল, তারা কি সতীদাহ নিয়ে কিছু ভাবছিল না, চোখ বুজে সতীদাহের ঢাকঢোলের সঙ্গে মাথাই নেড়ে চলেছিল। আসলে তা নয়—ভাবছিল বৈকি, এবং সে ভাবনা একস্রোতে বয়ে চলে নি। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীর ওপর আরোপিত বিভিন্ন সরকারি বিধিনিষেধকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের কাছে এইসব বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেবার আবেদন জানান। অন্য একদল ভাবছিলেন, মধ্যযুগীয় সতীদাহের সেই ট্রাডিশন কি উনিশ শতকেও চলতে থাকবে, ধর্মের নামে মেয়েদের এভাবে পুড়িয়ে মারা কি বন্ধ হবে না কোনোদিন? আর বিশেষ করে ব্যাপারটা যখন অশাস্ত্রীয়। এসব কথা বিশেষ করে যে মানুষটি ভাবছিলেন, তাঁর নাম রামমোহন রায়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রামমোহনকে এ ব্যাপারে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী দেখতে পাই। একদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'য় সতীদাহ নিয়ে আলোচনা চলছে, অন্যদিকে তিনি নিজে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে গিয়ে সনির্বন্ধ অনুনয় করে মেয়েদের সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন, আর সেইসঙ্গে এই প্রথার অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা লিখে বিনামূল্যে তা বিতরণ করছেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে রামমোহন সতীদাহর বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগাতে সচেষ্ট হলেন। এ প্রথা যে একইসঙ্গে অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক তা শুধু এদেশীয় জনগণকেই নয়, বিদেশীয় শাসকগোষ্ঠীকেও তিনি বোঝাতে চাইলেন। তাঁর এ প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়নি বলাই বাহুল্য। বাঙালীসমাজে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে পরিচিত হলেন, অন্যদিকে লর্ড হেস্টিংসের সরকার, বিশপ হেবার প্রভৃতিরাও রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। সেই কারণে পেগসের সতী সম্পর্কিত পুস্তকে, এবং মিশনরি পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পাতায় এ যুগে রামমোহনের সতীদাহ সম্পর্কিত পুস্তিকার বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখতে হবে, ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহনই

প্রথম[২৭] স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এদিকে ঘটনা কিন্তু ঘটেই চলল একের পর এক।

১৮২৮-এর জুলাই মাসে এদেশে এলেন নতুন শাসক উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। ভারতে আসার পর তিনি সতীদাহ সম্পর্কে সৈন্যবিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মতামত জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সৈন্যবিভাগের একাধিক অফিসারের কাছে সতীদাহ সম্পর্কে মতামত জানানোর জন্য 'গোপনীয়' চিঠি পাঠানো হল। এইসব অফিসারদের মধ্যে ২৪ জন, অবিলম্বে এ প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, ৮ জন, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য সরকারি অফিসারদের সাহায্যে 'indirect abolition' এর পক্ষে মত দেন। ২ জন, সতীদাহের বিরোধী হয়েও সরকারি হস্তক্ষেপে তা সম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ বিলোপের বিরোধিতা করেন। কেবলমাত্র ৫ জন, সতীপ্রথার ওপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেন। বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ রদ করা হলে তা যে সৈন্যবিভাগে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না, সে সম্পর্কে অন্যান্য সূত্র থেকেও সংবাদ সংগ্রহ করেন।[২৮] বাংলার দুজন পুলিশ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট এ প্রথা নিষিদ্ধ হলে কোনোদিক থেকেই সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। নিজামৎ আদালতের ৫ জন বিচারকও মত প্রকাশ করলেন এ প্রথা বিলোপের পক্ষে। এতো গেল সরকারি লোকদের বক্তব্য। এর ওপর আবার বাইরে থেকেও চাপ আসতে লাগল। কলকাতার এ্যংলো ইণ্ডিয়ানরা এ প্রথা উচ্ছেদ করা যে উচিত তা বলতে লাগল। ইংলণ্ডের জনমতও ব্রিটিশ-রাজত্বে সতীপ্রথা যে নিতান্ত বেমানান তা অনুভব করে একে নিষিদ্ধ করার জন্য পার্লামেণ্টে একের পর এক আবেদন পাঠাতে লাগল। ২৩. ৫. ১৮২৯-এ 'দি ক্যালকাটা গেজেট এ্যণ্ড কমার্শিয়ল এডভার্টাইজরে' প্রকাশিত এক পত্র থেকে জানা যায়, পার্লামেণ্টের গত অধিবেশনে ভারতবর্ষে সতীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ২৫টি আবেদন পেশ করা হয়।[২৯] 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা জার্নাল', 'জন বুল', 'বেঙ্গল ক্রনিকল', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি

---

২৭ রামমোহনের আগে নিজামৎ আদালতের কয়েকজন পণ্ডিত বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীর বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত প্রকাশ করলেও তাঁরা তা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে করেন নি। এবং তাঁদের মতামত জনমনে সামান্য আলোড়নও সৃষ্টি করতে পারে নি।

২৮ '*Dawn of Renascent India*', K. K. Datta, P. 116-117.

২৯ '*The Calcutta Gazette & Commercial Advertiser*', 23. 5. 1829.

এ প্রথা নিষিদ্ধ করার দাবি জানাতে লাগল। ১৮২৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটনাচক্রে সতীর সংখ্যাও বেশ হ্রাস পায়। সব দেখে শুনে, বিচার বিবেচনা করে বেণ্টিঙ্ক এই প্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার আগে একটি মানুষের মতামত তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হল। মানুষটি আমাদের পূর্বপরিচিত রামমোহন রায়।

কিন্তু রামমোহন সরকারি হস্তক্ষেপে জোর করে এই প্রথার নিষিদ্ধকরণ চেষ্টার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে 'the practice might be suppressed quietly and unobservedly by increasing the difficulties and by the indirect agency of the police.'[৩০] এতো রামমোহনের মতামত, কিন্তু যাঁরা রক্ষণশীল, তাঁরা বেণ্টিঙ্কের সতী নিবারণের এইসব তোড়জোড়কে কি চোখে দেখলেন?

খুশি যে তাঁরা হন নি, বলাই বাহুল্য। ধর্মবিনাশের আশঙ্কায় তাঁরা বিচলিত হয়ে উঠলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' ৮. ৮. ১৮২৯-এ কালপ্রাচীন সতীপ্রথা যে হিন্দুদের অশেষ শ্রদ্ধার বস্তু তা বলে এই আশা প্রকাশ করে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক 'যিনি দুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও ধর্মসংস্থাপনকরণ জন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম কিম্বা রীতি তাহার অন্যথাকরণে কখনও প্রবৃত্ত হইবেন না।'[৩১] এর কয়েকদিন পরে ঐ 'সমাচার চন্দ্রিকা'তেই লেখা হয়, 'শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্টবোধ হইতেছে শাস্ত্রবিচার না করিয়া কখনও কোন আজ্ঞা দিবেন না, এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।'[৩২] কিন্তু 'যে সকল কথা উঠিয়াছে' তা যে 'গোলযোগমাত্র' নয়, তাই প্রমাণিত হল পরের দিন।

পরের দিন ৪. ১২. ১৮২৯-এ XVII রেগুলেশনে সতীপ্রথা 'illegal and punishable by the Criminal Courts'[৩৩] বলে কাউন্সিলে সর্বসম্মতি-

৩০ '*Glimpses of Bengal in the 19th Century*' (1960), Dr. R. C. Majumdar, P. 54.

৩১ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২২৮।

৩২ ঐ, পৃ. ২৯৮-৯০।

৩৩ আইনটির সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্র. '*Abolition of the Suttee Rite*', 'The Calcutta Monthly Journal', December, 1829, P. 33-42.

ক্রমে (কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মেটকাফ ধর্মীয় অসন্তোষ সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলেও সতীদাহ নিষিদ্ধকরণে তাঁর সম্মতি দেন) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথমে এই আইন শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০-এ মাদ্রাজে এটি বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেই বোম্বাই অঞ্চলেও সতী নিষিদ্ধ হয়।

আইন করে সতী নিষিদ্ধ হলে ১৬. ১. ১৮৩০-এ রামমোহনের নেতৃত্বে হরিহর দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, কালীনাথ রায়, সত্যকিঙ্কর ঘোষাল প্রভৃতি কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় অধিবাসী ও মিঃ গর্ডনের নেতৃত্বে ৮০০ জন খ্রীষ্টান অধিবাসীর স্বাক্ষরিত অভিনন্দন পত্র গবর্নর জেনারেলের হাতে দেওয়া হয়। এ সময় লেডি বেন্টিঙ্কও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজাদের পত্র বাংলা ভাষায় পাঠ করায় পর, তার ইংরেজি তর্জমা পাঠ করেন হরিহর দত্ত। ঐ অভিনন্দন পত্রে সতীদাহের নৃশংসতা ও অমানবিকতার উল্লেখ করে বলা হয়, 'শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ডীয় এতোদ্দেশাধিপতি যাহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বর প্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রীপুরুষ এবং প্রজাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয়রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগগে ইচ্ছাপূর্বক জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতে-ছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্যের সম্পূর্ণমতে অন্যথা করিয়া পতিবিহীনাদের আত্মঅন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালে তাহাদিগ্‌গে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত তদ্যোগ্য রাশীকৃত তৃণকাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য-স্বভাবের ও করুণার সর্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরিস্থানে পুলিশের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণীর রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।'[৩৪]—আর তাই আইন করে এ প্রথা নিবারণের জন্য বেন্টিঙ্কের কাছে তাঁরা তাঁদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আগেই বলেছি বেন্টিঙ্ককে এদেশীয়দের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তার নেতৃত্ব দেন সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের নেতা রামমোহন রায়। অথচ, আমরা আগে দেখেছি, এই মানুষটিই বেন্টিঙ্ককে আইন করে এ প্রথা রদ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

৩৪ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯১

তাই মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সহমরণ নিবারণে রামমোহনের প্রকৃত ভূমিকাটি কি ?

সহমরণ নিবারণের সঙ্গে রামমোহন রায়ের নামটা যে জড়িয়ে গেছে একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সহমরণ নিবারণের প্রকৃত গৌরব কতখানি তাঁর প্রাপ্য, এ প্রশ্নকে আজকের দিনে পাশ কাটিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জনক তিনি না হলেও বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এজন্য ঘরে বাইরে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। কিন্তু এই মানুষই আইন করে এ প্রথা নিবারিত হোক তা চাননি। কিন্তু কেন ? রামমোহন যে উগ্রপন্থায় বিশ্বাস করতেন না. একথা আমরা আগেও বলেছি, আইন করে তাই রাতারাতি সামাজিক পরিবর্তন আনতে তিনি চাননি। জীবনের মতো সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনে আস্থাবান। তাঁর আশঙ্কা ছিল, আইন করে এই প্রথা রদ করা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে, আর তা যাতে না হয়, সেজন্যই তিনি আইন করার প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে, বেন্টিঙ্ককে আরও বিধিনিষেধ ও পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে এ প্রথা বিলোপ করার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ শুনে বেন্টিঙ্ক যদি আইন প্রণয়ন না করতেন, তাহলে রামমোহন নির্দেশিত পথে সতীপ্রথা আদৌ নিবারিত হত কিনা সন্দেহ। কারণ আমরা দেখেছি, সরকারি বিধিনিষেধগুলি সীমাবদ্ধ থাকত কাগজ কলমেই। কিন্তু আইন প্রণীত হবার পরও যখন জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল না, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও কোনভাবে বিপন্ন হল না, তখন তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এগিয়ে এলেন গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে। শুধু তাই নয়, এ আইনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থনও জানালেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'Abstract of the Arguments regarding the Burning of widows, considered as a Religious Rite' প্রকাশ করে অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথাকে স্ত্রী হত্যা আখ্যা দিয়ে ধর্মের আবরণে স্ত্রীহত্যা নিবারণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানান। সহমরণ নিবারণের পর প্রতিক্রিয়ার সমস্ত আঘাতও তিনি অবিচল ভাবে সহ্য করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লোকের-শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে

জানিয়েছেন, রামমোহন উপাসনা মন্দিরে আসার সময় পদব্রজে আসতেন, ফেরার সময় ফিরতেন গাড়িতে। 'গাড়িতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন লোকে ইট পাথর, কাদা ছুঁড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন, "কোচম্যান হেঁকে যাও।"[৩৫] এমনকি প্রাণহানির আশঙ্কায়, এ সময় তিনি 'অস্ত্র সমভিব্যাহার ব্যতীত গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না।' বিলেতে গিয়েও সতীদাহ নিবারক আইন যাতে বলবৎ থাকে, সেজন্য তিনি সজাগ থাকেন। আর এসবের জন্যই ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রিভি-কাউন্সিলে সতীপক্ষর পরাজয়ের পর কলকাতা টাউন হলের জয়োল্লাস-সভায় ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম প্রতিনিধি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা পর্যন্ত করেন। সব মিলিয়ে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার জন্য সহমরণ নিবারণের গৌরব রামমোহনের প্রাপ্য না হলেও এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে সমাজকে নাড়া দেবার, ও আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার গৌরব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু এতো গেল রামমোহনের কথা, সতীদাহ নিবারক আইন পাশ হলে বাঙালীসমাজে তার কি প্রতিক্রিয়া হল—দেখা যাক।

আইন প্রণীত হলে দেশে বা সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ কোনো অসন্তোষ দেখা যায় নি; মার্শম্যানের মতে এই আইন প্রণয়নের পরে বাংলাদেশে আইন অমান্য করে জনা ২৫ মেয়ে সতী হবার চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যন্ত পুলিশ হস্তক্ষেপে তাঁরা রক্ষা পান। দু'একজন মেয়ে আইনের বাধা না মেনে শেষপর্যন্ত সতী হয়েছিলেন। যেমন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভুরসুঠ পরগণার রঘুনাথপুরের রামদুলাল বাগের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী করুণাময়ী স্বেচ্ছায় কারো নিষেধ না মেনে সতী হন। এ-রকম ক্ষেত্রে সতীর আত্মীয়স্বজনকে শাস্তি ভোগ করতে হত। দু'চার জন সতী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হত। ২২. ১. ১৮৩১-এর 'সমাচার দর্পণে' 'সম্বাদ কৌমুদী' থেকে এ ধরনের একটি সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে দেখি হুগলী জেলার কৃষ্ণনগরে ত্রিলোচনের তর্কালঙ্কার নামক জনৈক 'পুরাতন অধ্যাপক'-এর সহগমনেচ্ছু স্ত্রীকে তার পুত্র 'বহুগোষ্ঠী' এবং সেই অঞ্চলের দারোগা ও জমিদারের লোকদের সাবধানতায় প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। 'সহগমনোদ্যতা' নারীটি কিছুকাল অনাহারে থাকলেও পরে স্বাভাবিক ভাবেই খাওয়া দাওয়া ও কাজকর্ম করছে বলে

৩৫ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১০৪।

পত্রিকাটি জানায়।[৩৬] কিন্তু একদল কিছুতেই এই আইনকে মেনে নিতে পারলেন না। এঁরা কারা?

এঁরা রক্ষণশীল হিন্দু। সনাতন ধর্মবিলোপের আশঙ্কায় এঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, গোপীমোহন দেব, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, গোকুলনাথ মল্লিক, রামগোপাল মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র প্রভৃতি কলকাতার কয়েকজন বিত্তবান প্রভাবশালী ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এ আইন রদ করার জন্য তাঁদের উদ্যোগে সতী সমর্থকদের পক্ষ থেকে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর সমন্বিত দুটি আরজি (এই দুটি আরজির প্রথমটি কলকাতায় ৬৫২ জন বিষয়ী ও ১২০ জন পণ্ডিত স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র, দ্বিতীয়টি বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ ইত্যাদি স্থানের ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোক ও ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষরযুক্ত) গবর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয়। উত্তরের প্রত্যাশায় বৃহস্পতিবার, ১৪. ১. ১৮৩০-এ উল্লিখিত ব্যক্তিরা বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করলে, তিনি তাঁর বক্তব্যসম্বলিত একটি কাগজ তাঁদের দেন। এতে বেণ্টিঙ্ক আত্মঘাতী সতী অপেক্ষা ব্রহ্মচর্যকে 'সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ' বলে মত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, তাঁরা যদি মনে করেন এ বিষয়ক আইন পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ, তবে তাঁরা ইংলণ্ড-রাজ-কাউন্সিলে এ বিষয়ে আপীল করুন। তিনি তা আনন্দের সঙ্গে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। গবর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তকে রক্ষণশীল হিন্দুরা অনুনয় জানিয়েও পালটাতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে কি তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন।

না, তা নয়। বরং সতীপ্রথা এবং সেই সূত্রে সনাতন হিন্দুধর্ম ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে তাঁরা গঠন করলেন 'ধর্মসভা'—যার প্রথম কাজই হল সতী আইনের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' হয়ে উঠল তার মুখপত্র। আইন অমান্য করে যে মেয়েরা সতী হবার চেষ্টা করতেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা' মহা উৎসাহে তাঁদের কথা প্রকাশ করত। ৩০. ১. ১২৩৮-এর 'সমাচার চন্দ্রিকা' এ রকম ১৩ জন সতীর বিবরণ প্রকাশ করে। 'ধর্মসভা'র কর্তাব্যক্তিরা সতী-আইনের বিরুদ্ধে আপীলের খসড়া প্রস্তুতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সতী আইনের বিরুদ্ধে এক আবেদন যে প্রস্তুতির পথে তা ৩০. ১১. ১৮৩০-এর 'ইণ্ডিয়া গেজেট'

৩৬ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৪৬-৭।

থেকে জানা যায়। পত্রিকাটি এই আশা প্রকাশ করে 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'বঙ্গদূত' প্রগতি সমর্থক এই দুটি পত্রিকা জনসাধারণের মন থেকে সরকারি আইন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি দূর করার চেষ্টা করবে।[৩৭] চেষ্টা তারা কি করেছিল জানি না। এদিকে 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকেও সতী আইনের বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদনপত্র প্রস্তুত হল। 'ধর্মসভা'র পক্ষে ইংরেজীতে আবেদনপত্রটি রচনা করেন এর উৎসাহী সদস্য রাধাকান্ত দেব। 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে ইংলণ্ডে আবেদন পত্রটি নিয়ে যাবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী মিঃ ফ্রান্সিস বেথী নিযুক্ত হলেন। ইংলণ্ডে 'ধর্মসভা'র পক্ষ সমর্থন করার জন্য কৌঁসুলী নিযুক্ত হলেন পরবর্তীকালে এদেশে সুপরিচিত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। অন্যদিকে রামমোহন রায়ও সতী আইনের সমর্থনে একটি পালটা আবেদন 'হাউস অব কমন্সে' উপস্থিত করলেন। বিচার চললো বেশ কিছুদিন ধরে। অবশেষে ১১. ৭. ১৮৩২-এ প্রিভি-কাউন্সিলের রায় বেরোল। রামমোহন রায় এ সময় ইংলণ্ডে। কলকাতায় খবর পৌছতে পৌছতে কেটে গেল কয়েকটা মাস।

সোমবার ৫ নভেম্বর, ১৮৩২ সন্ধ্যাবেলা প্রসন্নকুমারের 'রিফর্মার' 'এক্সট্রা অর্ডিনারি ইস্যু' প্রকাশ করে সতীপক্ষীয়দের আবেদন ডিসমিস হবার সংবাদ জানায়। ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, 'এপ্রকার ধর্মের প্রতি ব্যাঘাত হওয়াতে অবশ্য কহিতে হইবেক পৃথিবী হইতে বিচারমহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুসকল এই সম্বাদ পাইয়া হাহা রবে ক্রন্দন করিবেন তাঁহাদিগের অক্ষিসলিলে যে নদী বহিবেক তাহা কে দৃকপাত করিবেক।'[৩৮] 'দৃকপাত' বিশেষ কেউই করেন নি, কারণ বাঙালী সমাজমনে তখন লেগেছে গতির ছোঁয়া, মধ্যযুগীয় ধারণাকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে যেতে চাইছে। তাই সতীদাহ নিষিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল না, বাঙালীসমাজে কিছু মানুষ অন্তত ভাবল, থামলে চলবে না, আরো এগিয়ে যেতে হবে, আরো।

৩৭ *'Burning of Widows'*, reprinted from the 'India Gazette', 'The Calcutta Monthly Journal', November, 1830, P. 102-3.

৩৮ 'হিন্দুগণের মনস্তাপ বিষয়ক' (সমাচার চন্দ্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত), 'সমাচার দর্পণ', ৮০১ সংখ্যা, ১৪.১১.১৮৩২, পৃ. ৫৪০।

আর তাই সতীপ্রথা নিবারিত হবার পর বাঙালী সংস্কারকরা বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠলেন। উনিশ শতকের প্রথমে বাঙালী হিন্দু-সমাজে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঋগ্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ব বেদ ইত্যাদিতে বিধবাবিবাহের উল্লেখ থেকে, তা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না বলা যেতে পারে। বৌদ্ধ জাতকের অনেক আখ্যায়িকায় বিধবাবিবাহের কথা পাই। রামায়ণ, মহাভারতেও বিধবাবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, স্মৃতি পুরাণের যুগে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন মেলে। ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে সমাজের উচ্চস্তরেও বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত ছিল না, মুসলমান আমলে তা হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে অপ্রচলিত ও নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে চৈতন্য-অনুবর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ও ভারতবর্ষীয় কোনো কোনো উপাসক সম্প্রদায়েও (বাসব সম্প্রদায়, নরেশপন্থী, শিবনারায়ণী সম্প্রদায়) তা প্রচলিত ছিল। এ সময় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দু'একটি বিক্ষিপ্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরে এ প্রথা স্বীকৃতি পায় নি।

উনিশ শতকে আইন করে সতী নিবারিত হবার পর বাঙালীসমাজে বিধবা-বিবাহের প্রশ্নটি যে সংস্কারকদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে, তা আমরা প্রথমেই বলেছি। অবশ্য এর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ আপন বিধবাকন্যার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বিরোধিতা করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

ইংরেজ অধিকারের পর পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালী আধুনিক যুগোপযোগী ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল। আধুনিক বাংলার সচেতন ব্যক্তিত্ব রামমোহন নারীমুক্তি আন্দোলনে পুরোধা হিসাবে দেখা দিলেন।

রামমোহন তাঁর কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের সমর্থনে কিছু বলেন নি, বিধবার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য অবলম্বনই তিনি সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি বিলেত যাবার পরই জনরব শোনা যায়, তিনি নাকি বিধবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই বিলেত গেছেন! এমন কি তাঁর বিলেত যাবার পর, অনেক বয়স্ক বিধবা রাম-মোহন ফিরে এলে তাঁরা আবার বিয়ে করতে পারবেন, এই বলে হাসাহাসি

করতেন।[৩৯] ১৮০০ শকে 'রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় নগেন্দ্রনাথ-চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রামমোহন রায় সহগমন প্রথা উন্মূলিত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, যাহাতে বিধবার পুনঃসংস্কার হয় তদ্বিষয়েও তিনি যত্নবান হন।... হিন্দুসমাজের তদানীন্তন বদ্ধমূল কুসংস্কার নিবন্ধন তিনি বিধবার পুনঃসংস্কার প্রদানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তিনি এই বিষয় লইয়া যে একটি আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার কোন প্রদৌহিত্র বলেন, রামমোহন রায়ের বৈষয়িক কাগজপত্রের ভিতর এই বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের কোন নিদর্শন পত্র তিনি দেখিয়াছেন।'[৪০] অবশ্য রামমোহন সম্পর্কিত এরকম ধারণার কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই। তিনি কোথাও বিধবাবিবাহের সমর্থনে কিছু বলেন নি, তা আমরা আগেই বলেছি। 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনে 'যুবতী স্ত্রীর স্বামীর মরণান্তর' 'ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য' বলেই বিবেচিত হয়েছিল।[৪১]

উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বিধবাবিবাহ নিয়ে সমাজে আলোচনা শুরু হয়। ১৪ মার্চ, ১৮৩৫-এ 'সমাচার দর্পণে' শান্তিপুর নিবাসী কয়েকজন অবিবাহিতা প্রৌঢ়া কুলীন কন্যা সম্পাদকের কাছে এক পত্রে তাঁদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা করে বাংলায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং উপস্ত্রী নিরোধ সম্পর্কে আইন প্রার্থনা করেন।[৪২] ২১শে মার্চ এই পত্রটির দাবিকে সমর্থন করে চুঁচুড়ার কয়েকজন ভদ্রমহিলা 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদককে লেখা এক পত্রে স্ত্রী-শিক্ষা, পরপুরুষের সঙ্গে আলাপের ও পতিনির্বাচনে স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহরোধ, পণপ্রথা বিলোপ ইত্যাদির সঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দাবি জানায়। পক্ষান্তরে ২১শে চৈত্র, ১২৪২-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এক পত্রে শান্তিপুর-নিবাসিনীর প্রস্তাবকে ও সেইসঙ্গে দর্পণ-সম্পাদককে তীব্র কটাক্ষ করা হয়।[৪৩] মনে হয়, 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পত্র দুটি আদৌ কোনো মহিলা রচিত নয়, এই সময়ের সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত গৃহবন্দিনীদের পক্ষে এই ধরনের পত্রের কল্পনা করাও অসম্ভব। সম্ভবত, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর কোনো উৎসাহী সদস্যই পত্রদুটির রচয়িতা।

৩৯ '*Marriage of Hindu Widows*', 'The Cal. Review', Vol. XXV, 1855.
৪০ 'রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা', 'তত্ত্ববোধিনী', ৪২৮ সংখ্যা, চৈত্র, ১৮০০ শক।
৪১ 'বেদান্তমত', 'সমাচার দর্পণ', ২২.৫.১৮১৯।
৪২ 'সমাচার দর্পণ' ১০২৬ সংখ্যা, ১৪.৩.১৮৩৫, পৃ. ৮৮।
৪৩ ঐ, ১০৩১ সংখ্যা, ১৮.৪.১৮৩৫।

২৯. ৪. ১৮৩৭-এ 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত সংবাদে দেখি, মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক প্রমুখ কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রচলনে উৎসাহ দেবার জন্য এক সভা আহ্বানে মনস্থ করেছেন।[৪৪] এর বছর ৩/৪ আগে 'কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহার্থ এক সভা' করতে মানস করেও যথাসময়ে তা বিস্মৃত হন।[৪৫] এই সময়ই 'বেঙ্গল-হরকরা', 'ক্যালকাটা কুরিয়র', 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'রিফর্মার', 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে 'ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' এ সম্পর্কিত যে কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করতে থাকে।

১৮৩৭-এ ল কমিশন বালবিধবাদের সমস্যা বিশেষভাবে আলোচনা করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন, কিন্তু ইংরেজ আইনজ্ঞরা আইন করে এ প্রথা চালু করতে খুব উৎসাহবোধ করেন নি।

১৮৪২-এর এপ্রিলে নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর প্রথম সংখ্যায় 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামক পত্রপ্রবন্ধে এই আন্দোলনকে কিভাবে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত কর্মসূচী লিপিবদ্ধ করা হয়। ২৬. ৪. ১৮৪৩-এর 'সংবাদ প্রভাকরে' পূর্বোক্ত পত্রপ্রবন্ধটিকে কটাক্ষ করে প্রশ্ন রাখা হয়, বিধবার পুনর্বিবাহ হলে তার সম্প্রদানকর্তা কে হবেন? জুলাই, ১৮৪৩-এ ৫ম সংখ্যা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' 'প্রভাকরে'র সমালোচনার উত্তর দান প্রসঙ্গে, এদেশীয় স্ত্রীদের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবকদের সাহসিকতাই বিধবাবিবাহের পথ প্রশস্ত করবে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। ১৫. ১. ১৮৪৩-এ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রকাশিত একটি পত্রে পত্রলেখক বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থনের অভাব, এবং ভবিষ্যতে তা পাওয়া গেলেও আদালতে তা গ্রাহ্য হবে কিনা এই সংশয় সাপেক্ষে, এ ব্যাপারে সরকারি সাহায্য যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে বলেন।

দেখতে পাচ্ছি, ইয়ংবেঙ্গল বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ', ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর পৃষ্ঠায় বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় তাঁরা এ নিয়ে আলোচনাও করতেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহায় ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র-শিষ্যরা।

---

৪৪ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৮-৯।
৪৫ ঐ, পৃ. ২৬৩-৪।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপের বছর দশেক পূর্বেই বউবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 'কয়েকজন বিষয়ী লোক' সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

বিদ্যাসাগরের কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের এ বিষয়ক চেষ্টাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ মিত্র পরিচালিত কৃষ্ণনগরের নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনও 'ধর্মসভা'র উৎসাহী সদস্য উলার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় 'মন্দীভূত' হয়।[৪৬]

১৮৪৫ সালে কলকাতায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' বিধবাবিবাহের ব্যাপার নিয়ে 'ধর্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে কিছুদিন পত্রালাপ করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এ বিষয়ক পত্রের কোনো উত্তর দেয় নি। 'ধর্মসভা'র সঙ্গে পত্রালাপ কিছুদিন চললেও এর কোনো ফল ফলে নি। ২ বৈশাখ, ১২৫১-এ 'ধর্মসভা'র বৈঠকে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি মেং থিওবোল্ড সাহেবের প্রেরিত হিন্দুবিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ বিষয়ে যে অসদ্ব্যবস্থা পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহার সদুত্তর অর্থাৎ উক্ত সাহেবের প্রেরিত ব্যবস্থাপত্র নিতান্ত অব্যবস্থা এবং বিধবার কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে যে সদ্ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সভায় পাঠ হইলে অনুমতি হইল সমাজের পণ্ডিতাধ্যক্ষগণের স্বাক্ষরিত করাইয়া পূর্বোক্ত সাহেবের নিকট তৎপত্রোত্তর সহিত প্রেরণ করা কর্তব্য[৪৭]-'ধর্মসভা' তার ব্যবস্থাপত্রে বিধবাবিবাহের যে বিরুদ্ধতা করে, বলাই বাহুল্য।

বিদ্যাসাগরী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস নিজের বালবিধবা কন্যার বিবাহ দেবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়দের কাছে ব্যবস্থা-প্রার্থী হলে, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতরা মিলিত হয়ে বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক ব্যবস্থাপত্র দেন। এই ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ স্বহস্তে লেখেন। এর কিছুদিন পরে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে আহূত এক সভায় 'বহুসংখ্যক অধ্যাপক সমক্ষে' নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিচারে পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে জয়ী হয়ে রাজ-

৪৬ 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৩।
৪৭ 'ধর্মসভা', 'সমাচার চন্দ্রিকা', ২০৪৪ সংখ্যা, পৃ. ২৬।

বাড়ি থেকে একজোড়া শাল উপহার পান। কার্যকালে অবশ্য তিনি ঐ শাল গায়ে দিয়েই বিধবাবিবাহের বিপক্ষদের সহায়তা করেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশও এ বিষয়ে বিদ্যারত্নের পথ অনুসরণ করেন।[৪৮] বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসকদের এই ধরনের স্ববিরোধী কার্যকলাপকে তীব্র কটাক্ষ করেন।

এপ্রিল, ১৮৪২-এ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিধবার পুনর্বিবাহ' প্রবন্ধে দেখি, 'যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে।' বিধবা-বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপির শুনানির সময় জে. পি. গ্রান্ট তাঁর বক্তৃতায় বলে-ছিলেন, 'In Calcutta, there was great agitation on the subject about ten years ago. It was in consequence of the failure of this last attempt that Iswar Chandra had taken up the subject ; and the petition lately presented was the result.'[৪৯] দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকেই বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি সমাজে রীতি-মতো আলোচনার বস্তু। শিক্ষিত বাঙালীসমাজ ইতিমধ্যে সতীদাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুখ্যত ধর্মীয় কারণে ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সতীদাহ-কেন্দ্রিক বাদানুবাদ সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যত মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই বাদানুবাদ চরমপন্থী ইয়ংবেঙ্গল (অবশ্য উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ইয়ংবেঙ্গলের মনোভাব ধীরে ধীরে নমনীয় ও আপসপন্থী হয়ে উঠতে থাকে—এ সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি) ও ধর্মসভাপন্থী রক্ষণশীলদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মধ্যপন্থীরা এ বিষয়ে সুযোগসুবিধা মতো মতামত প্রকাশ করতেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুর দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ করার সংবাদ পেয়ে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"[৫০] প্যারীচরণ সরকার প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের কাছে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পর চাঁদা চাইতে গেলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করে প্যারীচরণকে এরকম 'ধর্মবিরোধী অনুষ্ঠানে' যোগ

৪৮ 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০০-১।

৪৯ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২২১।

৫০ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ৯৯।

দেওয়ায় ভৎর্সনা করেন। রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদও মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে লোকনিন্দার ভয়ে নাকি প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নি। বিদ্যাসাগর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিয়েবাড়িতে টাঙানো রামমোহনের ছবি অপসারণের আদেশ দেন। রমাপ্রসাদ-সম্পর্কিত এই গল্পকাহিনীটি আধুনিক গবেষকরা[৫১] গ্রহণ করলেও, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের যে বিবরণ 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করে তাতে দেখি, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, নৃসিংহচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ইত্যাদির সঙ্গে রমাপ্রসাদ রায়ও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।[৫২]

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এই 'বাদানুবাদ'কে আধুনিক যুগ-নির্দেশিত পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, এবং পরে অধ্যক্ষ 'অভিনব পণ্ডিত' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রথম যৌবনে যে বছর তিনি অর্জিত বিদ্যার জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করলেন (তার পরের বছরের এপ্রিল, ১৮৪২-এর 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরের' সাক্ষ্য অনুযায়ী) তখনই বিধবাবিবাহ নিয়ে সাধারণে 'বাদানুবাদ' শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র কোনোভাবে এই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন কিনা আমরা জানি না, বা আজকে জানার বিশেষ কোনো উপায়ও নেই। কিন্তু এই 'বাদানুবাদ' নিশ্চয়ই তিনি আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সভ্য হিসাবে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বা নব্যবঙ্গের অন্যান্য মুখপত্রগুলির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন এ ধারণা অসঙ্গত নয়। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর আলাপ আলোচনা থেকে ও দীর্ঘ শাস্ত্র অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এ প্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয়, তাও অনুভব করেন। দীর্ঘকাল তিনি বিধবার দুরবস্থা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, এবং তাঁর এ সম্পর্কিত পুস্তিকা তাঁর সমাজ সচেতন মনের পরিচয়বাহী।

বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলের সীমাবদ্ধ কর্মপ্রয়াসকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিলেন। তাই নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশের এক যুগেরও পর ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন

৫১ 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', ইন্দ্রমিত্র, পৃ. ৩২৮।

৫২ প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিবরণটি বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' (১৩০৭) গ্রন্থে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন, পৃ. ৩০৪-৭।

সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে (পৃ. ১৬৬-১৭৪) বিদ্যাসাগরের লেখা 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এতে বিদ্যাসাগর লেখেন, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে সমাজে যে নানা অনিষ্ট ঘটছে তা অনেকেই জানেন, কাজেই পক্ষপাতশূন্য হয়ে সকলের বিচার করা উচিত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা। বিদ্যাসাগর বিচার করে দেখান, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম। বহুশাস্ত্রদর্শী ঈশ্বরচন্দ্র বহু শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে 'কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে সর্বপ্রকারেই কর্তব্যকর্ম' তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেন। পুস্তিকাটির শেষাংশে বিদ্যাসাগরের সচেতন সমাজমানসিকতা প্রকাশিত :

'দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে ; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।

পরিশেষে, সর্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া, দেখুন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।'[৫৩]

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীসমাজে (কলকাতায় এবং বাইরেও) প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল। তখনকার সমাজে এক সপ্তাহের মধ্যে 'প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক' নিঃশেষ হয়ে গেলে, বিদ্যাসাগর উৎসাহিত হয়ে আরও 'তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত'

৫৩ 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (২য় খণ্ড, সমাজ), পৃ. ৩২-৩।

করেন। তারও বেশির ভাগ অতি অল্পদিনের মধ্যে 'বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক পরিগৃহীত হয়।' বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী এর পরে আরও দশ হাজার বই ছাপা হয়।[৫৪] শুধু তাই নয়, 'কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক, উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার' করলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর এ বিষয়ে কম করে ৩০টি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশিত হয়।[৫৫] বিদ্যাসাগরের সাক্ষ্য অনুযায়ী উত্তরদান কালে অনেকেই ক্রোধে অধৈর্য হয়ে অল্প দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, কেউ বা যথার্থ অযথার্থ বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ইচ্ছা করে কেবল 'কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন' করেছেন। সাধারণ লোক শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সংস্কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা। সেই সুযোগে অনেক প্রতিবাদকারীই সংস্কৃতের বিপরীত অর্থ লিখেছেন পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্য। পাঠকও তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে। বিদ্যাসাগর এই বলে আক্ষেপ করেছেন, 'উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।' ক্ষোভ এবং দুঃখের সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 'ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাস-বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।'[৫৬] বিদ্যাসাগর 'বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম' করে সে সকল কথা 'প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী' বোধ করেন, সেই সকল কথার 'যথাশক্তি প্রত্যুত্তর' দেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে। বৃহদায়তন এই পুস্তকটি বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য এবং সাহসের পরিচায়ক। আনন্দমোহন বসু ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজনবীশ বন্ধুর সাহায্যে তিনি বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাদুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'Marriage af Hindu Widows' নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫-তে বিষ্ণু শাস্ত্রী মারাঠীতে এর অনুবাদ করেন।[৫৭] বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটিরও চার-পাঁচটি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময়ের পত্র-পত্রিকায়, ছড়া-গান-কবিতায়, নাটক-নকশা-পাঁচালি ও বিভিন্ন সভা-

৫৪ 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' (১৯৬২), শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃ. ১১০।

৫৫ বিধবাবিবাহ আন্দোলনাশ্রয়ী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

৫৬ 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (২য় খণ্ড, সমাজ), পৃ. ৩৬।

৫৭ '*Dawn of Renascent India*', Dr. K. K. Datta, P. 133, F. N.

সমিতিতে[৫৮] বিধবাবিবাহ নিয়ে গরম গরম আলোচনা চলতে থাকে। বাংলা পত্রিকার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'মাসিক পত্রিকা' প্রভৃতি বিদ্যা-সাগরী আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এল। প্রথমে শিক্ষিতমণ্ডলীর ও পরে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব ও বিদ্যাসাগরের নাম ছড়িয়ে পড়ল। যে আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগর তাকে বৃহত্তর জনসমাজে প্রসারিত করলেন। কিন্তু তা করলেন তিনি কিভাবে ?

বাস্তব সমাজবোধ থেকে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন বিধবাবিবাহকে কাগজ কলমে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করা সম্ভব হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন ভিন্ন তাকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় আইনের জোরেই সতীপ্রথা নিবারণের কথা তাঁর নিশ্চয় মনে ছিল। তাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে এক-দিকে তিনি শাস্ত্রসন্ধানী, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাশের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতীর্ণ। ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ৪ অক্টোবর, ১৮৫৫ তারিখে তিনি ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনপত্রটিতে এই নীতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর দেশাচারকে অশাস্ত্রীয় ও সামাজিক অকল্যাণের কারণ বলা হয়। আবেদনকারীদের মতে বিধবাবিবাহ বিবেকবিরুদ্ধও নয়, তাই তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে বিধবা-বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করেছেন ; 'যাতে হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকার বাধা দূর হয় এবং বিবাহজাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলে গৃহীত হয়।'

১৭ নভেম্বর, ১৮৫৫ ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য, ঐ সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রাণ্ট বিধবাবিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপির এক খসড়া করেন। সার জেমস কলভিল ও পি. ডাবলিউ. লিগেট তা সমর্থন করেন।

এরপর এই আন্দোলন বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়। যেমন :

৫৮ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় বিধবাবিবাহ বিষয়ে আলোচনা হত। বিদ্যা-সাগরের পুস্তক প্রকাশিত হলে কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে এক সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বিদ্যাসাগর প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলির বৈধতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। ফলে কৃষ্ণনগরে নতুন করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

পুনার অধিবাসীদের চিঠি, ৭ নভেম্বর, ১৮৫৫ (৪৬ জনের স্বাক্ষরসহ)
ভিঞ্চুরের মারাঠা অধিনায়কের চিঠি, ১২ জানুয়ারি, ১৮৫৬
সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের চিঠি
উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের চিঠি

সাতারা, ধারওয়ার, বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি অঞ্চলের চিঠি। 'এইসব অঞ্চলের আবেদনপত্রের মধ্যে দেখা যায়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু তাহলেও ভিঞ্চুরের মারাঠা নায়ক এবং সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন।'[৫৯] দাক্ষিণাত্যেও এই বিষয়ক বিতর্ক বেশ দানা বেঁধে ওঠে।

৯ জানুয়ারি, ১৮৫৬-এ আইনের প্রস্তাবটি দ্বিতীয়বার পাঠ করে ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৬-তে আইনের পাণ্ডুলিপিটি সিলেক্ট কমিটির কাছে অর্পণ করা হয় (সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন জেমস কলভিল, এলিয়ট, পি. ডাবলিউ. লিগেট, জে. পি. গ্রাণ্ট)।

বাংলাদেশেও এই প্রস্তাবিত আইনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ১৭ মার্চ, ১৮৫৬-তে প্রায় ৩৩,০০০ জনের স্বাক্ষরযুক্ত[৬০] এক প্রতিবাদপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান হয়। এই আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ বলা হয়। রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ-পত্রটি ছাড়াও নদীয়া, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার লিখেছেন, 'এই আইনের বিরুদ্ধে ৫০।৬০ সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষরিত ৪০ খানির উপরও আবেদন-পত্র পেশ হইয়াছিল, ইহার পক্ষে হইয়াছিল, ৫ সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত ২৫ খানি আবেদনপত্র।'[৬১] রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে অর্পিত পূর্বোক্ত প্রথম আবেদনপত্রটি ছাড়াও রাধাকান্ত দেব সহ ৬১৭

৫৯ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (৩য় খণ্ড), শ্রীবিনয় ঘোষ, পৃ. ১৯৩।

৬০ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৩৬,৭৬৪। ইন্দ্রমিত্র ভারতের অভিলেখাগারে রক্ষিত মূল আবেদনপত্রটি পরীক্ষা করে স্বাক্ষরদাতার সংখ্যা প্রায় ৩৩,০০০ বলে অনুমান করেছেন। 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', ইন্দ্রমিত্র, পৃ. ২৯৭, পাদটীকা।

৬১। 'বিদ্যাসাগর', বিহারীলাল সরকার, পৃ. ২৯৫।

জনের স্বাক্ষরযুক্ত দ্বিতীয় একটি আবেদনপত্র ৫ জুলাই, ১৮৫৬-এ সরকারের কাছে পেশ করা হয়।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে বাংলাদেশের আবেদনপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, কালীচরণ লাহিড়ী, ব্রজনাথ মুখার্জি, দুর্গাচরণ সেন; উমেশচন্দ্র শর্মা মৈত্র এবং কৃষ্ণনগরের আরও অনেক সম্ভ্রান্ত (২৬ জনের) ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর, ১৮৫৫)।

(২) কৃষ্ণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিদের ১২৯ জনের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর, ১৮৫৫)।

(৩) কলকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র (২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৫)।

(৪) বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় ৩১৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫)।

(৫) কলকাতা শহরের প্রায় ৬৮৫ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, অভয়চরণ বসু, রাজকিষণ মুখার্জি, ভবনাথ সেন, দীননাথ দাস।

(৬) শান্তিপুরের জমিদার, তালুকদার, প্রধান গোঁসাই ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের (প্রায় ৫৩১ জন) আবেদনপত্র।

(৭) মুর্শিদাবাদ সার্কেল-পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬)।

(৮) মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২৯ মার্চ, ১৮৫৬)।

(৯) বাঁকুড়া ও বর্ধমানের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র (১৫ এপ্রিল, ১৮৫৬)।

(১০) বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আর একটি আবেদনপত্র (১০ এপ্রিল, ১৮৫৬)।

(১১) ডিরোজীয়ানদের বা ইয়ংবেঙ্গলদলের আবেদনপত্র, প্রায় ৩৭৫ জনের স্বাক্ষরসহ (৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬)। [ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের আবেদনে প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ('by a special marriage law') তা অনুষ্ঠিত করার কথা বলেন। অবশ্য তাঁদের আগে ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬-এ কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৪৪ জনের স্বাক্ষরসহ এক আবেদনে

বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের দাবি তোলেন। এই আইন বাস্তবে রূপ পেয়েছিল কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে।]

(১২) চট্টগ্রামের হিন্দু বাসিন্দাদের আবেদনপত্র (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬)।[৬২]

এছাড়া ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও এর স্বপক্ষে আবেদন করা হয়েছিল।

নির্বাচক সমিতি প্রস্তাবিত আইনটি সমর্থন করে ৩১.৫.১৮৫৬-এ তাঁদের মন্তব্য পাঠান। ১৯.৭.১৮৫৬-এ আইনের পাণ্ডুলিপিটি তৃতীয়বার পঠিত হবার পর গৃহীত হয়। শেষপর্যন্ত, ২৬ জুলাই, ১৮৫৬-এ গবর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। এই আইন প্রণয়নে নির্বাচক সমিতির সদস্যদের মধ্যে গ্রান্টের ভূমিকা সবচেয়ে সক্রিয় হওয়ায়, আইন পাশ হবার পরে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি গ্রাণ্ট সাহেবকে অভিনন্দন জানান।

আইন তো পাশ হল, কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিধবাকে কে বিয়ে করবে—আর কেই বা নিজের বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে ? বিদ্যাসাগর তাই বলে নিরাশ হলেন না, চেষ্টা চালাতে লাগলেন। অবশেষে আইন পাশ হবার মাস চারেক পরে পাত্র-পাত্রীর সন্ধান মিলল। ঘটকালি করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। আইনসিদ্ধ হবার সাড়ে চার মাস পরে ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬-এ বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের ১২ নম্বর বাড়ীতে, প্রথম বিধবাবিবাহের আসর বসল। পাত্র রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন,[৬৩] পাত্রী বর্ধমানের পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এগারো বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতী দেবী।

৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬ সারা কলকাতায় হৈ হৈ ব্যাপার ! সুকিয়া স্ট্রীটের আশে

৬২ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (৩য় খণ্ড), শ্রীবিনয় ঘোষ, পৃ. ২০০-১।

৬৩ শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহে রাজি হয়ে সবকিছু ঠিকঠাক হবার পরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় পেছিয়ে এলে বিধবাটি তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনে চল্লিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। ২৭. ১১. ১৮৫৬-এর 'ইংলিশম্যান এ্যাণ্ড মিলিটরি ক্রনিকল' ও ২. ১২. ১৮৫৬-এর 'সম্বাদ ভাস্কর' এজন্য শ্রীশচন্দ্র এবং সেইসূত্রে নব্যদলের এ-বিষয়ক আন্তরিকতায় সংশয় প্রকাশ করে। কয়েকদিন পরে অবশ্য এই শ্রীশচন্দ্রই প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন।

পাশে হাজার দুয়েক লোক ভিড় জমিয়েছে, গণ্ডগোলের আশঙ্কায় বেশ কিছু পুলিশও মোতায়েন। বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠান নিখুঁত ভাবেই হল। স্ত্রী-আচারের সময় একাধিক কোমল হাতের নাক কান মোলা খেয়ে শ্রীশচন্দ্র বেশ কোনঠাসা হয়ে পড়লেন। 'হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু'-রমণীদের একান্ত প্রার্থনায় 'বর বাহাদুর' শেষ পর্যন্ত 'ভ্যাও' করেছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর আহারের ব্যবস্থাটিও ছিল পরিপাটি।

এর পরেই ৯ ডিসেম্বর, ১৮৫৬-এ পানিহাটির কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছরের একটি বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়। মেয়েটিকে তাঁর বাবাই সম্প্রদান করেন। এই দুটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হবার পর 'চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত' হতে আরম্ভ হয়েছে দেখে 'তত্ত্ববোধিনী' আনন্দ প্রকাশ করে।[৬৪] তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মদনমোহন বসু এই বিবাহ করেন। আইন পাশ হবার পর যাঁরা বিধবাবিবাহ করতেন, ও যাঁরা তাঁদের উৎসাহ যোগাতেন, তাঁদের নানারকম সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হত।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাজেই বাঙালীসমাজে এই আন্দোলনের সাফল্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নটি সমাজে আলোচিত হলেও, তা ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ব্যক্তিগত প্রয়াসের কথা বাদ দিলে এ বিষয়ক আলোচনা ভাষা পেত ইংরেজি পত্রপত্রিকায়। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এই দুটি বাংলা পত্রিকায় প্রশ্নটি আলোচিত হলেও, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর এ দুটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা সীমিত। রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'য় বা ইয়ংবেঙ্গলের 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে' বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি আলোচিত হয়ে থাকলেও দু'টির কোনটিই 'জনসভা' নয়। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব তিনি সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকে সংহত করে এমন একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা জনমনকে আলোড়িত এবং সমাজকে বিচলিত করে তোলে। ইয়ংবেঙ্গল যেখানে নারীর মানসমুক্তির জন্য বিধবাবিবাহে আগ্রহী, বিদ্যাসাগর সেখানে 'বাঙালী মায়ের মতো হৃদয়' দিয়ে বিধবা মেয়েদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে সমাজ রক্ষাকল্পে

---

৬৪ 'বিধবাবিবাহ', 'তত্ত্ববোধিনী', ১৬১ সংখ্যা, পৌষ, ১৭৭৮ শক।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে অবতীর্ণ। ইয়ংবেঙ্গলের আবেদন সেখানে প্রধানত যুক্তিগ্রাহ্য, বিদ্যাসাগরের আবেদন সেখানে যুক্তিগ্রাহ্য হয়েও প্রধানত মানবিক।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমাজকে আলোড়িত করেছিল, ঝড় তুলেছিল বাঙালীসমাজে। কিন্তু সমাজে তা স্বীকৃতি পায়নি। লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে 'সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে একশত বিধবাবিবাহ' হয়েছিল কিনা সন্দেহ।[৬৫] বিদ্যাসাগর-জীবনীকার জানিয়েছেন, 'আইন পাশ হইবার পর ৬০।৭০টি মাত্র বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া হিন্দুসমাজে স্বীকৃত হয় নাই।'[৬৬] উনবিংশ শতাব্দীতে যত বিধবাবিবাহ হয়েছিল, তারচেয়ে বেশি না হলেও প্রায় সমসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা এই আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ যদিও বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ছিল মূলত মানবিক, কিন্তু তাঁর আন্দোলনের সাফল্য মূলত আইন প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ।

আসলে বিধবাবিবাহ আন্দোলন একান্তভাবে সীমাবদ্ধ আন্দোলন, মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের হিন্দু-বালবিধবা সংক্রান্ত (বাংলার তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়ে বিদ্যাসাগরী আন্দোলনের আগেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল), কাজেই ব্যাপক অর্থে একে মানবিক সমস্যা বলা চলে কিনা সন্দেহ। সতী আন্দোলনের মতো এর সঙ্গে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত ছিল না। আর এর বিরুদ্ধে যুগ-সঞ্চিত সংস্কার গড়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিঘ্নস্বরূপ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষেধ—এই তিনটি সমস্যা সম্পর্কেই সচেতন বিদ্যাসাগর সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বিধবাবিবাহের ওপর (৩১ শ্রাবণ, ১২৭৭-এ বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে এক পত্রে লেখেন, 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম')। বিধবাবিবাহ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আদৌ সহায়ক হবে কিনা এ সম্পর্কে কোনো সংশয় তাঁর মনে দেখা দেয় নি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সমসাময়িক বাঙালী মুসলমানসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকলেও, সেখানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

৬৫ 'বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন', শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'ইতিহাস', ৬ষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৬২, পৃ. ১১৫।

৬৬ 'বিদ্যাসাগর', বিহারীলাল সরকার, পৃ. ৩০৩।

উনিশ শতকের বাঙালীসমাজে শুধুমাত্র বিধবাবিবাহ শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত, মানসিক জড়তাগ্রস্থ নারীদের মুক্তির পথ দেখাতে পারত কিনা সন্দেহ। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ সমস্যা বালবিধবাদের সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাল্যবিবাহ রোধ হলে এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলে বালবিধবাদের সমস্যা যে অনেকটা নিবারিত হবে বিদ্যাসাগর তা জানতেন। বিধবাবিবাহের মতো এ দুটি সম্পর্কে সাধারণের সংস্কারও প্রবল ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি প্রথমেই বিধবাবিবাহ প্রচলনে আগ্রহী হন। কিন্তু কেন ?

বিদ্যাসাগর 'করুণাসাগর।' চোখের সামনে বাঙালীসমাজে বালবিধবার দুরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। সেজন্য তিনি বিধবাবিবাহের জন্য 'সর্বস্বান্ত' হতে এমনকি 'প্রাণান্ত স্বীকারেও' 'পরাঙ্মুখ' হন নি।

বিধবাবিবাহ আইন দীর্ঘদিনের সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি। দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশই বিয়ে করত টাকার লোভে, বা রমণীভোগের প্রলোভনে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'সম্বাদ ভাস্করে' ঘোষণা করেছিলেন 'সংবৎসরের মধ্যে' প্রত্যেক বিধবাবিবাহকারীকে তিনি হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সর্বত্র তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। হরি চক্রবর্তী নামক একজন অর্থলোভী 'বিধবাবিবাহকারক' এই প্রতিশ্রুত অর্থ না পেয়ে 'ভাস্কর' সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে দুঃখ প্রকাশ করেন।[৬৭] বিধবাবিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই নাকি একজায়গায় লিখে গেছেন, ৬০টি বিধবাবিবাহের জন্য তাঁর ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।[৬৮] জীবনসায়াহ্নে এই উপলক্ষে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিদ্যাসাগর ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে লেখেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'[৬৯] অনেকে অর্থলোভে তাঁকে প্রবঞ্চনা করে বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে বহুবিবাহ করত। এই বজ্জাতি বন্ধ করার জন্য তিনি শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন। মানব-প্রেমিক বিদ্যাসাগর কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন সহজেই অনুমেয়। জীবনসায়াহ্নে তিনি বুঝেছিলেন, বহুবিবাহ রহিত না হলে

---

৬৭ 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৩য় খণ্ড), শ্রীবিনয় ঘোষ, পৃ. ৩৭৭।

৬৮ 'ভিক্টোরীয় যুগে বাংলা সাহিত্য', হারাণচন্দ্র রক্ষিত, পৃ. ২১৩।

৬৯ 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৫।

এবং লোকের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ না জাগলে, শুধু আইনের জোরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলেও তা সার্থক হবে না। তা যে হয়নি, বাঙালী সমাজজীবনই তার সাক্ষ্যবহ।

(৪)

৭ ডিসেম্বর, ১৮৩৯-এ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত এক সংবাদে দেখি: 'বালি। সম্বাদপত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল বালি গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশত পত্নীকে বিধবা করিয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।'[৭০] 'বালি গ্রামনিবাসি' গোবিন্দচন্দ্রের মতো পৈতাসর্বস্ব বিবাহ-ব্যবসায়ী অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ উনিশ শতকেও বিবাহের নামে অবাধে বাঙালী মেয়েদের সর্বনাশ করত।

প্রচলিত ধারণা-অনুযায়ী দ্বাদশ শতকে বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকরা (যেমন রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই এ কথা স্বীকার করেন না। ঠিক কোন সময়ে বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথার আবির্ভাব হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাব বলা না গেলেও পঞ্চদশ শতকের আগেই যে এর প্রথম সূচনা, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নেই।

কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে প্রচলিত গল্পকাহিনীতে দেখি, সম্মানলাভের জন্য সমস্ত প্রজা সৎপথে চলবে, এই উদ্দেশ্যে বল্লালসেন কৌলীন্যমর্যাদা সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রোত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা নবগুণ-বিশিষ্ট (আচারো বিনয়ো বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥) বল্লাল তাঁদের কুলীন উপাধি দিয়েছিলেন।[৭১] তিনি নিয়ম করেছিলেন ৩৬ বছর অন্তর একবার বাছাই করে গুণ ও কাজ দেখে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন নির্বাচিত হবে, কাজেই কুলমর্যাদা লাভের জন্য সকলেই ধার্মিক ও গুণবান হতে চেষ্টা করবে।

শোনা যায়, বল্লালসেন কৌলীন্য স্থাপনের দিন স্থির করে নিত্যক্রিয়া সেরে ব্রাহ্মণদের রাজসভায় উপস্থিত হতে বলেন। নির্দিষ্ট দিনে প্রথমদল ব্রাহ্মণ আসে এক প্রহরের সময়, দ্বিতীয় দল দেড় প্রহরের সময়, শেষ দল আড়াই প্রহরের সময়। বল্লালসেন এই শেষোক্তদের কুলীন হিসাবে চিহ্নিত করেন, কারণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের নিত্যক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগে, কাজেই তাঁদের

৭০ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৫৪।

৭১ 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' (১৩১৭), দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, পৃ. ২৬।

দেয়ী করে আসাই স্বাভাবিক। প্রথম দল 'গৌণ কুলীন' ও দ্বিতীয় দল 'শ্রোত্রিয়' নামে অভিহিত হয়।

অল্পদিনের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণদের বল্লালসেন নির্দিষ্ট নটি গুণ লোপ পাওয়ায় তারা হয়ে উঠল 'নিগুর্ণ-চূড়ামণি।' লক্ষ্মণসেন ঘোষণা করলেন, কৌলীন্যমর্যাদা বংশানুক্রমিক হবে, এবং পুত্রকন্যার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারবে। পুনরায় নির্বাচন করে মর্যাদা প্রদান করা তাঁর আমলে রহিত করা হল। এই নতুন নিয়মে হাজার দোষ দেখা দিল। শ্রোত্রিয়রা বহু ব্যয় করে কুলীনে কন্যা দিয়ে কুলমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগল। কুলীনরা অর্থলোভে বহুবিবাহে প্রবৃত্ত হয়ে বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠল।[৭২] পক্ষান্তরে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রদের বিবাহোপযোগী কন্যার অভাব দেখা দিল।

ইতিমধ্যে দেবীবর নামে এক ঘটক দোষানুসারে কুলীনদের মোট ৩৬টি সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। এরই নাম 'মেলবন্ধন।' জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত—এই তিনপ্রকার দোষে মেল হত। রণ্ডদোষ, বলাৎকার দোষ, অন্যপূর্বা দোষ, গড়গড়ি দোষ, চোৎখণ্ডী দোষ, হড় দোষ, হাড়ি দোষ, গুড়-দোষ, পিণ্ড দোষ ইত্যাদি কত অদ্ভুত ও বিচিত্র সব দোষ কুলপঞ্জিকাকারদের মাথায় এসেছিল, তার ঠিক নেই! কুলীনদের এই ৩৬টি মেলের মধ্যে ২২টি প্রকৃতির নামে, ৬টি গ্রামের, ৩টি উপাধির ও ৫টি দোষের নামে আখ্যাত হয়। এই ৩৬টি মেলের মধ্যে বল্লভী, সর্বানন্দী, সুরাই, চট্টরাঘবী, ভৈরবঘটকী, মাধাই, চান্দাই, বিজয়পণ্ডিতী, শতানন্দখানী, মালাধরখানী, দশরথঘটকী, কাকুস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, পরমানন্দ মিশ্রী ও ছয়ী এইগুলি প্রকৃতির নামে, ফুলিয়া, খড়দহ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালী ও নড়িয়া এই ৬টি গ্রামের নামে, পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা, আচার্যশেখরী এই ৩টি উপাধি হতে, এবং ছায়া, পারিহাল, শুঙ্গ সর্বানন্দী, প্রমোদনী ও হরি মজুমদারী এই ৫টি দোষের নামানুসারে হয়েছে।[৭৩] দেবীবরের এই 'মেলবন্ধন' প্রচলিত হবার আগে কুলীনদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হত, যাকে 'সর্বদ্বারী বিবাহ' বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক অল্পঘরের মধ্যে 'মেলবন্ধন' হওয়াতে কুলীনের ঘরে

৭২ 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস', দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, পৃ. ৩৬।

৭৩ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (প্রথমভাগ, ব্রাহ্মণকাণ্ড), নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ২০১।

'ঠেকা মেয়ে'র[৭৪] সংখ্যা গেল বেড়ে, আর ঘরে ঘরে দেখা দিল 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে' এই কাব্যপংক্তির বাস্তব রূপ।

সমাজ ভরে গেল নানারকম অনাচার ও দুর্নীতিতে। কৌলীন্যপ্রথার ফলে একদিকে বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ, অন্যদিকে বিগতযৌবনার সঙ্গে বালকের বিবাহ হতে লাগল। ধর্মশাস্ত্রে বয়স্থা কন্যার বিবাহ নিন্দিত হলেও মেলী কুলীন শ্রীনাথ আচার্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করে ইঙ্গিতে তার সমর্থন করলেন।[৭৫] কৌলীন্যের প্রভাবে চারমাস থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত সববয়সী সমমেলের আইবুড়ো মেয়েকে এক পাত্রে সমর্পণের ঘটনা যেমন ঘটত, তেমনি ৭ বছরের ছেলের ঘাড়েও ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সী ৮।৯টি বউ চাপিয়ে দেওয়া হত! একই দিনে একটি কুলীন চার বা ততোধিক কন্যার পানিগ্রহণ করেছে এমন দৃষ্টান্তও ছিল! এমনও শোনা যায়, কোনো গৃহকর্তা পাত্রের অভাবে তাঁর সমস্ত অবিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের একই কুলীন সন্তানের হাতে সমর্পণ করেছেন।[৭৬] অনেক কুলীনকন্যা বিয়ের রাতেই প্রথম ও শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখতেন। না, ভুল বললাম, ভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা বিবাহবাসরের পর সহমরণে যাবার সময় দ্বিতীয়বারও এই সুযোগ পেতেন! শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত কুলীনদের বিয়ে করার কথা গল্পকথা নয়। মাত্র ৬০টি বিবাহকারী রামলোচন বৃদ্ধবয়সে যে রাতে কাঞ্চনী গ্রামের রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মেয়েকে বিয়ে করেন, তার পরদিনই ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। বলে রাখা ভালো—দুর্ঘটনায় নয়, স্বাভাবিকভাবেই।[৭৭] বিবাহরাত্রে স্ত্রীর কাছে আলাদা অর্থ উপহার না পেলে অনেক কুলীন স্ত্রীর সঙ্গে একশয্যায় শুতে অস্বীকার করত—এ ধরনের ঘটনার বিবরণও সমকালীন পত্রিকায় মেলে।[৭৮] শতবিবাহকারী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ উনিশ শতকেও পাওয়া যেত, আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই এরকম এক মহাপুরুষের মৃত্যুসংবাদ উদ্ধৃত করেছি। শত-

৭৪ ঘর থাকলেও 'স্বজনাদোষের ভয়ে' চিরকুমারী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাকে 'ঠেকা মেয়ে' বলা হত। (দ্র. নগেন্দ্রনাথ বসুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৮, পাদটীকা)।

৭৫ নগেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৭।

৭৬ 'বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথার অত্যাচার', 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি', ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩১।

৭৭ '*Polygamy of the Kulin Brahmans*', 'The Calcutta Christian Observer', February, 1836, P. 58-9, F. N.

৭৮ ঐ, পৃ. ৬০, পাদটীকা।

পত্নীক কুলীনরাও ব্যভিচারী হত। এসবের ফলে সমাজদেহ যে কলুষিত হচ্ছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অনেক কুলীনের মেয়েকে শেষপর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে হত। কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের হিসাব অনুযায়ী ১৮৫৩ সালে কলকাতার ১২,৪১৯ জন দেহোপজীবিনীর মধ্যে অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা।[৭৯]

কৌলীন্যপ্রথা শুধু যে কুলীন মেয়েদেরই স্পর্শ করত তা নয়, সমস্যাটার অন্য একটা দিকও ছিল। আগেই বলেছি, কৌলীন্যপ্রথার ফলে একদিকে অসংখ্য মেয়ে কুলীনদের বহুপত্নীর অন্যতম হয়ে মনের বেদনা মনেই লুকিয়ে রাখত। অন্যদিকে পাত্রীর অভাবে অকুলীন অনেক ব্রাহ্মণের বিয়ের ফুলই ফুটত না। অর্থ ব্যয় করে তাদের স্ত্রী যোগাড় করতে হত। ফলে, এই সময় বাংলাদেশে কন্যাবিক্রয় লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। অনেক তথাকথিত নিম্নবর্ণের মেয়ে, এমন কি মুসলমানের মেয়েকেও এই সুযোগে ব্রাহ্মণী বলে চালিয়ে দেওয়া হত। একদিকে শতদার কুলীন, অন্যদিকে অকৃতদার অকুলীন—এই পরস্পর-বিরোধী অবস্থা সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলল। বিবাহবঞ্চিত এইসব অকুলীনরা নিজেদের স্বার্থেই কৌলীন্যপ্রথার লোপ চেয়েছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এ প্রথায় হস্তক্ষেপ দাবি করে সরকারের কাছে আবেদন করার কথাও তাঁরা চিন্তা করেন।[৮০] অবশ্য শেষপর্যন্ত বোধহয় কিছুই হয়ে ওঠে নি। ১৮৩১-এ অকুলীন এইসব ব্রাহ্মণরা 'সমাচার দর্পণে' কুলীনদের অত্যাচার ও কৌলীন্য প্রথার ফলে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে একাধিক পত্র লেখেন।[৮১]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কৌলীন্যপ্রথা সমাজে সগৌরবে বর্তমান থাকলেও, বাংলার সচেতন জনগণ এর কুফল সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ কুলীন কন্যাদের অসহায় অবস্থা চিত্রিত করে রামমোহন লেখেন, 'অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি

৭৯ '*Kulin polygamy*', 'The Calcutta Review', Vol. XLVII, 1868, P. 142.

৮০ '*The Culin Brahmins*', The Asiatic Journal and Monthly Register', Vol. 5, No. 18, New Series, May-August, 1831, P. 115.

৮১ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৩-৬।

ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন'[৮২]—বাস্তবচিত্র যে এর চেয়ে ভয়াবহ ছিল বলাই বাহুল্য। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindu law of Inheritance'-এ রামমোহন তীব্রভাষায় এই প্রথার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে 'polygamy, a frequent source of the great misery in native females'. উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ যারা অর্থলোভে অথবা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ২০/৩০টি বিবাহ করে, তাদের স্ত্রীদের দুঃখের শেষ থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর পর এঁদের সামনে দাসীবৃত্তি করা, বাঁচার জন্য পাপের পথে পা বাড়ান, বা 'সতী' হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। বাংলাদেশে এই বহুবিবাহের ফলে আত্মহত্যার সংখ্যাও বহুগুণ বেশি। এভাবে এই প্রথাকে বিশ্লেষণ করে রামমোহন দেখান, 'This horrible polygamy among Brahmans is directly contrary to the law given by ancient authors.'[৮৩] কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ছাড়া রামমোহন দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থন করতেন না। এই প্রথা নিবারণের জন্য রামমোহন প্রস্তাব করেন যে, এক স্ত্রী বর্তমানে কারো দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছে হলে, স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন দোষ আছে প্রমাণ করে ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো রাজকর্মচারীর অনুমতিপত্র নিতে হবে। এ উপায়ে বাঙালী মেয়েদের দুঃখ ও আত্মহত্যার সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[৮৪] ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক বিবাহ করলেও, রামমোহন তাঁর উইলে তাঁর পুত্র বা অন্য কোনো আত্মীয়ের একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী থাকলে, তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার শর্ত আরোপ করেন।[৮৫]

রামমোহনের পরে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী এই প্রথার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁদের

৮২ 'রামমোহন রচনাবলী', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, সম্পাদিত পৃ. ২০২।

৮৩ '*The English Works of Raja Rammohun Roy*' (1906), P. 380

৮৪ ঐ, পৃ. ৩০৮

৮৫ '*Reform & Regeneration in Bengal (1774-1823)*', Dr. A. Mukherjee, P. 287.

গোষ্ঠীর সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকাগুলিতে এ সম্পর্কে আলোচনা হত। কৃষ্ণমোহনের 'এনকোয়েরারে' প্রকাশিত একটি লেখায় তীব্রভাবে এই প্রথার নিন্দা করা হয়।[৮৬] লেখার ভঙ্গি থেকে আমাদের অনুমান এটির লেখক সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নব্যপন্থীদের 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রথম থেকেই সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে কলম ধরে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল 'জ্ঞানান্বেষণে' 'কুলীনের বহুবিবাহ' প্রবন্ধে লেখা হয়, 'কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কি পর্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন কোন সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহু-বিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ ও তাঁহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।'

'জ্ঞানান্বেষণে'র ঐ তালিকায় বিভিন্ন স্থানের ২৭ জন কুলীনের নাম ও বিবাহ-সংখ্যা আছে। ময়াপাড়া নিবাসী জনৈক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি বিবাহের গৌরবে ভূষিত হযে তালিকার শীর্ষে আছেন। তিনি ছাড়াও আরও পাঁচজন অর্ধশত বিবাহকারী কুলীনের নাম এই তালিকায় পাই। এঁরা হলেন জয়রামপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায় (৬০), আড়ুয়ার রামকান্ত বন্দ্য (৬০), মালগ্রামের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় (৫৩), নগর-এর ক্ষুদিরাম মুখ (৫৪) ও বলুটীর দর্পনারায়ণ মুখ (৫২)।[৮৭] বহুবিবাহকারী কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্যা প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব সম্ভবত 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার' পত্রিকার। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ পত্রিকায় 'Polygamy of the Kulin Brahmans' নামক লেখায় ৫ জন বহুবিবাহকারীর নাম ও বিবাহসংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এরা হলেন :

ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিবাহ সংখ্যা—৪৩,
মুড়াগাছার কালী ঠাকুর—বিবাহ সংখ্যা—৬০,
সাতগাছি বেগুনির শ্রীধর চ্যাটার্জি—বিবাহ সংখ্যা—৬০,

৮৬ '*Polygamy Among the Hindoos*', reprinted from the Enquirer, 'The India Gazette', 14. 1. 1832.

৮৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৫২-৩।

শান্তিপুরের কাছে উলার জনৈক কুলীন—বিবাহ সংখ্যা—১০০,

রামলোচন —বিবাহ সংখ্যা—৬০।

এর অব্যবহিত পরেই 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ ২৭ জন কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর ৩৫ বছর পরে বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচারে' বর্তমানে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হয়েছে…এই প্রতারণা বাক্যের অসারতা প্রমাণকল্পে হুগলি জেলার ১৩৩ জন কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান ও বিবাহসংখ্যা উল্লেখ করেন।[৮৮] ঐ পুস্তকেই বিদ্যাসাগর কলকাতার নিকটবর্তী জনাই গ্রামের ৬৪ জন বহুবিবাহকারীর এক তালিকা দেন।[৮৯] এছাড়াও বিদ্যাসাগর বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের দু'খানি তালিকা সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকাকারে অমুদ্রিত বিবরণের কথা তাঁর বিদ্যাসাগর-জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। মোট ১৭৭টি গ্রামের ৬৫২ জন বহুবিবাহকারীর ৩৫৬৮টি বিবাহের কথা এই তালিকা থেকে জানা যায়। এই তালিকার সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি বরিশাল জেলার কলসকাটি গ্রামের জনৈক ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫৫ বছর বয়সেই তিনি মাত্র ১০৭টি মেয়েকে উদ্ধার করেছিলেন।[৯০] অবশ্য বিবাহসংখ্যার নিখিলবঙ্গ রেকর্ড তিনি স্থাপন করতে পারেন নি। উইলিয়ম ওয়ার্ড ১২০টি বিবাহকারী এক ব্যক্তির কথা আমাদের জানিয়েছেন। ১৮০টি বিবাহকারী আর এক ব্যক্তির কথা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। কুলীনদের নাম ও বিবাহ-সংখ্যা সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের উদ্যম প্রশংসনীয় হলেও, নিরপেক্ষ বিচারে, পথিকৃতের গৌরব তাঁর প্রাপ্য নয়। তাঁর আগেই খ্রীষ্টান মিশনরি ও ইয়ংবেঙ্গল একাজে হাত দিয়েছিলেন।

তিরিশের দশকে বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নটি সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেই এ নিয়ে 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র এ বিষয়ক বিতর্কের রেশ অন্যান্য পত্রিকাতেও লাগে। 'সম্বাদ কৌমুদী' এ বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে জনচেতনা জাগবে বলে আশা প্রকাশ করে। 'এনকোয়েরার' এবং

৮৮ 'বহুবিবাহ……', 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (২য় খণ্ড, সমাজ), পৃ. ২০১-৫।

৮৯ ঐ, পৃ. ২০৬-৮।

৯০ 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭২।

'জ্ঞানান্বেষণ' যে এ প্রথার ঘোর বিরোধী-আগেই তা বলেছি। ১৮৩১-এই 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' একজন দেশীয় ব্যক্তি বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয়-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই দুটি প্রথা নিষেধে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।[৯১] অবশ্য 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকের মতো 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদকও এ প্রথা রদে সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র জনৈক লেখক[৯২] বা অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বুদ্ধিজীবিও আইন করে এর নিষিদ্ধকরণ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে পারেন নি।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১-এর 'সমাচার দর্পণে' 'সম্বাদ কৌমুদী' থেকে 'শ্রীমতী অমুকী দেবীর একটি পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। একজন কুলীনকন্যা হিসাবে নিজের দুরবস্থা চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেরই সম্প্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনদের মর্যাদার হানি না হয় অথচ বিবাহ করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক তন্নিয়মে আমরা যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়া জানাইতেছি।'[৯৩] আমাদের অনুমান, পত্রখানি কোনো স্ত্রীলিখিত নয়, অকুলীন কোনো ব্রাহ্মণ লিখিত।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' এই প্রথার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সংখ্যার পর সংখ্যায় এ প্রথাকে আক্রমণ করে তা নিবারণের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভারে'র সম্পাদক এ ব্যাপারে খ্রীষ্টান জনগণকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েও স্বীকার করেন, এ ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলে তার জোর হবে দশগুণ বেশি। বিদেশী সম্পাদক অবশ্য এ প্রথা উচ্ছেদে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতে ভোলেন নি।[৯৪] ৭. ৪. ১৮৩৩-এ 'রিফর্মার'-এর সম্পাদকীয়তে এ প্রথাকে ধিক্কার জানিয়ে বলা হয়, 'Now coolin polygamy, as we have already shewn, is

৯১ '*The Culin Brahmins*', 'The Asiatic Journal and Monthly Register', Vol. 5. No. 18, New Series, May-August, 1831, P. 114-5.

৯২ '*Koolin Females*', 'The Friend of India', Vol. 1, No. 12 19. 3. 1835, P. 91.

৯৩ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৬-৭।

৯৪ '*The Reformer on the Polygamy of the Coolin Brahmuns*', 'The Cal. Christian Observer', March, 1833, P. 133.

injurious to society, by increasing adultery both among the wives of the Coolins and among those who are by this system deprived of wives, by demoralizing the nation, and by checking the increase of population. All these evils are directly opposed to the ends af civil government, and as the cause of them is not enjoined in the shasters the Government ought to abolish it'. এ বিষয়ক আইন প্রণীত হলে অসংখ্য নিরীহ নারী দাসত্ববন্ধন, হাজারো পাপ ও অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাবে। ইংলণ্ডে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, তাই ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে ভারতীয়রাও এদেশে এই আইন সম্প্রসারণের প্রার্থনা জানাতে পারে। এ প্রথা যে একইসঙ্গে ব্রিটিশ আইন ও হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী তার উল্লেখ করতেও সম্পাদক ভোলেন নি।[৯৫] এই প্রথার অবসানের জন্য 'রিফর্মার' আইন প্রণয়নের যে প্রস্তাব করে, ৮. ৪. ১৮৩৩-এ 'ক্যালকাটা কুরিয়র' কৌলীন্য প্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে তাকে সমর্থন জানায়। এ যুগে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক এ প্রথার প্রতি সশ্রদ্ধ হবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কটাক্ষের সম্মুখীন হন।[৯৬] শুধু 'রিফর্মার'ই নয়, ৪. ৭. ১৮৩৫-এ 'সমাচার দর্পণে' 'বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তানসমূহ' আধুনিক কৌলীন্যরীতি যে শাস্ত্রসম্মত নয় ও তা যে অশেষ অমঙ্গলের কারণ তা দেখিয়ে 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলন ও কন্যাবিক্রয় নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।[৯৭] ৪. ৭. ১৮৩৭-এর 'সমাচার দর্পণে' পাবনা জেলার জনৈক দর্পণ-পাঠক কৌলীন্য-প্রথার দোষ দেখিয়ে গবর্নর জেনারেলের কাছে নিয়ম প্রার্থনা করেন যাতে 'কোন ব্রাহ্মণ কন্যা ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক বিবাহের অধিক করিতে না পারেন ইহা হইলে শ্রীলশ্রীযুতের কীর্তি চন্দ্রসূর্যের [ন্যায়] চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে।'[৯৮] দেখা যাচ্ছে, দেশীয় পত্রিকাগুলি কৌলীন্য-প্রথার কুফল সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে, তাই দেশীয় পত্রিকায় বিষয়টির নিয়মিত আলোচনাই দেশীয়দের মধ্যে এ সম্পর্কে যথার্থ মনোভাব জাগাতে সমর্থ হবে বলে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মত প্রকাশ করে।[৯৯]

৯৫ '*The Reformer*, 7. 4. 1833.

৯৬ '*Polygamy*', The Reformer', 21. 4. 1833.

৯৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪৯-৫০।

৯৮ ঐ, পৃ. ২৫৩-৪।

৯৯ '*Koolin Females*', The Friend of India', Vol. 1 No. 12, 19. 3. 1835, P. 91.

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভারে' প্রকাশিত একটি লেখায় কৌলীন্যপ্রথাকে 'licentious, gross and corrupted' বলে, এর অবসানের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করে শেষে বলা হয়, 'If the subject were by petition regularly brought to the notice of our rulers by the natives themselves, and the evils of the system fairly but respectfully stated, to suppose that they would dismiss the case without consideration, lest they should interfere with usages of long standing, is to libel their morality'.[১০০]

'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভারে' প্রকাশিত এই লেখাটি সমাজে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'রিফর্মার'-এর দেশীয় সম্পাদক ও অন্যান্য ইংরেজি পত্রপত্রিকার সম্পাদকেরা 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভারে' প্রকাশিত লেখাটির সমর্থনে এবিষয়ে একাধিক রচনা প্রকাশ করেন। 'The result of the whole is, the declared intension of sereral respectable natives to forward a petition, begging Government to suppress this gross enormity.'[১০১] দেশীয় ব্যক্তিরা শেষপর্যন্ত বোধহয় সরকারের কাছে কোনো আবেদন করেন নি, না করে থাকলেও বলা যায়, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে 'রাজদ্বারে' এ প্রথা নিবারণ করার জন্য প্রার্থনা জানানোর বছর কুড়ি আগেই বিষয়টি সচেতন বাঙালীমনে দেখা দিয়েছিল।[১০২]

চল্লিশের দশকে বহুবিবাহ বিষয়ে সংস্কারকদের উদ্যম হ্রাস পায়। তার দুটি কারণ। এ সময়ে সংস্কারকরা বিধবাবিবাহ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠায় ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে 'বাদানুবাদ' শুরু হওয়ায়, বহুবিবাহ বিষয়ে সংস্কারকদের উৎসাহ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, এই পর্বে এ বিষয়ক আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষুদ্র

১০০ '*Polygamy of the Kulin Brahmans*', 'The Calcutta Christian Observer', February, 1836, P. 65.

১০১ '*Kulin Polygamy*', 'The Calcutta Christian Observer', March, 1836, P. 150.

১০২ এর আগে ১৮১৫-তে অকুলীনরা নিজেদের স্বার্থেই সরকারের কাছে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে আবেদন করার কথা ভেবেছিলেন, কোনো মানবিক চেতনা তাঁদের এ আবেদনে উদ্বুদ্ধ করেনি।

ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরের মতো কোনো সংস্কারক এই সময় এই আন্দোলনকে সংহত করে তার মধ্যে প্রাণের আবেগ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। চল্লিশের দশকের একটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' বহুবিবাহ সম্পর্কে এ সময়ে একটি লাইনও ব্যয় করেনি। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'ও ছিল প্রায় নীরব। হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের দ্বারা গঠিত 'হিন্দু ফিলেডেলফিক সোসাইটি'তে লাডলীমোহন দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি যুক্তি ও শাস্ত্রবিরোধী এই অমানবিক প্রথাকে অশেষ দোষের উৎস বলে বর্ণনা করে, এ প্রথা নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন। আগেই বলেছি, আইন করে সামাজিক পরিবর্তন আনতে ইয়ংবেঙ্গল সবসময় উৎসাহী ছিলেন না। তাই লাডলীমোহনের প্রবন্ধটিতে আইন করে এ প্রথা নিবারণের প্রস্তাব সম্পর্কে ১৬. ৭. ১৮৪৩-এর 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' মন্তব্য করে, 'এ বিষয়ে তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না কারণ প্রজার প্রতি রাজ্যাধিপতির কর্তব্য কর্ম বিবেচনা করিলে বিচার মতে আমরাও এ বিষয়ের প্রার্থনা করিতে পারি না এবং গভর্ণমেণ্টও কোন আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন না।'—কিন্তু তা যে গভর্নমেণ্ট পারে বা গভর্নমেণ্টের পারা উচিত, সেই কথাই জোরের সঙ্গে বলল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শন।' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাটিতে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একাধিক লেখায়[১০৩] যুক্তি এবং শাস্ত্র কোনো দিক দিয়েই এ প্রথা যে সমর্থন করা যায় না তা বলে, এ প্রথা নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। চল্লিশের দশকে পত্রিকাটির এই দাবি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর আগে একাধিক পত্রিকা এ ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল, কাজেই 'বিদ্যাদর্শনে'র এই দাবি 'অভিনব' কিছু নয়। এছাড়া 'বিদ্যাদর্শনে'র প্রচারসংখ্যা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ, কাজেই পত্রিকাটি জনমতকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পেরেছিল, মনে করার কোনো হেতু নেই।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে একটি লেখা বেরোয়। লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মানবতার স্বার্থে আইন করে এ প্রথা নিষিদ্ধ হোক—তা চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষাই উদ্ধৃত করি, 'For

১০৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'বিদ্যাদর্শনে'র ফাইল বর্তমানে অপ্রাপ্য। লেখাগুলি শ্রীবিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৩য়) গ্রন্থে সংকলিত।

humanity's sake then let poligamy be proscribed. The wife has a right to the undivided possession of the husband, and since Hinduism does not oppose, and the people are disposed to be friendly, let her cry for justice be listened to in the Council chamber and redress afforded by a legislative act of the Supreme Government'. দু'একটি পত্রিকায় এসব লেখালেখির বা দু'একটি সভায় এ বিষয়ক আলোচনার কথা মনে রেখেও, উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের স্রোত মন্দীভূত হয়েছিল বলতেই হবে।

পঞ্চাশের দশকে বাঙালীসমাজ বিষয়টি সম্পর্কে আবার আগ্রহী হয়ে ওঠায় পত্রপত্রিকাগুলি এর বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। সব সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আইনের পক্ষপাতী না হয়েও 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এদেশের দুরবস্থার অন্যতম কারণ অশাস্ত্রীয় ও ঘৃণ্য বহুবিবাহকে সরকার অনায়াসে আইন করে রহিত করতে পারেন বলে মত প্রকাশ করে। এর পরের বছর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দেশ-হিতৈষী জনৈক ব্যক্তি 'সমাচার দর্পণে' 'কৌলীন্যের দোষ' শীর্ষক এক পত্রে কৌলীন্যপ্রথার দোষ দেখিয়ে, এ বিষয়ক আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে লেখেন, 'হিন্দু স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ব্লাকআকৃট স্বরূপ কুলীনেরদের বহু-বিবাহের কাল নিয়ম শ্বেতপরিচ্ছেদধারী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হোআইট আকৃট ব্যতীত কদাচ নিবারণ হইতে পারে না।'[১০৫] পত্রপত্রিকায় বীরত্ব না ফলিয়ে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক সভা হতে বহুবিবাহ আইন করে রদ করার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র পাঠান হয়। 'বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে এই মর্মে'[১০৬] রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১৬৩৮ জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পাল্টা আবেদনও পেশ করা হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন করে কৌলীন্য-প্রথা রদ করার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদন করেন। প্রসন্ন-কুমারের এই আবেদনপত্রটি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' পুস্তকের

---

১০৫ 'সমাচার দর্পণ', ৫২ সংখ্যা, ২৪. ৪. ১৮৫২, পৃ. ৪১৫।

১০৬ 'বহুবিবাহ...', বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড, সমাজ), পৃ. ১৬৭।

বিজ্ঞাপনে কিছু বলেন নি, এবং হয়তো সেই কারণেই আধুনিক অনেক গবেষকই এটি সম্পর্কে প্রায় নীরব। সমকালীন সংবাদপত্রে প্রসন্নকুমারের এই আবেদন-পত্রটি সম্পর্কে লেখা হয়: 'Tuesday, March 6th—the Hurkaru has heard that Baboo Prosono Coomar Tagore has submitted to the Legislative Council for draft of on Act for abolishing the practice of polygamy among the natives.'[১০৭] অন্যক্ষেত্রে যাই হোক, বহুবিবাহের ক্ষেত্রে অন্তত 'রিফর্মারে'র সম্পাদক প্রসন্নকুমারের মনোভাব পরিণত বয়সেও পরিবর্তিত হয় নি।

২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ বিদ্যাসাগর এই প্রথা রদকল্পে আইন প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান। বর্ধমানের মহারাজা এই আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এই আবেদনপত্রটির পর কলকাতা, কৃষ্ণনগর, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, যশোর, ঢাকা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একের পর এক আবেদন পেশ করা হতে থাকে। কিশোরীচাঁদ, প্রসন্ন-কুমার ও বিদ্যাসাগরের আবেদন ছাড়া জুলাই, ১৮৫৬-র মধ্যে সরকারের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন আবেদনপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

(১) বর্ধমানের মহারাজার আবেদন, (২) নদীয়ার রাজার আবেদন, (৩) কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন, (৪) কলকাতা ট্যাঁকশালের হিন্দু কর্মচারীদের আবেদন, (৫) ভবানীপুর ও আলিপুরের অধিবাসীদের আবেদন, (৬) হুগলির কাশীশ্বর মিত্র ও অন্যান্য অধিবাসীদের আবেদন, (৭) হুগলির অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জি ও অন্যান্যদের আবেদন, (৮) হুগলির শিবনারায়ণ রায় ও অন্যান্যদের ২টি আবেদন, (৯) কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন, (১০) জয়কৃষ্ণ মুখার্জি ও অন্যান্যদের আবেদন, (১১) আঁটপুরের অধিবাসীদের আবেদন, (১২) বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন, (১৩) বর্ধমানের সারদাপ্রসাদ রায় ও অন্যান্যদের আবেদন, (১৪) বর্ধমানের পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জি ও অন্যান্যদের আবেদন, (১৫) নদীয়ার রামলোচন ঘোষ ও অন্যান্যদের আবেদন, (১৬) শান্তিপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, উমেশচন্দ্র রায় ও অন্যান্যদের আবেদন, (১৭) নদীয়ার সারদাপ্রসাদ মুখার্জি ও অন্যান্যদের আবেদন, (১৮) মেদিনীপুরের অধিবাসীদের

১০৭ '*The Hindu Intelligencer*', 12. 3. 1855.

২টি আবেদন, (১৯) যশোরের অধিবাসীদের আবেদন, (২০) ঢাকার অধিবাসীদের আবেদন, (২১) মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের আবেদন, (২২) রাজশাহীর অধিবাসীদের আবেদন, (২৩) বাঁকুড়ার অধিবাসীদের আবেদন, (২৪) দিনাজপুরের অধিবাসীদের আবেদন, (২৫) ময়মনসিংহের অধিবাসীদের আবেদন, (২৬) শান্তিপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের হিন্দুদের ২টি আবেদন, (২৭) কলকাতার অধিবাসীদের আর একটি আবেদন, (২৮) শ্রীমতী রসমণি দাসীর আবেদন, (২৯) কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর আবেদন, (৩০) বরানগরের হিন্দু অধিবাসীদের আবেদন।[১০৮] বহুবিবাহের বিরোধী এই আবেদনপত্রগুলিতে প্রায় হাজার দশেক লোকের সই ছিল। শীঘ্রই এ বিষয়ক আইন প্রণীত হবে একথা অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি ও অন্যান্যরা একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করে সরকারের কাছে অর্পণ করেন। মিঃ গ্রাণ্ট আশা প্রকাশ করেন, তিনি শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি বিল প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। বাংলাদেশের বাইরে থেকেও এ সময় বহুবিবাহের বিপক্ষে কয়েকটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়। সব দেখেশুনে ২৫. ১১. ১৮৫৬-এ 'সম্বাদ ভাস্কর' এ বিষয়ে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে, 'বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই।' গ্রাণ্টের সহযোগিতায় রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। প্রস্তুতি পর্ব ভালোরকম হলেও শেষ রক্ষা হল না।

এ সময়ে সিপাহী যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সরকার বিব্রত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলতে পারি, 'বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।' সরকার এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন করে কোনো সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিলেন না। আন্দোলনের প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি বলা যেতে পারে। আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা নিবারিত না হলেও, এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে যে জনমত গড়ে উঠছিল তাকেই এই পর্বের এ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের প্রধান ফল বলতে পারি।

১০৮ '*Anti-Polygamy Tracts*', No. 1. (1856), P. 12-4.

উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালীসমাজে মেয়েদের অবস্থা অনেককে ব্যথিত করে। মেয়েদের অবস্থার উন্নতি কিভাবে হবে—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল পথ একটাই—তা হল শিক্ষা। তাই শিক্ষার দ্বার মেয়েদের সামনে খুলে দিতে অনেকে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। মনে হতে পারে, স্ত্রীশিক্ষা জিনিসটা বুঝি আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমদানি করা অভিনব কিছু! ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।

হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনই জানানো হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও বিদ্যাবতী মহিলার অভাব ছিল না। রুক্মিণী, লীলাবতী, চিত্ররেখা, মৈত্রেয়ী, লক্ষ্মণসেনের পত্নী ইত্যাদির বিদ্যার খ্যাতি বহুবিস্তৃত। চৈতন্যযুগে জাহ্নবী দেবী, সীতা দেবী, সুভদ্রা দেবী, হেমলতা দেবীর মতো সুশিক্ষিতা মহিলার অভাব ছিল না। মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে 'বিদ্যা'র মতো বিদুষীর সাক্ষাৎ একটু খোঁজ করলেই মেলে। বৈষ্ণব পরিবারের অনেক নাম না জানা মেয়ে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতকের সূচনায় আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, হটি বিদ্যালঙ্কার, শ্যামমোহিনী-দেবী, দ্রবময়ী দেবী প্রভৃতির মতো মহিলা বাংলাদেশেই ছিলেন। মনে হতে পারে, এঁরা ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বাংলার অনেক জমিদার আর অভিজাত পরিবারেও স্ত্রীশিক্ষার রীতিমতো চল ছিল—বর্ধমান রাজপরিবার, কৃষ্ণনগর রাজপরিবার, শোভাবাজার রাজপরিবার—দৃষ্টান্তের অভাব নেই। শোভাবাজার রাজপরিবারের কর্তাব্যক্তি নবকৃষ্ণের ছ'জন স্ত্রীই বাংলা লিখতে পড়তে পারতেন।[১০৯] রাজা সুখময় রায়ের নাতনি আর শিবচন্দ্র রায়ের মেয়ে হরসুন্দরীর বিদ্যার খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। রামলোচন ঘোষ ও রাজা বৈদ্যনাথের স্ত্রী, আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক ও কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের মেয়েও এযুগে বিদ্যার্জন করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইংরেজি জানা অকালমৃত বড় মেয়ে সুরসুন্দরী দেবীর হাতের লেখাই শুধু মুক্তোর মতো ছিল না, বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখতেও পারতেন চমৎকার।

---

১০৯ '*Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur*' (1901), N. N. Ghose, P. 203.

বড় ঘরের এসব বড় কথা বাদ দিলেও দেখতে পাই, উনিশ শতকের সূচনাতে ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের অনেক মেয়ে বাড়িতে একটু আধটু লেখাপড়ার চর্চা করতেন। বিয়ের পরে চর্চার অভাবে লিখতে ভুলে গেলেও, অবসর সময় কাটাতে অনেকে রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডী ছাড়াও কৃষ্ণ, দুর্গা সম্বন্ধীয় বই-এর পাতা ওলটাতেন (প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ঠাকুমা, মা, খুড়িরা যে বাংলা বই পড়তেন তা 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকায় জানিয়েছেন।[১১০]) 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ ভাস্করে'র এইসব ভক্ত পাঠিকাদের দিবানিদ্রা বটতলার বই না হলে জমত না।[১১১] এমনকি পথ চলার ক্লান্তি দূর করতেও অনেকে বই পড়ত। এ ধরনের একটি চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ ১৮৪৯-এর 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে পাওয়া যায়। একটি যুবতী বউ, তার মার খুব অসুস্থতার খবর পেয়ে পাল্কি করে মাকে দেখতে যাবার সময়, দু'দিনের দীর্ঘ পথের ক্লান্তি দূর করতে ও সময় কাটাতে, পাল্কিতে নিজের সঙ্গে বেশ কটি বই নেয়। এসব কথা মনে রেখেও বলতে পারি, উনিশ শতকের সূচনায় অধিকাংশ বাঙালী মেয়েই ঘরকন্নার কাজেকর্মে ব্যস্ত, পুঁথিগত শিক্ষালাভের সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন কোনোটাই বিশেষ ছিল না। মনে রাখতে হবে, এসময় বিশেষ করে গ্রাম বাংলার জনসাধারণের এক বিরাট অংশই নিরক্ষর, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত। বাংলার অধিকাংশ পুরুষই যেখানে অক্ষর-জ্ঞানহীন, সেখানে গৃহলক্ষ্মী মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন কতখানি ওঠে তাও বিচার্য। কিন্তু আগেই আমরা বলেছি, এসময় বাঙালী সংস্কারকরা নারীকল্যাণেই নিবেদিত-প্রাণ, জনসাধারণের ব্যাপারে তাঁরা কম বেশি উদাসীন। আর তাই জনশিক্ষা নয়, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই তাঁরা উৎসাহী হয়ে উঠলেন। দেখা যাক, বাঙালীসমাজ একে কি চোখে দেখল।

ঘোর রক্ষণশীল, চক্ষু কর্ণ দুটি ডানায় ঢাকা সমাজপতির দল উনিশ শতকের সূচনাতেও লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা অথবা অসতী হবে, এই বিশ্বাস সমাজে চালু রাখতে কৃতসঙ্কল্প (বলা বাহুল্য, স্ত্রীশিক্ষার মতো শূদ্রের শিক্ষা-লাভেরও এরা ছিল বিরোধী)। যার ফলে মেয়েদের শিক্ষায় সমাজের আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া এই সময় গৌরীদান অতি পুণ্যকর্ম, দশ বছর বয়স না হতেই অধিকাংশ মেয়ে মাথায় সিঁদুর পরে শ্বশুরঘর করতে যেত। কাজেই শিক্ষালাভের সময়ও প্রায় ছিল না।

১১০ 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৪৯৯।
১১১ '*The Calcutta Review*', Vol. 11, 1849, P. XXVIII.

একই সময়ে আবার বাঙালীরা নিজেদের স্বার্থেই নতুন অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজি শিখতে লাগল, যার উল্লেখ প্রথম অধ্যায়ে করেছি। তখনকার দিনে অর্থকরী বিদ্যায় মেয়েদের প্রয়োজন ছিল না। অন্তত তাই ধরে নিয়ে, ইংরেজি শিক্ষা দেবার কথাও পরিবারের কর্তারা ভাবছিলেন না। যদিও এঁরা অন্তঃপুর শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। রাধাকান্ত দেব এই দলের প্রতিনিধিস্থানীয়।

রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল, তাঁর রক্ষণশীলতার নানাকথা আমরা বলে এসেছি। কিন্তু বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আদিপর্বে এই মানুষটির অবদান ভোলার নয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র অধীনস্থ কতকগুলি স্কুলে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়া হত। 'স্কুল সোসাইটি'র পণ্ডিত ও শিক্ষকরা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে এইসব মেয়েদের পরীক্ষা নিতেন। রাধাকান্ত এ বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহিত করতেন। শোভাবাজারের বাড়িতে 'স্কুল সোসাইটি'র ছাত্রদের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হত, তাতে 'ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটি'র পাঠশালার মেয়েরাও প্রথম প্রথম যোগদান করত। ১৮২৪ থেকে তাঁর বাড়িতে হিন্দু মেয়েরা আর পরীক্ষা দিতে যেত না। স্ত্রীশিক্ষার আদিপর্বে রাধাকান্তের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে ২৭. ৬. ১৮৩২-এর 'সমাচার দর্পণ' লেখে, 'তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যাশিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে।'[১১২] পরবর্তীকালে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানো সমর্থন না করলেও, নীতির দিক দিয়ে তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক

১১২ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪২৬। এই প্রসঙ্গে আরও দ্র. '*Native Female Education*', 'The Friend of India', July, 1823, P. 228.

সুখবৃদ্ধির জন্ম স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উনিশ শতকের প্রথমদিকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে 'প্রগতিশীল' রামমোহন যেখানে দু'চার কথা লিখেই[১১৩] কর্তব্য শেষ করেছেন, 'রক্ষণশীল' রাধাকান্ত সেখানে সক্রিয়ভাবে এ-বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেও কুন্ঠিত হন নি। বেথুন যথার্থ কারণেই আধুনিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক প্রথম হিন্দুর গৌরব রাধাকান্ত দেবকে দিয়েছেন।

উপরোক্ত দু'দল ছাড়া উনিশ শতকে বাঙালীসমাজে আরও একদল চেয়েছিলেন মেয়েদের সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিতে। শিক্ষার জন্যই শিক্ষা—এই মতবাদে বিশ্বাসী ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার গোঁড়া সমর্থক। ১৮২৮-এ প্রকাশিত 'পার্থেননে'র প্রথম সংখ্যায়, 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়েরারে'র পৃষ্ঠায় তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' ও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র[১১৪] অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা। ঈষৎ পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, অথবা বিভিন্ন স্ত্রীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সক্রিয় উৎসাহ তাঁদের মনোভাবের পরিচায়ক। অন্যতম ইয়ংবেঙ্গল শিবচন্দ্র দেব তাঁর বালিকা পত্নীকে বাংলা লিখতে পড়তে শেখান, বেথুন স্কুল খোলা হলে তিনি তাঁর মেয়েকে সেখানে ভর্তি করে দেন। প্যারীচাঁদ মিত্রও তাঁর বালিকা বধূকে বাংলা লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনেক ইংরেজিশিক্ষিত যুবক তাঁদের স্ত্রীকে ইংরেজি লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন। এরকম একজন যুবক, তাঁর স্ত্রী ইংরেজি শিক্ষিত হলে পর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপীয় সমাজে যাবার ইচ্ছার কথা 'সমাচার দর্পণে' একটি চিঠি লিখে জানান।[১১৫] এজন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' একটি পত্র প্রকাশ করে অশালীনভাবে তাঁকে আক্রমণ করে। হিন্দু কলেজের কোনো ছাত্র তাঁর স্ত্রীকে ৫নং পোয়েটিকাল রীডার পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন,

১১৩ রামমোহন তাঁর 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে' স্ত্রীলোককে 'বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ' থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্ম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

১১৪ প্যারীচাঁদ মিত্র 'বামাতোষিণী'র সপ্তম পরিচ্ছেদে 'সাধারণ জ্ঞান উপার্জিকা সভা'র যে কাল্পনিক বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে স্ত্রীশিক্ষাও আলোচিত হয়েছে দেখতে পাই। দ্র. 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৫৭২-৪।

১১৫ 'সমাচার দর্পণ', ৬৮৬ সংখ্যা, ৯. ৭. ১৮৩১, পৃ. ২২৭।

তাঁকে তিনি লিখতেও শিখিয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী এই তরুণটির অকালমৃত্যু তাঁর এ বিষয়ক প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেয়।[১১৬]

এরা ছাড়াও ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনরিরা। বাঙালী মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার স্বার্থেই তাঁরা চেয়েছিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হোক। উনিশ শতকের সূচনাতেই তাঁরা এ বিষয়ে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে ওঠেন। চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলে এ-বিষয়ে পথ দেখালেন মিঃ মে নামে একজন মিশনরি। কিন্তু ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর ফলে তাঁর এ বিষয়ক প্রয়াসে ছেদ পড়ে। অবশ্য ততদিনে অন্যান্য মিশনরিরা এ বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

১৮১৯, এপ্রিলে কলকাতার কয়েকজন ব্যাপ্টিস্ট মিশনরি স্ত্রীশিক্ষার একটি কর্মসূচীকে রূপায়নের জন্য সাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে কয়েকজন ইংরেজ মহিলা সহৃদয়ভাবে এগিয়ে আসেন। এই বছরই তাঁদের সহযোগিতায় রেভাঃ ডাবলিউ. এইচ. পীয়ার্সের সভাপতিত্বে 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (পুরো নাম The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools) স্থাপিত হয়। গৌরীবাড়িতে সোসাইটির প্রথম স্কুলটিতে প্রথম বছরের শেষে ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৮। প্রথমে কোনো দেশীয় শিক্ষিকা না পাওয়া গেলেও, ১৮২০-তে একজন দেশীয় শিক্ষিকা পাওয়া যায়। ছাত্রীসংখ্যাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। নন্দনবাগানের জুভেনাইল স্কুল ছাড়া, কলকাতায় এই সোসাইটির গৌরীবাড়ি, জানবাজার ও চিৎপুরের স্কুল তিনটিতে যাঁরা অর্থ সাহায্য করতেন, তাঁদের বাসস্থানের নামে স্কুল তিনটির নামকরণ (লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল, বার্মিংহাম স্কুল) করা হয়। ১৮২৩-এ সোসাইটির পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ৮। এই বছরেই 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' 'বেঙ্গল খ্রীশ্চান স্কুল সোসাইটি'র মহিলা বিভাগে পরিণত হয়। ১৮২৯-এ সোসাইটির স্কুলের সংখ্যা হয় ২০। ১৮৩২ সাল থেকে 'ক্যালকাটা ব্যাপ্টিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি' এই নতুন নামে সোসাইটির পরিচয় হয়।

বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে মিস মেরি আন কুক (১৮২৪ থেকে মিসেস উইলসন নামে পরিচিত) একটি স্মরণীয় নাম। ১৮২১-এ কলকাতায় এসে তিনি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে স্কুল সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হয়েও স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক

১১৬ '*The Calcutta Review*', Vol. 11. 1849, P. XXIX.

রাধাকান্ত দেব মিস কুকের শিক্ষার নাম করে বাঙালী মেয়েদের স্বধর্মচ্যুত করার প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। এজন্য ১০. ১২. ১৮২১-এ তিনি স্কুল সোসাইটির ডাবলিউ. এইচ. পিয়ার্সকে একটি চিঠিতে প্রকাশ্য মিশনরি স্কুলে মেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে আপত্তি জানিয়ে লেখেন, এর পরিবর্তে 'they [the respectable Hindoos] may be all convinced of the utility of getting their female children taught at home in Bengalee, by their domestic school masters, as some families do, before such female children are married or arrived at the age of 9 or 10 years at [farthest]. For these reasons, I am humbly of opinion that we need not have a Meeting to discuss on the subject of the Education of Hindoo females by [Miss] Cooke, who may render her services, if required, to the schools lately established by the Missionaries for the section of the poor [......] of native females.'[১১৭]

স্কুল সোসাইটির সহায়তা লাভে ব্যর্থ হলেও মিস কুক 'চার্চ মিশনরি সোসাইটি'র সহায়তায় ৮টি ছোট ছোট বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই আটটি স্কুল হল: ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, প্রতিবেশী স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণবাজার স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল ও কুমারটুলি স্কুল। শোভাবাজার স্কুল ছাড়া বাকি ৭টি স্কুলের মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৯৭।[১১৮] ১৮২৩-এ তাঁর পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ২২, ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০০। এ বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য সাহায্য লাভ করেন হেস্টিংস পত্নীর কাছ থেকে।

১৮২৪-এ চার্চ মিশনরি সোসাইটি 'লেডিস সোসাইটি' (Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity) গঠন করে তাদের হাতে স্কুলগুলির পরিচালনার ভার দিলেন। আমহার্স্ট পত্নী হলেন এই সোসাইটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ডেভিড হেয়ারও 'লেডিস সোসাইটি'কে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহ যোগাতেন। ১৮২৪-এই সোসাইটির ২৮টি স্কুলে ৪৮০টি মেয়ে ভর্তি হয়। অল্পদিনের মধ্যেই মিসেস উইলসনের ব্যবস্থাপনায় সোসাইটির ৩০টি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬০০। জুন, ১৮২৫-এ 'লেডিস সোসাইটি' সরকারের কাছে গৃহনির্মাণের জন্য ১০,০০০

---

১১৭ *Report of the Calcutta School Society (unpublished).*

১১৮ '*Hindoo Female Education*' (1839), **Priscilla Chapman, P. 79-80.**

টাকা সাহায্য চাইলেও, গবর্নর জেনারেলের আপত্তিতে তা নামঞ্জুর হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সাহায্যকল্পে এগিয়ে এলেন রাজা বৈদ্যনাথ। এই উদ্দেশ্যে লেডিস সোসাইটিকে তিনি কুড়িহাজার টাকা দান করেন। 'সমাচার দর্পণ' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেট' এজন্য তাঁকে উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দন জানায়। এই টাকা হেদুয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছিল। ১৮ মে, ১৮২৬ স্কুলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লেডি আমহার্স্ট। ১ এপ্রিল, ১৮২৮ মিঃ ও মিসেস উইলসন ৮৫টি বালিকাসহ সেণ্ট্রাল স্কুলের ভার গ্রহণ করেন।

দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কাজে চার্চ মিশনরি সোসাইটি, লেডিস সোসাইটি, লণ্ডন মিশনরি সোসাইটি উঠে পড়ে লেগেছেন। কলকাতার আশেপাশেও তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছল। (১৮২৩ থেকেই কেরী, ওয়ার্ড আর মার্শম্যানকে বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাইবেল প্রচারের জন্য শ্রীরামপুর ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে বেশ সক্রিয় দেখতে পাই। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'The Serampore Native Female Education Society' তারই ফল। অবশ্য যে কোনো কারণেই শ্রীরামপুর মিশনের এই প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।) মেয়েদের জন্য ডে স্কুল, বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারে গিয়ে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বাংলায় মিশনরি পরিচালিত ২৬টি ডে স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯০, ২৮টি বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রী-তালিকায় পাই ৮৩৬ জনকে।[১১৯] কিন্তু মিশনরিদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এই কর্মপ্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছিল?

এ কথার বিচারে নামার আগে মনে রাখতে হবে মিশনরিদের শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। শিক্ষার নাম করে তাঁরা চাইতেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে। ৬/৭ বছরের মেয়েকেও ধর্মান্তরিত করতে তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই কোনো দ্বিধা ছিল না। এইসব স্কুলে ধর্মশিক্ষার ওপর সবটুকু গুরুত্ব আরোপিত হত। গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ কথার উল্লেখ না করে পারেন নি: 'Now in the public schools....little has been done in educational, though much attempted in

১১৯ *'Dawn of Renascent India'* (2nd Ed, 1964), Dr. K. K. Datta, P. 96.

the catechising way.'[১২০] বাইবেল ছিল এইসব স্কুলে অবশ্যপাঠ্য, এই কারণে জনসাধারণও এইসব স্কুলকে প্রসন্নচোখে দেখত না। ধর্মশিক্ষার বাড়াবাড়ির জন্ম রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও মিশনরি স্কুল সম্পর্কে বিরূপ হয়ে ওঠেন। বাঙালীসমাজে মেয়েদের পর্দাপ্রথা তখনও উঠে যায় নি, ফলে ভদ্রঘরের মেয়েরাও প্রকাশ্য এইসব বিদ্যালয়ে পড়তে আসত না। তাহলে এসব স্কুলে কারা পড়তে আসত? আসত যারা দরিদ্র, সর্বহারা, বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজ ব্যবস্থায় যাদের স্থান পায়ের নীচে। অবশ্য তারাও কতখানি শিক্ষালাভের জন্য আসত, আর কতখানি অন্য প্রলোভনে (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'artificial encouragements') তা বলা মুশকিল। ২৪. ২. ১৮৩৮-এ চুঁচুড়ার জনৈক ব্রাহ্মণ 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদককে এক চিঠিতে লেখেন, 'কয়েকজন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবরা স্ত্রীলোকেদের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কয়েকজন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করেন কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।'[১২১] বৃহত্তর বাঙালীসমাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোনো ব্যাপক চেতনা জাগাতে মিশনরিরা ব্যর্থ হলেও তাঁদের প্রয়াসের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই আছে।

দেখতে পাচ্ছি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার চাইছেন, পত্রপত্রিকা সভাসমিতিতে তা নিয়ে আলোচনা চলছে; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার সভ্যরা এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। অন্য-দিকে একদল রক্ষণশীল মানুষও এর বিরুদ্ধে রীতিমতো সক্রিয়। এইরকম পরিবেশে ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে এদেশে এলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, অল্পদিনের মধ্যেই কার্যকুশলতায় তিনি অধিষ্ঠিত হলেন শিক্ষা পরিষদের সভাপতির পদে। এই বেথুন তাঁর প্রথম যৌবনে প্রিভি-কাউন্সিলে সতী আপীলে সতীপক্ষীয়দের সমর্থন জানানোর ত্রুটি সংশোধন করতেই যেন এদেশে এসে নারীকল্যাণে নিজেকে নিবেদন করলেন।

১২০ *'A Prize Essay on Native Female Education'* (1841), Rev. K. M. Banerjea, P. 105.

১২১ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৯ ॥

ভদ্রঘরের মেয়েদের কাছে শিক্ষায় দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে চাইলেন, এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে উদ্যোগী হলেন। মনের ইচ্ছা প্রথম প্রকাশ করলেন রামগোপাল ঘোষের কাছে। রামগোপাল শুধু মৌখিক উৎসাহ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, স্কুলের প্রথম ছাত্রী সংগ্রহের কাজও তিনি করলেন। নিজে থেকে এগিয়ে এলেন রামগোপাল ঘোষের এক বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দক্ষিণারঞ্জন বিনা ভাড়ায় তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাড়িটি ছেড়ে দিলেন। দশ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমিও তিনি এজন্য দান করলেন। শুধু ইয়ংবেঙ্গলই নয়, এগিয়ে এলেন মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের মতো ব্রাহ্মণপণ্ডিতও। তিনি তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা আর কুন্দমালাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন, বিনামূল্যে প্রাত্যহিক শিক্ষাদান ও স্ত্রীশিক্ষাপযোগী প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রচনায় নিজেকে নিয়োগ করলেন, 'সর্বশুভকরী'র পৃষ্ঠায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন।

স্থির হয়, এই স্কুলে কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদেরই ভর্তি করা হবে, শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা, অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কোনো মেয়েকে ইংরেজি শেখানো হবে না, সেলাই ও হাতের কাজ শেখানো হবে—শেখাবেন মিসেস রিডস্‌ডেল। শিক্ষা হবে অবৈতনিক, দূর থেকে যেসব মেয়েরা আসবে, তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে, স্কুল বসবে সকাল ৯টায়। অনেক ভেবে-চিন্তে বেথুন স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা রাধাকান্ত, আশুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের আমন্ত্রণ জানান নি, অন্যদিকে কোনো মিশনরিকেও তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান জানান নি, প্রথমে কোনো সরকারি সাহায্যের প্রার্থনাও তিনি করেন নি। প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ৭মে, ১৮৪৯ 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে'র যাত্রারম্ভ হয়। বাংলায় প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত এই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে'র প্রাঙ্গণ থেকে, ২১টি মেয়েকে নিয়ে তার যাত্রা শুরু। এই ২১ জনের মধ্যে গড়ে জনাদশেক মেয়ে উপস্থিত থাকত। রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, নীলকমল ব্যানার্জি, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমনাথ রায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরিনারায়ণ দে, দেবনারায়ণ দে, হরমোহন

চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও হরকুমার বসু[১২২] এঁদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠান।

বেথুনের উদ্যোগে স্কুল স্থাপিত হবার পর তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বালিকা বিদ্যালয়ে যাঁরা মেয়ে পাঠান, তাঁদের সমাজে একরকম একঘরে করা হয়। মেয়েদের নিয়ে স্কুলের গাড়ি যখন রাজপথে বার হত, তখন লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। অনেকে ছোট ছোট মেয়েদের উদ্দেশ্যে অভদ্র মন্তব্য ছুঁড়ে দিতেও ইতস্তত করত না। লোকে বলতে লাগল, "এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।" রামনারায়ণ রসিকতা করে বাবুদের মজলিসে বসে বলতে লাগলেন, "বাপরে বাপ মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে? এক "আন" শিখাইয়া রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"[১২৩] মদনমোহন তাঁর মেয়েদের স্কুলে দেওয়ায় ও নিজে এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় বামুন পণ্ডিতরা তো ক্ষেপেই আগুন! কোথাও পণ্ডিতে-পণ্ডিতে দেখা হলেই কথা হয়: 'ওরে মদনা করলে কি? ওরে মদনা করলে কি?'[১২৪] এজন্য ৮/৯ বছর তাঁকে সমাজচ্যুত থাকতে ও আজীবন সামাজিক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।[১২৫] গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত তাঁর মেয়ে আর ভাগ্নীকে স্কুলে পাঠানোয় যাদের সঙ্গে মেয়ে দুটির সম্বন্ধ হয়, তারা মেয়ে দু'টিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। সবদিক দিয়েই বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের চলার পথ মসৃণ ছিল না। ২৯. ৩. ১৮৫০-এ বেথুন গবর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে এক পত্রে নিজেই সেকথা লিখেছেন: 'Every Kind of annoyance and persecution was set on foot to deter my friends from continuing to support the school and with such success that at one time the number of enrolled pupils dwindled to 7, and on some occasion not

১২২ '*The Hindu Intelligencer*', 21. 5. 1849. 'বেঙ্গল হরকরা'র মতে নামের তালিকাটি ভ্রমশূন্য নয়।

১২৩ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৭২-৩।

১২৪ ইন্দ্রমিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগরে' শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২০১।

১২৫ 'কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্গ্রন্থ সমালোচনা' (কলকাতা, ১৯২৮ সংবৎ), পৃ. ২২।

more than 3/4 were present in the school. At this time the question was agitated whether or not I should offer stipends to the girls who attended, as was done on the first establishment of some of the Govt. College and I was assured that if I would offer 5 or 6 rupees a month to each, I might count on immediately recruiting the school to any extent that I might think desirable from Brahminical families of unquestioned caste and respectability'.[১২৬] সঙ্গত কারণেই এভাবে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করতে বেথুন আগ্রহী ছিলেন না। সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যে বেথুন তাঁর স্কুল চালু রাখেন। স্কুলের মাসিক ব্যয় বাবদ ৮০০ টাকাই তিনি নিজের পকেট থেকে দিতেন। প্রায় রোজই একবার না একবার তিনি স্কুলে গিয়ে তার কাজকর্ম দেখতেন। ছোট ছোট মেয়েদের সব আবদার অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করে, কখনও তাদের খেলার ঘোড়া হতেন, কখনও তাদের কোলে পিঠে করতেন। ভুবনমালা আর কুন্দমালা মদনমোহনের এই দুই মেয়েকে দু'কোলে নিয়ে তিনি প্রায়ই নিজের বাড়িতে যেতেন। বেথুনের আগ্রহে ও উৎসাহে এইভাবে আশা নিরাশার মধ্য দিয়ে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' এগিয়ে চলল। এই সময় স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান প্রতিপক্ষের মৃত্যুর ফলে স্কুলে আবার প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল, ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে হল ৩১। বেথুনের মনে তখনও চিন্তা, স্কুল কি কোনোদিনই নিজের পায়ে দাঁড়াবে না, তার নিজস্ব একটা বাড়িও কি হবে না ?

কাজ শুরু হল। বালিকা বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহের জন্য দক্ষিণারঞ্জন প্রদত্ত মির্জাপুরের জমির পাশাপাশি আর একখণ্ড জমি বেথুন দশহাজার টাকায় কিনে নিয়ে মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধার কথা চিন্তা করে, বাংলা সরকারের হেদুয়ার কাছের একখণ্ড জমির সঙ্গে ঐ জমি বদল করলেন। মতিলাল শীল হেদুয়ার পশ্চিমদিকে তাঁর ইজারা নেওয়া জমি বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার ক'মাস আগেই ছেড়ে দিলেন।[১২৭] ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

১২৬ '*Selections from Educational Records*' (Part II, 1840-59), J. A.- Richey (2nd Ed. 1965), P. 53.

১২৭ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১৬. ৯. ১৮৫০।

যেদিন স্কুলের শিলান্যাস হয় সেদিন রাত্রে দক্ষিণারঞ্জন এই উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে এক মহাভোজ দেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বেথুন বিদ্যাসাগরকে স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করলেন। স্কুলবাড়ি তৈরীর খরচ ৪০, ০০০ টাকার অধিকাংশও তিনি দেন। সেপ্টেম্বর, ১৮৫১ স্কুলের নিজস্ব ভবন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁর ছিল সবচেয়ে আগ্রহ, সেই অক্লান্তকর্মী মানুষটিই তা দেখে যেতে পারলেন না। কারণ এর আগেই ১২ই আগস্ট, ১৮৫১ বেথুনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুঃখের কথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগর পরে চোখের জল ফেলতেন। কিন্তু নিজে বর্তমান না থাকলেও, তিনি তাঁর উইলে কলকাতার ৩০,০০০ টাকার মতো সম্পত্তি স্কুলকে দান করে যান। বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রবর্তক বেথুন, কোনো স্বার্থের জন্য নয়, খ্রীষ্টধর্মপ্রচার বা শোষণযন্ত্র অব্যাহত রাখার জন্য নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসাই বেথুনকে প্রাণিত করেছিল স্ত্রীশিক্ষার কাজে সর্বস্ব পণ করতে। তাঁর উচ্চপদ, মান-সম্ভ্রম তাঁকে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সবমিলিয়ে এদেশে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে হেয়ারের যে ভূমিকা, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বেথুনের ভূমিকাও প্রায় অনুরূপ। আর বুকভরা ভালোবাসা না থাকলে একজন 'খাঁটি সাহেব' দেশীয় মেয়েদের সম্পর্কে কেন লিখতে যাবেন, 'The eagerness of the childern to learn, and their docility and quickness correspond fully with what we have seen of Bengali boys, and in the judgement of their intelligent teachers far surpass what is found among European girls of the same age.'[১২৮]

বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তবে লর্ড ডালহৌসী ও তাঁর স্ত্রী স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ায় তা টিঁকে রইল কোনোক্রমে। ডালহৌসী প্রদত্ত অর্থসাহায্যই তাকে টিঁকিয়ে রেখেছিল বলতে পারি। ইতিমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সরকারি মনোভাবও ধীরে ধীরে অনুকূল হয়ে উঠতে থাকে। যদিও এক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ ছিল ধীর, স্থির ও অতি সতর্ক। ১৮৫৪-এ উডের শিক্ষা বিষয়ক ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে একে অর্থসাহায্য করার অনুকূলে মত প্রকাশ করা হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠতে থাকে। ৬ই মার্চ, ১৮৫৬ ডালহৌসী

১২৮ '*Selections from Educational Records*' (Part II, 1840-59), J. A.- Richey (2nd Ed, 1965), P. 53.

ভারত ত্যাগ করেন। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী তাঁর ভারতত্যাগের পর সরকার বেথুন স্কুলের দায়িত্ব নেওয়ায় স্কুলের অনিশ্চিত অবস্থার কিছুটা অবসান ঘটল।

১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ সূত্রপাত।[১২৯] বেথুন স্কুলের দৃষ্টান্তে রাধাকান্ত দেব তাঁর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অন্যত্রও যশোর, সুখসাগর, নিবাধুই ইত্যাদি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ঈষৎ পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর ছোট লাট হ্যালিডের শুধুমাত্র মুখের কথার ওপর নির্ভর করে বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ ব্যাপারে কোনো সরকারি কাগজ কিংবা লিখিত আদেশ না থাকায় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সে ব্যাপারে অর্থসাহায্যের বিরোধিতা করতে থাকেন।[১৩০] ফলে আর্থিক দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। হ্যালিডে এজন্য বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে বললে, বিদ্যাসাগর তাতে অস্বীকৃত হন। অনেক লেখালেখির পর সরকার বিদ্যাসাগরকে আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্তি দিলেও, বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য স্থায়ী কোনো সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হন।

একদিকে যখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দু'একটি করে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠছে, অন্যদিকে তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সভাসমিতিতে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে জোর আলোচনা চলেছে। ২৫. ৭. ১৮৫৫-এ মানিকতলা স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত এক সভায় হরচন্দ্র দত্ত জোরালো ভাষায় স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, আমাদের নিজেদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালনের তাগিদে, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা এখনই উচিত। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এমন কথাও তাঁর মুখে শোনা যায়, 'The education of our females is a duty which we owe to ourselves, and more speedily it is fulfilled

১২৯ ১৮৪৭-এ বারাসাতে প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ মিত্র ইত্যাদির উদ্যোগে গৃহস্থ-পরিবারের মেয়েদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও অনেকের মতে বেথুন নাকি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক প্রেরণা পান বারাসতের স্কুলটি পরিদর্শন করতে গিয়ে।

১৩০ 'বিদ্যাসাগর' (১৩৭৬ সংস্করণ), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭১।

it is better'.[১৩১] দেখাই যাচ্ছে, এই পর্বে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে বাঙালীসমাজে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে ফল ?

অন্তত এই পর্বে (১৮২৬-৫৬) খুব যুগান্তকারী কিছু নয়। সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও বাঙালীসমাজে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল কোনো মনোভাব এসময়ে গড়ে ওঠে নি।[১৩২] কারণ একাধিক। প্রথমত লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে, বাঙালী সমাজমনের এই সংস্কার তখনও মুছে যায় নি। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা শিক্ষালাভের সময়ও বড় পেত না। এইরকম পরিবেশে উনিশ শতকের প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রয়াসকে জনগণ প্রসন্নমনে নেয় নি। অন্যদিকে বাঙালীসমাজে এসময় পর্দাপ্রথা এবং অন্তঃপুরশুচিতা বজায় থাকায় পাশ্চাত্য দেশের মতো এদেশের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ— স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক অনেক ব্যক্তিও সমর্থন করতে পারেন নি—যে কারণে রাধাকান্ত দেবের মতো স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াশোনাকে প্রীতির চোখে দেখেন নি।

আগেই বলেছি, বাংলায় প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু বেথুন বাঙালীসমাজে শক্তির আসল উৎসকেন্দ্রটি ধরতে পারেন নি। তাই অন্য রক্ষণশীল সমাজপতিদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থককেও রক্ষণশীল বলে তিনি দূরে সরিয়ে রাখলেন—এটা মর্যাদার প্রশ্ন—তাঁদের অপমান। তাই তাঁরা বেথুন স্কুলের সহায়তা তো করলেনই না—উল্টে বিরোধিতায় নামলেন। অথচ বাঙালীসমাজে এঁদের প্রভাব তখন সাংঘাতিক। এঁদের দ্বারস্থ না হয়ে বেথুন প্রধানত বুদ্ধিজীবি বাঙালী তরুণদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এঁদের আন্তরিকতায় কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ধরনের প্রভাব থাকলে কোনো সামাজিক পরিবর্তন আনা যায়, সে ধরনের প্রভাব বাঙালীসমাজে এঁদের ছিল না। ফলে প্রত্যাশিত সাফল্য যে আসে নি, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক ব্যর্থতাই চূড়ান্ত হয়ে ওঠে নি। স্ত্রীশিক্ষার পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ।

---

১৩১ '*An Address on Native Female Education*' (1856), Hurchunder Dutt, P. 8.

১৩২ গবর্নরের কাউন্সিলের সদস্য মেজর জেনারেল স্যার জে. এইচ. লিটলার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বেথুনের প্রস্তাবের বিরোধিতা প্রসঙ্গে ১৮৫০-এ মন্তব্য করেন, 'The scheme of Female Education is doubtless unpopular, and looked upon by the mass, with fear and dread, whether Hindu or Mahomedans'. '*Selections from Educational Records*' (Part II), J. A. Richey, P. 57.

৫. বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা (১৮২৬-৫৬)

বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—পলাশির যুদ্ধের পর মুসলমান নবাবের কাছ থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। বাংলার জনসাধারণের অসহনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার সূচনা যে সেইখান থেকেই, এ কথা রমেশচন্দ্র দত্তর মতো মডারেট ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন।[১] নতুন রাজশক্তি ক্ষমতায় এসে ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা করে বাংলার গ্রাম-সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের মর্মমূলে আঘাত করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এমন একটি নতুন অনুগ্রহপুষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল—যারা নিজেদের স্বার্থেই তৎপর হয়ে উঠল ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষায়। কোম্পানির একদল লোভী কর্মচারী বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করল, এদেশীয় সম্পদ অপহরণেই নিয়োজিত হল তাদের সমস্ত উদ্যম। এদেশ থেকে ইংলণ্ডে অর্থচালানের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলল। এরই পরিণতি হিসাবে দেখা দিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যাতে কমপক্ষে বাংলার এককোটি লোক প্রাণ হারায়, জীবিতরা মৃতদের খেতে আরম্ভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিবরণ অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষের সময় 'The streets were blocked up with promiscuous heaps of the dying and dead. Interment could not do its work quick enough; even the dogs and jackles, the public scavengers of the East, became unable to accomplish their revolting work, and the multitude of mangled and festering corpses at length threatened the existence of the citizens.'[২] ইংরেজ সরকার অবশ্য চুপ করে বসে না থেকে সাড়ম্বরে ত্রাণের কাজ শুরু করে অনাহারপীড়িত মৃত্যুমুখী ৩ কোটি লোকের জন্য ছ'মাসে নগদ ৪০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করেন।[৩] বাংলার এই চরম দুর্দিনেও

---

১ 'Indeed, the misery of the people...began not with the reign of the inhuman Surajudowla..., but with the transfer of these provinces to the English.'—'*The Peasantry of Bengal*' (1874), R. C. Dutt, P. 42.

২ '*The Annals of Rural Bengal*' (1868), W. W. Hunter, P. 27.

৩ ঐ, পৃ. ৩৭।

কোম্পানি তার শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য, ১৭৭০-১ সাল থেকে জমির খাজনা ১০% বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে।

শুধু তাই নয়, এরই সঙ্গে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংসসাধনে ইংরেজ তৎপর হয়ে উঠল। এদেশে প্রস্তুত জিনিসের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হল, অন্যদিকে ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা জিনিসের ওপর শুল্ক রইল না, বা রইল নামমাত্র।[৪] এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় শিল্প বিপর্যস্ত হল, দেশীয় শিল্প-নগরী ঢাকা, মুর্শিদাবাদ হয়ে দাঁড়াল অতীতস্মৃতি। ধ্বংস হল বাংলার কৃষক, প্রজা, কারিগর। তার ফলে পলাশির যুদ্ধের অল্পদিনের মধ্যেই শোষক ইংরেজের প্রতি জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত হল ঘৃণা। সারা বাংলায় ইংরেজের অখ্যাতি এমনই রটেছিল যে, একজন ইংরেজ কোনো গ্রামে এলে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যেত, জনসাধারণও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে বাঁচত। স্বয়ং ক্লাইভ কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে লেখা এক চিঠিতে কোম্পানির অনুগ্রহ-পুষ্ট ইউরোপীয় এজেন্ট, সাব এজেন্ট ও 'কালা এজেন্ট'দের অত্যাচারের কথা জানিয়ে তারা যে ইংরেজের নাম কলঙ্কিত করছে এই অভিমত প্রকাশ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসও দেশীয় লোকরা কোম্পানির সরকারকে যে অতিশয় অপ্রীতির চোখে দেখে, এই মত প্রকাশে বাধ্য হয়েছিলেন। কোম্পানির প্রতিটি পদস্থ কর্মচারী ছিল লোভী, অর্থলোলুপ।[৫] অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের রূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠায়, অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিল জনবিক্ষোভ ও জনবিদ্রোহ।

অন্যদিকে বাংলা যখন ভাঙছে, তার জনসাধারণ নিঃস্ব-রিক্ত, হাহাকারে আকাশ বাতাস পূর্ণ, তখনই পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলার পরিচয় হতে লাগল। ইংরেজি শিক্ষা মুষ্টিমেয় বাঙালীর সামনে পাশ্চাত্য চিন্তাজগতের যে বিরাট সম্পদ নিয়ে এল, তা তাঁদের এদেশীয় ধর্ম, সমাজ, এমনকি রাজনীতি সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে শেখাল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :

(ক) রক্ষণশীল বিভিন্ন জমিদার, ধনী ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী—এঁদের মধ্যে ঠিকভাবে 'রাজনৈতিক চেতনা' ছিল বললে ভুল হবে। কারণ যে ধরনের

৪ '*The Economic History of India*' (8th Impression), Romesh Dutt, P.112.

৫ '*The Economic History of Bengal*' (Vol. 1), N. K. Sinha, P. 222.

শিক্ষাদীক্ষা বা বৃত্তির অনুশীলন রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারে সাহায্য করে, তা এঁদের মধ্যে অনুপস্থিত, নিজেদের স্বার্থেই এঁরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তেন। এইসব ধনী ভূস্বামীরা ছিলেন কোম্পানি সরকারের একান্ত অনুগত ও তার প্রতি নির্ভরশীল। সে যুগের প্রখ্যাত ধনী গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, রামকৃষ্ণ মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুলচরণ দত্ত প্রভৃতিরা ২১. ৮. ১৭৯৮-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় ব্রিটিশ-রাজের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।[৬] কর্ণওয়ালিশ টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে নিরাপদে ফিরে এলে, প্রধান দেশীয় ব্যক্তিরা বাংলা ও পারসীতে তাঁকে মানপত্র দেন। নিজেদের স্বার্থেই এঁরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংসকে মানপত্র দেন।

(খ) মধ্যপন্থী রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা—এঁরা পরিচিত ছিলেন 'রিফর্মার' বা 'মডারেট রিফর্মার' নামে।

(গ) ইংরেজি শিক্ষিত নব্য তরুণদল—ইয়ংবেঙ্গল নামে সমধিক পরিচিত। 'আল্ট্রা লিবারাল' বা 'আল্ট্রা রাডিক্যাল' নামেও সেযুগে এঁদের বিশেষিত করা হত।

বিভিন্ন বিষয়ে এই তিন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য ছিল। ধর্মীয় বিষয়ে বা কোনো কোনো সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটাই ছিল বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, অন্তত একটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে মিল চোখে পড়ে। এই তিন গোষ্ঠীই জনসাধারণের সঙ্গে মানসিক সম্পর্কচ্যুত ছিলেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ব্যথা-বেদনার কথা জানলেও এঁরা তা দূর করতে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হন নি। কারণ এঁদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন, এঁরা সমাজে সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায়। বিভিন্ন জমিদার ও ব্যবসায়ী বা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অর্থকৌলীন্য (যা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ সংস্রবের ফল) একদিকে যেমন তাঁদের জুগিয়েছিল বিলাসের উপকরণ, অন্যদিকে করেছিল জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এঁদের মাধ্যমেই জনসাধারণকে শোষণ করত নতুন রাজশক্তি। অন্যদিকে ইয়ংবেঙ্গল অর্থকৌলীন্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীর সমকক্ষতা দাবি করতে না পারলেও তাঁদের কার্যকলাপ ছিল বহুলাংশে নগরকেন্দ্রিক, জনসাধারণের

৬ '*Selections from Calcutta Gazettes*' (Vol. III), W. S. Seton Karr, P. 525.

সুখ-দুঃখের শরিক হবার মানসপ্রবণতা তাঁদের ছিল না। তাঁদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা গোষ্ঠীস্বার্থ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তা সরকারি প্রসন্নতা লাভ করেই নমনীয় হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে সচেতন বাঙালীর ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের যুগ বলতে পারি। এই সময় কোনো মুসলমান চিন্তানায়ক জনজীবনে আবির্ভূত হন নি। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরা ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান অত্যাচার থেকে তাঁদের মুক্ত করে, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চিন্তাজগতে নিয়ে যাবার জন্য। এছাড়া ধনপ্রাণের কিছুটা নিরাপত্তা, ব্যবসাবাণিজ্য ও কর্মসূত্রে সম্পদ আহরণের সুযোগের জন্যও তাঁরা ছিলেন ইংরেজের একান্ত অনুগত। রামমোহন ও ইয়ংবেঙ্গল দু'তরফই এদেশে ইংরেজ আগমনের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ!

(২)

আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক যাঁকে বলা যায়, সেই রামমোহনের মুখ্য পরিচয় ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক হিসাবে। তিনি শিক্ষাসংস্কারেও সচেষ্ট ছিলেন। রাজনীতিতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন, এবং আমরা দেখতে পাই, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত।

রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করায়, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা হয়ে ওঠে অগতানুগতিক। দেশ-বিদেশের খবর তিনি রাখতেন, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে তাঁর কৌতূহল ছিল।—১৮২১-এ নেপলসের স্বাধীনতাচ্যুতিতে তাঁর দুঃখ; ১৮২২-এ স্পেনের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলির মুক্তির আনন্দে তাঁর গৃহের আলোকসজ্জা ও ৬০ জন ইউরোপীয়কে পানভোজনে আপ্যায়ন; ১৮৩০-এর দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তাঁর আনন্দ, বিলাত যাবার পথে কেপটাউনে দুটি জাহাজে স্বাধীনতাসূচক ফরাসী পতাকা দেখে অসুস্থ শরীরেও তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ আচরণ; কিংবা দ্বিতীয় রিফর্ম বিল পাশ না হলে ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের সংকল্প, এইসব কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি।

রামমোহন বেন্থাম, মন্টেস্কু প্রভৃতি রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মন্টেস্কুর প্রভাবে রামমোহন বিচার ও শাসন বিভাগের

ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও আইনের শাসনের (Rule of Law) পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর একাধিক লেখায় এ দু'টি বিষয়ের উল্লেখ পাই। বেন্থামের প্রভাবে আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখলেও, সব দেশের মানুষকেই একই আইন দ্বারা চালিত করা যায়—বেন্থামের এ মতবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না।[৭]

ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপর থাকাই তিনি মনে করেছিলেন বাঞ্ছনীয়। তবে কোম্পানির শাসনের বদলে পার্লামেন্টের সরাসরি কর্তৃত্ব ও শাসনের পক্ষপাতীও অবশ্য তিনি ছিলেন না। প্রশাসনিক কাজে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য 'কোর্ট অব ডিরেক্টর্স' ও 'বোর্ড অব কন্ট্রোলের' দ্বৈত অস্তিত্বের তিনি পক্ষপাতী। ভারত শাসনের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কোম্পানি সরকারের চেয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন।

এদেশে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তনে রামমোহনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যায় তিনি সরকারের কাছে মফস্বল কোর্টে জুরি-প্রথা প্রবর্তনের ও এদেশীয়দের জুরি করার জন্য আবেদন করেন। ৫মে, ১৮২৬-এ পার্লামেন্টে গৃহীত 'ইণ্ডিয়ান জুরি বিলে' খ্রীষ্টানদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হলে, তারও প্রতিবাদ করেন তিনি। শেষপর্যন্ত, তাঁরই চেষ্টায় ১৬ আগস্ট, ১৮৩২-এ এদেশীয় জুরিদের ওপর থেকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অপসারিত হয়, এবং এরপর থেকে ভারতীয়রা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে 'জাস্টিস অব পীস' এবং 'গ্রাণ্ড জুরি' হবার অধিকার লাভ করে। উল্লেখ্য, প্রথম ভারতীয় জুরিদের অন্যতম ছিলেন রামমোহন রায়।

মতপ্রকাশের ও সেইসূত্রে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় আজীবন বিশ্বাসী রামমোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর আরোপিত সরকারি বিধি-নিষেধের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই নিয়মকে অপ্রয়োজনীয় ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নিজের 'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করে দেন। শাসক এবং শাসিত উভয়ের স্বার্থেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা যে একান্ত আবশ্যক-একথা তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ইংলণ্ডের রাজার কাছে প্রেরিত আবেদনপত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর এই আবেদনপত্রটিতে প্রকাশিত। মুদ্রাযন্ত্রের

---

৭ '*History of Indian Social and Political Ideas*' (1967), **Bimanbehari Majumdar, P. 26-7.**

স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দিলে, কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় রামমোহনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রেই আমাদের কিছুটা বিভ্রান্ত করে। অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না, বৈষয়িক পুরুষ রামমোহন ও তাঁর অনুরাগীরা ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। যুগপৎ ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টিস্বার্থের দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বনেদী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশের কালে তাঁর জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তাঁর মনোভাবকে তাঁর আধুনিক অনুরাগীরাও 'আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল'[৮] না বলে পারেন নি। এদেশীয় জনগণের স্বার্থ বলতে তিনি প্রধানত জমিদার ও অভিজাত-শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের কথাই বুঝতেন। তাঁর এই শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছা একটি উক্তিতে স্পষ্ট। যদিও তিনি আইনের সমদৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন বলে শোনা যায়, তবু বনেদী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের সমপর্যায়ের তিন বা চারজন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি স্পেশাল কমিশনে বিচার করা সরকারের পক্ষে সঙ্গত বলে মতপ্রকাশে দ্বিধা করেন নি।[৯] রামমোহনপন্থীদের মুখপত্র 'দি বেঙ্গল হেরাল্ড' ১৮২৯-এ 'রাজা', 'নবাব' ইত্যাদি উপাধিধারী অভিজাত-সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি বিশেষ অধিকার দাবি করে। সমকালীন একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'দি ক্যালকাটা গেজেট এ্যণ্ড কমার্শিয়ল এডভার্টাইজর' তাঁদের এইসব বিশেষ অধিকার দাবির সমালোচনা করে লেখে, 'Aristocratic bodies are great evils ; because privileged men are always disposed to avail themselves of the privileges they possess, and to employ them to the disadvantage of individuals who have no such privileges.' এসব কথা লেখার পর পত্রিকাটি এই আশা প্রকাশ করে, 'Let the political rights and privileges of all men in a state be equal.···The law should be the same

৮ 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা', সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৪০।

৯ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮।

with respect to all; for honor and distinction need not be connected with exemption from certain political and judicial restraints.'[১০]

কর্মসূত্রে রামমোহন ছিলেন দেওয়ান, কাজেই প্রজাদের অবস্থা তিনি ভালোভাবেই জানতেন, অন্যদিকে জমিদার হিসাবে তিনি সরকারের মুখাপেক্ষী। ব্যক্তিজীবনে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী স্তরে ছিলেন বলেই হয়তো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল মধ্যপন্থী। যে কারণে তিনি প্রজাদের দুঃখ-দুরবস্থা, জমিদারি ব্যবস্থায় তাদের অসহনীয় দুর্গতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের খাজনা হ্রাসের প্রস্তাব করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের আয় হ্রাস পাবে, এই আশঙ্কায় তিনি জমিদারদের দেয় খাজনা হ্রাসেরও প্রস্তাব না করে পারেন নি। ব্যক্তিস্বার্থে এবং শ্রেণীস্বার্থে তিনি আপস করে পথ চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থেকেও, তিনি রায়তওয়ারি প্রথার চেয়ে জমিদারি প্রথাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব সমকালীন ইয়ংবেঙ্গলের কাছেও ফুটে উঠেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নীলচাষ এদেশে ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। নীলকরদের লোভ ক্রমেই সীমাহীন হয়ে ওঠে, এবং উনিশ শতকের সূচনাতেই তাদের অত্যাচার বাংলাদেশে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ১৮০৮-এ বুকানন হামিলটন চাষীদের ওপর নীলকরের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে লেখেন, একবার দাদন দিলে নীলকররা চাষীদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করে, টাকা শোধ দেবার সুযোগ দেয় না, জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করে, জমির ও ফসলের মাপে ঠকায়।[১১] খুন, জখম, নারী নির্যাতন সবকিছুই তারা করত। অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলে। নীলকরের অত্যাচারের কথা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হতে দেখি। নীলকরের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের কথা নিশ্চয় রামমোহনের অবিদিত ছিল না। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি ১৫ ডিসেম্বর, ১৮২৯-এ কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় রামমোহন নীলকরদের এক-আধটু অত্যাচারের কথা স্বীকার করে নিয়েও

১০ '*The Calcutta Gazette & Commercial Advertiser*', 18. 5. 1829.

১১ শ্রীবিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রে' (১ম) ৮ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখিত ভূমিকা, পৃ. নয়।

তাদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, তাদের মতো এদেশবাসীর উন্নতি অন্ত কোনো ইউরোপীয় করতে পারে নি! 'There may be some partial injury done by the indigo planters; but, on the whole, they have performed more good to the generality of the native of this country than any other class of Europeans, whether in or out of the service.'[১২] রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রভৃতি বাংলার নবোদিত ভূস্বামীরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই অত্যাচারী নীলকরদের প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছিলেন।

রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রে যে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় চালিত হয়েছে তা আমরা একাধিক উদাহরণের সাহায্যে দেখাতে চেষ্টা করেছি। এইসঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে আরো দুটি জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রথম, ইংরেজ চরিত্রে তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তি; এবং দ্বিতীয়, ইংরেজ শাসনের চেয়ে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসককে অত্যাচারী মনে করা।

ব্যক্তিজীবনে রামমোহন একাধিক ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন। ইংরেজ সিবিলিয়ানদের তিনি টাকা ধার দিতেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিও করেছিলেন কয়েকমাস, তাদেরই আনুকূল্যে লাভ করেছিলেন দেওয়ানী—যা তাঁর বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূল কারণ। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সর্বান্তঃকরণে ইংরেজ শাসনকে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ তাঁদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূল, নতুন জ্ঞানভাণ্ডারের উদ্গাতা, মুসলমান-অত্যাচার মুক্তকারী, নিশ্চিত জীবনযাপনের সহায়ক; এই সব কারণে তাঁদের মনে ছিল ইংরেজের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা, তাই ইংরেজ তাঁদের কাছে শুধু বিজয়ী বীর নয়, সে সাক্ষাৎ পরিত্রাতা। আর ইংলণ্ডেশ্বর শুধু শাসকমাত্র নন, তিনি একাধারে পিতা এবং রক্ষক![১৩] অবশ্য ব্রিটিশ অধিকারে মুষ্টিমেয়

১২ *'The English Works of Raja Rammohun Roy'* (The Panini Office, 1906), Speeches, P. 917.

১৩ 'Your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector.' *'Appeal to the King in Council'*, 'The English Works of Raja Rammohun Roy' (1906), P. 446.

কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশের অবস্থাই যে খারাপের দিকে গিয়েছিল, এবং বাংলার জনসাধারণও যে ইংরেজকে মোটেই প্রীতির চোখে দেখত না—তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। বাংলায় ইংরেজের অত্যাচার ছিল সীমাহীন। রামমোহন নিজেই একজায়গায় লিখেছেন, 'In Bengal where the English are the sole rulers, and where the mere name of Englishman is sufficient to frighten people.'[১৪] শুধুমাত্র যাদের নামোচ্চারণেই সাধারণ মানুষ ত্রস্ত হয়ে উঠত, বাংলায় সেই 'মহাপুরুষদের' আগমনেই রামমোহন মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করেছেন! অথ রামমোহন:

'I now conclude my Essay by offering up thanks to the Supreme Disposer of the events of this universe, for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former Rulers, and placed it under the government of the English,'[১৫] আর তাই ইংরেজ-শাসনের মধ্যে দিয়েই এদেশের উন্নতির স্বপ্ন, এবং স্বার্থরক্ষার চিন্তা তাঁকে প্রাণিত করেছিল ইংরেজের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আন্দোলনের নায়ক হতে। এর ফলে অন্তত ৯টি দিক দিয়ে ভারতীয়রা উপকৃত হবে, তুলনায় অসুবিধা নামমাত্র এবং সহজেই প্রতিকারযোগ্য, তা দেখাবার জন্য রামমোহন একটি পুস্তিকা লেখেন। এদেশে 'শ্বেত জমিদার' সৃষ্টির আন্দোলন 'ভারতপথিক' রামমোহনের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি। অবশ্য রামমোহনপন্থীরা বোঝাবার চেষ্টা করেন, আন্দোলনের অন্যতম কারণ এদেশ থেকে বিদেশে অর্থচালান বন্ধ করা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা 'অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্য' করা!

রামমোহন সর্বাবস্থায় ইংরেজ শাসনের সমর্থক বলে অন্যদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সহানুভূতির অভাব কখনও না ঘটলেও নিজের দেশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশের অধীনতা তাঁর কাছে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ! ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি প্রজাদের অটুট ও গভীর আস্থার কথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে একাধিকবার ঘোষণা করেন। এদেশে ব্রিটিশ শাসন চিরস্থায়ী করার জন্য তিনি প্রজাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাও ভেবেছিলেন। তাঁর মতে,

১৪ '*The Brahmunical Magazine*', Preface to the First Edition, 'The English Works of Raja Rammohun Roy', P. 145.

১৫ '*Final Appeal to the Christian Public*', Ibid, P. 874.

এর ফলে, তারা ব্রিটিশের এত অনুরক্ত হয়ে পড়বে যে সৈন্যবাহিনী রাখার বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকবে না।[১৬]

বলা হয়, মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যখন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিনা বিচারে আটক করার বিধি গৃহীত হয়, তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন বা অন্য কেউ প্রতিবাদ করেছিলেন শোনা যায় নি।[১৭] ব্যক্তিগত মালিকানায় অবশ্য তাঁর বিশ্বাস ছিল, পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ তিনি অন্যায় মনে করতেন।

রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকে আমরা বোধহয় এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি—যতখানি বিপ্লবী তাঁকে বলা হয়, ততখানি তিনি ছিলেন না।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র-মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এযুগের অন্যান্য রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রামমোহনের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁরা ব্যক্তিস্বার্থ ও সেই সূত্রে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে চলতেন। এইসব ব্যক্তিরা প্রধানত ব্যক্তি-স্বার্থে চালিত হতেন বলে এঁদেরই একজন—'মধ্যপন্থী' প্রসন্নকুমার, 'রক্ষণশীল' রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সঙ্গে একযোগে 'জমিদার সভা' স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজরা আমাদের সবকিছু অপহরণ করেছে—বিষাদের সঙ্গে যে দ্বারকানাথ একথা বলেছিলেন, তিনিই সাধারণ ভারতীয়ের মতো ইউরোপীয়রা মফস্বলের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন হবে একথা ভাবতেই পারেন নি। ইউরোপীয়দের সঙ্গে এহেন আন্দোলনে তিনি যোগও দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁরা শ্রেণীবিশেষের, অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষী ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মারে' জমিদারদের সম্পর্কে লেখা হয়, '...In fact the interest of this class appears to us the most important of any'.[১৮] মুখে প্রজাদের উন্নতির কথা বলতে অবশ্য তাঁরা

১৬ '*History of Indian Social and Political Ideas*', Dr. Bimanbehari Majumdar, P. 44.

১৭ 'The Political Framework', Dr. S. B. Chaudhuri, '*Renascent Bengal*', P. 8.

১৮ '*The Reformer*', 16. 6. 1833.

পেছপা হতেন না। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উন্নতির চিন্তা তাঁরা করতেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিত্তবান জমিদারদের স্বার্থই বিবেচিত হত দেশের স্বার্থ বলে। জমিদারদের স্বার্থবিরোধী কৃষকদের দাবি সম্পর্কে কোনো কথা বলা বিজাতীয়তার চিহ্ন হিসাবে গণ্য হত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্তের মতো বিশস্ত আই. সি. এস. এই মনোবৃত্তিকে ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন, 'It is an unfortunate fact,—and we write this in shame and sorrow,—that the welfare of the country is identified by our educated countrymen with the interests of the zemindars. Patriotism is another name for the advocacy of zemindars' rights and interests, and a word spoken in favor of the claims of the cultivators is regarded and branded as a certain sign of denationalization.'[১৯] এই মনোবৃত্তি শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম দশকে কতখানি প্রবল ছিল সহজেই অনুমেয়।

শুধু শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষাই নয়, বিচারহীন ইংরেজভক্তিও তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট। ১৮৩১-এ রামমোহন-অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' শিক্ষিত হিন্দুদের রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে সগর্বে বলে, 'If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other ? We would one and all reply, English by all means-ay even in preference to a Hindoo Government.'[২০]

(৩)

আধুনিক বাংলার স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবি ডিরোজিওর কাছে ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের স্বদেশ-সম্পর্কিত বোধ লাভ করেছিলেন। এই ডিরোজিও ছিলেন যুক্তিবাদী স্বার্থশূন্য পুরুষ এবং স্বাধীনতার পূজারী। ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতীকের মতো। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পাশেই ছিল ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীর কিছুটা স্বার্থশূন্য

১৯ 'The *Peasantry of Bengal*', R. C. Dutt, Preface—VII.

২০ '*Political Faith of Educated Hindoos*', reprinted from 'the Reformer', 'The India Gazette', 4. 7. 1831.

স্বদেশচিন্তা। চিন্তার ক্ষেত্রে অন্তত প্রথমজীবনে ইয়ংবেঙ্গল আপসহীন, ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, সমস্ত পাপ-অন্যায়-অবিচারের বিরোধী। ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের গুরুর কাছ থেকে যে তিনটি জিনিস পেয়েছিলেন—পাপের প্রতি ঘৃণা, যুক্তিবোধ এবং সত্যনিষ্ঠা, সেগুলি তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বর্তমান।

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণরা ছিলেন ছিন্নমূল। হিন্দুসমাজ তাঁদের প্রীতির চোখে দেখত না, ইউরোপীয় স্বার্থরক্ষী সমাজেও তাঁরা ছিলেন অপাংক্তেয়। বিশেষ কোনো স্বার্থবুদ্ধি এইসময় তাঁদের চালিত করে নি। ফলে, তাঁদের কাছে ইংরেজের আসল রূপ কিছুটা ধরা পড়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের স্বপ্নঘোর ছিল তাঁদের দু'চোখে, যদিও শিল্পবিপ্লবের গভীর তাৎপর্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে প্রকৃত স্বাধীনতা-এ বোধও তাঁদের ছিল না। পশ্চিম তাঁদের সামনে খুলে দিয়েছিল নতুন এক জ্ঞানভাণ্ডার, যার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ ছিলেন ইংরেজের কাছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। বেকন, হিউম আর টম পেন ছিলেন তাঁদের আদর্শ। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (১৮৩০) তাঁদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র ভারতে এই ধরনের বিপ্লবের কথা চিন্তা করায় শ্রীরামপুর-মিশনরিদের পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তীব্র ভাষায় তাঁদেরকে কটাক্ষ করে।

ইয়ংবেঙ্গলের রাজনীতি চর্চার হাতেখড়ি নিতান্ত তরুণ বয়সে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর নেতৃত্বে গঠিত 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে' অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও হত। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র বাইরে ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ মুখ্যত সাময়িক পত্রিকায়। ১৮৩০ থেকে ১৮৫৪-র মধ্যে তাঁদের পরিচালনায় কমপক্ষে সাতখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হল: (১) 'দি পার্থেনন', ১৮৩০; (২) 'দি হিন্দু পাওনিয়র', ১৮৩০; (৩) 'দি এনকোয়েরার', ১৮৩১; (৪) 'জ্ঞানান্বেষণ', ১৮৩১; (৫) 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১৮৪২; (৬) 'দি কুইল', ১৮৪৩; (৭) 'মাসিক পত্রিকা', ১৮৫৪। 'পার্থেননে'র প্রথম সেই সঙ্গে শেষ সংখ্যায় ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন ও গভর্নমেণ্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য—এই দুটি লেখা তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়বাহী। 'হিন্দু পাওনিয়ারে'

'Freedom', 'India under Foreigners' ইত্যাদি লেখা বেরোত। দ্বিতীয় লেখাটিতে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে স্বৈরাচারী ও তাদের রাজত্বে জনসাধারণের বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে বললেন, আইনসভায় জনগণের মতামতের কোনো মূল্য নেই, আইন প্রণয়নে তাদের কোনো হাত নেই। ব্রিটিশ রাজত্বে রাস্তাঘাট ব্রিজ হয়েছে সত্য, বাণিজ্য ও জ্ঞানও বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু তাতেই তো আর সব দোষ ঢাকা যায় না। সরকারে এদেশীয় জনগণের কোনো স্থান নেই, দায়িত্বপূর্ণ পদে তারা অন্ত্যজ, ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে দুঃখের।[২১] 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'এনকোয়েরার' মুখ্যত ছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রতিনিধি-নির্বাচন সমস্যা ও যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি সমর্থন করতে পারে নি। 'দি কুইল'-এর সম্পাদক ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের রাজনৈতিক নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে এতে 'রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম প্রবন্ধসকল বাহির হইত।' দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র পৃষ্ঠায় রাজনীতি অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখানে প্রতিফলিত হত।

ইয়ংবেঙ্গল উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তাঁদের চিন্তাধারা নিয়ে প্রধান হয়ে ওঠেন। ত্রিশের দশকে তাঁরা একই সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী। এই সময়কার জনসভাগুলিতে যখন আলোচ্য বিষয় ছিল—জুরিপ্রথা প্রবর্তন, চাকুরির ভারতীয়করণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৩ খ্রী. সনদের সংশোধন; বিদেশে কুলি চালানের প্রতিবাদ—তখন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীই ছিলেন পুরোভাগে। অগ্নি বর্ষিত হত 'একাডেমি'র সভায়, 'জ্ঞানান্বেষণ' আর 'এনকোয়েরার'-এর পাতায়। এঁদের রাজনৈতিক শিক্ষাগার ছিল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। এই আলোচনা সভার সদস্যরা নতুন দৃষ্টি নিয়ে মিলিত হতেন 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে। ১৮৩৫-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত চার্টার সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বলিষ্ঠ বক্তৃতা, বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা উপলক্ষে মেটকাফকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য আয়োজিত সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা (যাতে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কে

২১ '*India under Foreigners*', 'The Hindu Pioneer', October, 1835, reprinted in '19th Century Studies', No. 4, October 1973, P. 417—425,

-বেন্টিঙ্কের দ্বিধাগ্রস্ত নীতিকে তিনি নিছক ভণ্ডামি বলে অভিহিত করেন) ত্রিশের দশকে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে ইয়ংবেঙ্গল সমাজ থেকে রাজনীতিতে বেশি আগ্রহী। ডিরোজিওর মৃত্যু, সরকারী কর্মগ্রহণ, বয়োবৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে তাঁদের প্রথম যৌবনের উন্মাদনা হ্রাস পাওয়ায় ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রে তাঁরা আপসপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও এই সময় তাঁরা নিজেদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জর্জ টমসন দ্বারকানাথের সঙ্গে বিলাত থেকে এদেশে আসেন, তিনি তাঁর উদ্দীপক বক্তৃতায় ইয়ংবেঙ্গলকে মুগ্ধ করেন। ইয়ংবেঙ্গল রাতারাতি টমসন-ভক্তে পরিণত হন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর নামকরণ করেন 'হিন্দু টমসন'। এই টমসন ছিলেন জমিদারদের স্বার্থরক্ষী; তাঁর সঙ্গে 'ভূম্যধিকারী সভা'র ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কাজেই এইসময় ইয়ংবেঙ্গলের দৃষ্টিভঙ্গি যে কিছুটা জমিদারদের অনুকূল হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই 'ভূম্যধিকারী সভা'র প্রার্থনা মঞ্জুর করার অনুকূলে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এসময় কলম চালাতে দ্বিধা করে নি।[২২] 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র উত্তেজক রাজনৈতিক আলোচনা, দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র প্রকাশ, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে সক্রিয় অংশগ্রহণ, 'কালা আইন'-এর সমর্থনে রামগোপাল ঘোষের পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতি চল্লিশের দশকে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ইয়ংবেঙ্গল রাজনীতিতে প্রগতির সমর্থক বলে চিহ্নিত। তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ[২৩] এবং কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ। আগেই বলেছি, রামমোহনের দ্বিধাজড়িত মনোভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, রাজনীতি বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

২৪.৩.১৮২২-এ রামমোহনপন্থীদের 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকীয়তে উচ্চতর পদে ভারতীয় নিয়োগের দাবি জানানো হয়, অন্যত্রও রামমোহন একাধিকবার

২২ 'ভূম্যধিকারী সভা', 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ৮.৫.১৮৪৩, পৃ. ১৩৫-৬।

২৩ 'এনকোয়েরার'-এ একটি লেখায় সকলের উপকারার্থে রাজনীতিকে ধর্মীয় সংস্রবমুক্ত করার কথা বলা হয়। দ্র. '*Prospects of Hindu Improvement*', reprinte from the 'Enquirer', 'The India Gazette', 4.2.1832.

এর পক্ষে বলেন। রামমোহনের মতো ইয়ংবেঙ্গলও ভারতীয়দের উচ্চ পদাধিকারের জন্য আন্দোলন করেন ও নিজেরা তার ফলভোগ করেন।

ইয়ংবেঙ্গলের রাজনৈতিক নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহনের সঙ্গে কমবেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁরই প্রভাবে revolutionary doctrines of 'natural right' ও 'equality'-তে বিশ্বাস করতেন।[২৪]

রামমোহনের মতো ইয়ংবেঙ্গলের কয়েকজন স্বদেশ পরিত্যাগ করে ইংরেজের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন, 'পার্থেনন'-এর প্রথম সংখ্যায় এর সমর্থন করা হয়। অবশ্য ইয়ংবেঙ্গলের কেউ কেউ তীব্রভাবে এর বিরোধিতাও করেন। ১২.২.১৮৩০-এ 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত 'On the Colonization of India' প্রবন্ধে কলোনাইজেশনের কুফলগুলি আলোচনা করে ভারতবর্ষে ইংরেজদের বসতি স্থাপন প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। প্রবন্ধটির রচয়িতা 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে যুক্ত হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র।[২৫]

রামমোহনের মতো ইয়ংবেঙ্গলও একাধিকবার জমিদারের অত্যাচারের ফলে কৃষকের দুরবস্থার কথা বলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র একাধিক সংখ্যায় জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণিত হয়েছে। গভর্নমেণ্ট প্রজাদের 'এতাদৃশ দুঃখ দেখিয়া যদি তন্নিবারণের উপায় না করেন তবে আমরা তাঁহাদিগকে দোষী করিতে পারি'[২৬]—এমন কথাও পত্রিকাটি লেখে। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রজাদের দুরবস্থার অন্যান্য কারণের সঙ্গে জমিদার অথবা তার প্রতিনিধির অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। রায়তদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উন্নতি হবে—একথাও তিনি বলেন। তাঁর ভাষায়, 'Promote their well being, and the well being of the country is promoted.'[২৭] প্রজাস্বার্থের পক্ষে দু'একটি লেখায় এ ধরনের দু'চার কথা লেখার বেশি অবশ্য ইয়ংবেঙ্গল কিছু করেন নি।

২৪ '*History of Indian Social and Political Ideas*', Dr. Bimanbehari Mazumdar, P. 50.

২৫ ঐ, পৃ. ৫৪-৫।

২৬ 'রাইয়ত', দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১.১১.১৮৪৩, পৃ. ৩২১।

২৭ '*The Zemindar and the Ryot*', 'The Calcutta Review,' Vol. VI, No. XII, 1846, P. 333.

ইংরেজের প্রতি ইয়ংবেঙ্গলের মনোভাব ছিল একই সঙ্গে স্বার্থজড়িত এবং কিছুটা সমালোচনাত্মক। রামমোহনের মতো তাঁরাও পূর্ববর্তী মুসলমান শাসককে নৃশংস অত্যাচারী মনে করে, ইংরেজ কর্তৃক সেই অত্যাচার মুক্ত হবার মধ্যে ভগবানের কল্যাণস্পর্শ লক্ষ্য করেছেন। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারা পুষ্ট হোক এই ছিল তাঁদের কামনা।[২৮] রামমোহনের মতো এদেশে ব্রিটিশ-আগমন তাঁদের কাছেও বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ। 'এনকোয়েরার' লিখেছিল, 'If ever any conquest proved a blessing to the conqured, it was the empire of Great Britain in India.···The kind and wise dispensations of God must be acknowledged by the improved Hindoo in timely sending a civilized, and in every respect a clever people to give light where there was darkness, to elevate what was low, to improve what was mean, and to reform what was corrupt'.[২৯] ব্রিটিশ শাসনকে তাঁরা সর্বদাই স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ শ্রেণী হিসাবে তাঁরা যে ক্রমেই ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছিলেন—এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু তাই বলে কি ইয়ংবেঙ্গল ইংরেজের অন্ধ ভক্তে পরিণত হন? জীবিকার প্রয়োজনে সরকারি চাকরি গ্রহণ করলেও তাঁরা সমালোচনার সুরকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি। কারণ চাকুরি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ইংরেজের কাছ থেকে আরো উদারতা তাঁরা আশা করেছিলেন। সে আশা ভঙ্গ হওয়ায়, তাঁরা নিঃসন্দেহে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই ক্ষোভ ভাষা পায় ১৮৩৫-এ টাউন হলের সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কোম্পানিকে প্রদত্ত নতুন সনদের সত্যকার রূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্যে। রসিককৃষ্ণ বলেন, 'এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশ স্বার্থ। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি। কোম্পানির অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কর্তাদের মনে স্থান পায় নি।' এই নতুন সনদের ধারাগুলি সে কতখানি

২৮ '*British Empire in India*', reprinted from the 'Enquirer', 'The India Gazette', 10.2.1832. ও 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', জুন, ১৮৪২।

২৯ '*British Empire in India*', reprinted from the 'Enquirer', 'The India Gazette', 10. 2. 1832.

অমানবিক ও অবাস্তব তা ব্যাখ্যা করে, তিনি সেই ধারাগুলিকে 'কুৎসিত' বলে অভিহিত করেন। প্রসঙ্গত 'এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজদের নাম ও শক্তিকে মসীলিপ্ত করেছে' তাও বলতে দ্বিধা করেন না।[৩০] অবশ্য নিজেদের গোষ্ঠী-ভুক্ত পত্রিকায় ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলার পর, এবং 'জ্ঞানান্বেষণে 'সুশাসক' বেণ্টিংকের রাজত্বে বাস করতে পারার জন্য তাঁর জয়ধ্বনি করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পর, ইংরেজের স্বার্থে আইন করা হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলে তার মূল্য কতখানি থাকে সন্দেহ।

এই আপাত ক্ষোভই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক ঘটনায় প্রকাশ পায়। ৮. ২. ১৮৪৩-এ সংস্কৃত কলেজ হলে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'The Present State of the East India Company's Criminal Judicature, and police under the Bengal Presidency'-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি মফস্বল কোর্টে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ করেন। তাঁর ভাষায় 'it was a system of bribery and corruption throughout, and must remain so unless the natives, to whom justice was so dear, undertook the work of exposure and reformation.'[৩১] সরকারি উচ্চপদ ভারতীয়দের দেবার কথা কাগজেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। প্রবন্ধ পাঠের সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্টেন রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধ শুনে উত্তেজিত হয়ে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, কলেজ হলকে বিদ্রোহীদের আখড়ায় পরিণত হতে তিনি দেবেন না। প্রবন্ধপাঠের সময় অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের এই অশোভন আচরণের প্রতিবাদ জানান তারাচাঁদ চক্রবর্তী। অন্যান্য সভ্যেরা অধ্যক্ষের আচরণে অপমানিত বোধ করে কলেজ হল ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর 'ইংলিশম্যান' ইয়ংবেঙ্গলের নতুন নামকরণ করে 'চক্রবর্তী চক্র'। দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধটিতে হৈ হৈ করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি যে ব্রিটিশ শাসনের শত্রু নন—রিচার্ডসনের মন্তব্যের উত্তরে দক্ষিণারঞ্জন তা জানাতে দ্বিধা করেন নি। তিনি যে রাজদ্রোহী নন—সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রমাণ করার জন্য

৩০ রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সমগ্র ভাষণটির বঙ্গানুবাদের জন্য দ্র. 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৩৪-৭।

৩১ '*Baboo Dukina Mookerjee's Speech,*' reprinted from the 'Bengal Hurkaru', 'The Friend of India', 16. 2. 1843, P. 103.

তিনি ঐ প্রবন্ধটি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩২] এসব সত্ত্বেও 'ইংলিশম্যান,' 'ক্যালকাটা স্টার', ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধটি নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ শুরু করে দেয়। বক্তৃতাটি সম্পর্কে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখে, 'It was filled with the most unqualified abuse of the Govt of India and its institutions, and was calculated, though it may have been designed, to sow the seeds of dissatisfaction towards the British administration in the minds of the youths who surrounded him. It was loudly and repeatedly applauded by the auditory, more especially in those passages which denounced the public authorities with particular acrimony.'[৩৩] যে কোনো স্থানেই এ ধরনের বক্তৃতার প্রতি পুরোপুরি উদাসীন থাকাই উচিত বলে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মত প্রকাশ করলেও, ব্রিটিশ-ভারত ছাড়া অন্যত্র এ ধরনের বক্তৃতার পরিণাম যে সুখপ্রদ হত না—তাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলে নি।[৩৪]

দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধটি নিয়ে বাজার যখন গরম, সেই সময়ই (১৮৪৩) 'An Old Hindoo' স্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি 'বেঙ্গল হরকরা'য় 'Grivances of India' নামে একটি নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এতে প্রসঙ্গক্রমে ব্রিটিশ রাজত্বে লোকের অবস্থা মুসলমান আমলের চেয়েও খারাপ হয়েছে, জনসাধারণ দাসের পর্যায়ে নেমে এসেছে, নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ একের পর এক নির্যাতনমূলক আইন পাশ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়।[৩৫] এই 'Old Hindoo' কে, তা আমরা জানি না—তবে ইনি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত কেউ অনুমান করতে বাধা নেই। দক্ষিণারঞ্জনের লেখাটির সঙ্গে এই লেখাটিও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সম্পাদককে বিচলিত করে তোলে। তবে এইসব লেখার মূল উদ্দেশ্য যে ব্রিটিশ বিরোধিতা নয়, নিজেদের ক্ষোভকে ভাষা দেওয়া—তা আমরা আগেই বলেছি। আমাদের এই ধারণা আরো দৃঢ় হয় এই সময় রাজভক্তির টীকা কপালে নিয়ে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠায়। বহু আলোচিত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর একজন উৎসাহী সদস্য। এই

৩২ 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর,' ৮. ৩. ১৮৪৩, পৃ. ৭৪।

৩৩ '*The meeting at the Hindoo College*', 'The Friend of India, 16. 2. 1843, P. 99.

৩৪ '*Public Grivances*', Ibid. P. 98.

৩৫ '*The Old Hindoo versus the Friend of India*', Ibid, 16. 3. 1843, P. 162.

সময়কালে ইয়ংবেঙ্গলের রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলি প্রসঙ্গে ঈষৎ পরবর্তীকালের 'সমাচার দর্পণে'র মন্তব্যটি উপভোগ্য: 'তাঁহারা দেশহিতৈষী অভিমানে আপনারা যে সকল বক্তৃতা করিতে লাগিলেন তাহাতে মুসলমানের রাজ্য সময় হইলে তাঁহাদের কাণ কাটা যাইত।'[৩৬]

আগেই বলেছি, এযুগ ইংরেজের প্রতি মধ্যবিত্তের বিশ্বাসের এবং সেইসূত্রে কৃতজ্ঞতার যুগ। এ যুগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন গভীরভাবে কেউ দেখেন নি। ভারতের জন্য দুঃখবোধ, এবং ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা—এ দুই-ই ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে লক্ষ্যগোচর। তবে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি ছিল অনেকক্ষেত্রে কিছুটা সমালোচনাত্মক। ইংরেজের এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পরিবর্তে তার সহায়তায় শক্তিমান হওয়ার কামনাই এই যুগে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তায় ও আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইংরেজের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই বিশ্বাস বেশ কিছুটা আহত হয় কালাকানুন সম্পর্কিত ঘটনায়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেব মফস্বলের ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য চারটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইউরোপীয়রা তাদের বিশেষ সুবিধা বিলোপের আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে এর নাম দেয় 'কালা কানুন' (Black Act)। রাধাকান্ত দেব প্রস্তাবিত এই আইনকে সমর্থন করে একে 'সাদা কানুন' (White Act) নামে অভিহিত করেন। প্রস্তাবিত বিলটিকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম প্রতিনিধি রামগোপাল ঘোষ। ব্যবসাসূত্রে ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে একাধিক ইংরেজের ঘনিষ্ঠতা ছিল; তা সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের অত্যাচারের কথা অকপটে বলতে ও আইনের চোখে সমদৃষ্টি চাইতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। এ ব্যাপারে রামমোহন-অনুরাগী দ্বারকানাথ কিছুদিন আগে কি ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আমরা বলে এসেছি। রামগোপালের প্রতিবাদে কাজ অবশ্য বিশেষ কিছু হয় নি। কারণ ইউরোপীয়দের প্রবল বিক্ষোভে বিলটি খসড়া অবস্থায় রয়ে যায়। তবু, রামগোপালের এই ভূমিকা, ২০. ৫. ১৮৩৬-এ 'ইংলিশম্যানে' একজন 'হিন্দু সংবাদদাতা' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'radical' আখ্যা যে বৃথাই দেন নি, তাই যেন নতুন করে প্রমাণ করল।

৩৬ 'শ্রীযুত জর্জ তামসন সাহেব', 'সমাচার দর্পণ', ৩০. ৮. ১৮৪১, পৃ. ১৩৯।

রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালীরা নিজেদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা গঠন করে সংগঠিত হতে থাকেন। এইসব রাজনৈতিক সভাগুলিতে জনসাধারণের কোনো স্থান ছিল না, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীই সেগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার জন্য' কালীনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, মুন্সী আমীর প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এতে যোগ দেন। ধর্ম বিষয়ের বিচার-আলোচনা এখানে নিষিদ্ধ ছিল। নাম যাই হোক না কেন, সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল 'যে সব রাজকার্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা।' 'নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের' আলোচনা এখানে হত। সভার সভ্যদের মধ্যে একতা ছিল না। 'ব্রহ্মসভা' ও 'ধর্মসভা'র সভ্যদের দলাদলির জন্য এ সভা দীর্ঘস্থায়ী হতে না পারায়, এর প্রভাবও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে নি।

এর অল্পদিনের মধ্যেই এই কালের প্রধান দুটি রাজনৈতিক সভা (ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটির একটি বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছা তার নামেই স্বপ্রকাশ। সেইজন্য কেউ কেউ এটিকে রাজনৈতিক সভার মর্যাদা দিতে চান না।[৩৭] ১২ নভেম্বর, ১৮৩৭ জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে 'ভূম্যধিকারী সভা'র প্রতিষ্ঠা। এই সভা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য 'ইংলণ্ডাধিকারের প্রথমাবস্থায় এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারিরদিগের' যেরকম মান, ক্ষমতা ও অবস্থা ছিল তা ক্রমশ লোপের প্রতিকারার্থে ভূম্যধিকারীদের সংগঠিত করা। কারণ 'যদি ভূম্যধিকারিরা

---

৩৭ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৪১-২। অবশ্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একে 'the first organisation of Bengal, with a distinct Political Object' বলেছেন। 'ভূম্যধিকারী সভা'র এক অধিবেশনে ডিকিনস বলেন, 'ভারতবর্ষে রাজনীতি বিষয়ক সাধারণ বিষয়ক সাধারণ উপকারার্থ প্রথম সভা এই যাহাতে কোন বর্ণ জাতি প্রভেদ করা নাই... এই সভা উত্তমোত্তম বিষয়ের অঙ্কুর স্বরূপ।' দ্র. 'ভূমাধিকারি সভার বৃত্তান্ত' (১ম ভাগ, ১২৪৫ সাল), পৃ. ১৭।

একত্র ঐক্য একপরামর্শ হইয়া আপন আপন মান, পদ, বিষয় ইত্যাদি রক্ষার্থে চেষ্টা করেন, তবে দেশের সাধারণ উপকার হইতে পারে।'[৩৮] অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ওপর 'দেশের সাধারণ উপকার' নির্ভরশীল বলে তাঁরা মনে করতেন। সভার প্রথম অভিপ্রায় ছিল 'ভূম্যধিকারিবর্গের সাধারণ উপকার বৃদ্ধি করণ।' এখানে প্রত্যেক সভ্যকে প্রবেশমূল্য হিসাবে ৫ টাকা ও বার্ষিক ২০ টাকা চাঁদা দিতে হত। এপ্রিল, ১৮৩৮ থেকে সভাটির পরিবর্তিত নাম হয় 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি'। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এর সম্পাদক, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, মথুরানাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামকমল সেন প্রভৃতি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কয়েকজন ইউরোপীয় ও মুসলমানও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পর্বের রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের সমস্বার্থবোধের রূপ দেখা যায় রামমোহন-ভক্ত প্রসন্নকুমার ও 'রক্ষণশীল' রাধাকান্তের হাতে হাত মেলানোর মধ্যে।

ইতিমধ্যে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডামের উদ্যোগে ভারতবাসীর কল্যাণ ও ভারত সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ইংলণ্ডে একটি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই বছরের ৩০ নভেম্বর, 'জমিদার সভা' 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিলাতে তাদের হয়ে আন্দোলন চালানোর ভার ঐ সোসাইটির হাতে দেয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে এডামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এডভোকেট'। জর্জ টমসনের কলকাতা আসার অল্পদিনের মধ্যেই ১৭ জুলাই, ১৮৪৩ 'জমিদার সভা'য় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে বিলাতে তিনি তাঁদের এজেণ্ট নিযুক্ত হন।

আগেই বলেছি, দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে ফেরার সময় জর্জ টমসনকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর বাক্চাতুর্যে ইয়ংবেঙ্গলকে মুগ্ধ করেন। এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ও ইয়ংবেঙ্গলের আগ্রহে ২০ এপ্রিল, ১৮৪৩-এ 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হলে 'ভূম্যধিকারী সভা'র আবশ্যকতা থাকবে কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাঁদের সন্দেহ নিরসন করে টমসন বলেন, 'ভূম্যধিকারি সভার চলিত কার্য্য

৩৮ 'ভূম্যধিকারি সভার হেতুবাদ', 'ভূম্যধিকারি সভার বৃত্তান্ত' (১ম ভাগ)।

রোধ হয় অথবা তদ্বিরুদ্ধে অন্য একটা সভা স্থাপন হয় এমত আমার বাসনা নয় ··ভূম্যধিকারি সভা ও প্রস্তাবিত সভা পরস্পর প্রতিকূল হইবেক না বরঞ্চ অন্যান্যের আনুকূল্য হইতে পারিবেক।'[৩৯] প্রস্তাবিত সভার চরিত্রের আভাস টমসনের কথাতেই মেলে। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য 'ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বের চিরস্থায়িত্বে' সাহায্য করা এবং 'রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করা।' জর্জ টমসন হলেন সভাটির সভাপতি। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ব্রজনাথ ধর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন, সাতকড়ি দত্ত, মিঃ স্পিড, মিঃ রামক্রে, মিঃ ক্রো প্রভৃতিরা হলেন সভার কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য। সাড়ম্বরে সভার কাজ আরম্ভ হলেও, সভাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রথম বছর থেকেই এটির মধ্যে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায়। প্রত্যেক সভায় সভ্যদের উপস্থিতির সংখ্যা কমতে থাকে। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩-এর সভায় ১০ জন মাত্র সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভা শোষক ও শোষিতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে চেয়েছিল। উচ্চপদ-সমূহের ভারতীয়করণের ওপর সভা জোর দেওয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়। সভার চেষ্টায় রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কিছু সংস্কারও সাধিত হয়। দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতিরা এই সভায় যোগ দেন নি। না দিলেও, 'ভূম্যধিকারি সভা'র সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য ছিল সামান্যই। জর্জ টমসন দুটি সভার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে-ছিলেন। অনেকে একইসঙ্গে দুটি সভারই সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অনেক সময়ই. দুটি সভার মতৈক্য ঘটত। অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই সভার সদস্যরা একত্রিত হলেন একটি নতুন রাজনৈতিক সভায় —'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে।' আর তাঁদের এই মিলনকে ত্বরান্বিত করল কালা কানুন সম্পর্কিত আন্দোলন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেবের প্রস্তাবিত 'কালা কানুন'কে সমর্থন জানিয়ে রামগোপাল ঘোষ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলে ইউরোপীয়রা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারিত

---

৩৯ 'মেস্টর জর্জ টমসন, এতদ্দেশীয়জনগণ, এবং ভারতবর্ষের অবস্থা শোধনার্থক সভার প্রস্তাব', 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৪৩, পৃ. ৫২।

করে। ভারতীয়দের এই অপমান, এই বেদনাই ভাষা পেতে চাইল ২৯ অক্টোবর, ১৮৫১-তে স্থাপিত 'ভারতবর্ষীয় সভা'য়। এটি যে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫১-তে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্থাপিত 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে'র নবরূপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'সমাচার দর্পণ' 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন'-এর পরিচয়দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করে 'পূর্ব ২ সপ্তাহে আমরা দুই একবার যে নাশুনাল এসোসিয়েশনের অর্থাৎ দেশোপকারক সভার বিষয়ে লিখিয়াছি বোধ হয় তাহাই এই সভা।'[৪০] এই 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে'র উদ্দেশ্যের মধ্যে রাজভক্তির বিশেষ করে কোনো উল্লেখ না থাকলেও, এর সভ্যদের রাজভক্তি সন্দেহাতীত। সভাপতি দেবেন্দ্রনাথের রাজভক্তি অন্তত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। সভা 'legitimate means'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তবু, পাছে ইংরেজ তাঁদের রাজভক্তি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে, এই আশঙ্কায় অনেক রক্ষণশীল ধনী ব্যক্তি 'ন্যাশনাল' নামটি দেখেই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন' নামে যাই হোক না কেন, আসলে ছিল ধনী জমিদারদের স্বার্থরক্ষী। 'দেশের মঙ্গল' ছিল সভার লক্ষ্য, আর দেশ তো তখন জমিদারদের।[৪১] তাই এইসব ধনী জমিদারদের মান রাখতে সভার নতুন নামকরণ হল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।'

এই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ-ভারতের স্বার্থরক্ষা। এখানে মিলিত হলেন রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী ও একদা উগ্রপন্থী ইয়ংবেঙ্গল। সভাপতি হলেন রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা ছাড়া কালীকৃষ্ণ দেব, দিগম্বর মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামনাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিরা ছিলেন সভার কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য। কালা কানুন সম্পর্কিত ঘটনায় ভারতীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ইউরোপীয়রা কেউ এর সভ্য হয় নি। এই সভা বাহ্যিকভাবে সকলের জন্য হলেও সাধারণ মানুষ এই সভা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী ছিল না। কেউ সাধারণ সভ্য হতে চাইলেও তাকে বার্ষিক চাঁদা হিসাবে অন্তত ৫০ টাকা অগ্রিম দিতে হত।[৪২] নিম্ন ও মধ্যবিত্ত

৪০ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন', 'সমাচার দর্পণ', ২২. ১১. ১৮৫১।

৪১ 'দেশ হিতার্থি সভা', 'সমাচার দর্পণ', ১৩. ১২. ১৮৫১।

৪২ *'The Indian Political Associations and Reform of Legislature' (1818-1917)* (1965), Dr. Bimanbehari Majumdar, P. 86.

জনসাধারণের পক্ষে তা সম্ভব না হওয়ায়, তারা এটিকে নিয়ে মাথাও ঘামাত না। অবশ্য এই কালে 'সাধারণ' মানুষ সচেতন রাজনীতিতে অংশ নেয় নি। মোটামুটিভাবে অভিজাতরাই ছিলেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সর্বে-সর্বা। এইসব বিত্তকুলীন ব্যক্তিরা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জি. জে. গর্ডনকে বার্ষিক ১০,০০০ বেতনে লণ্ডনে তাঁদের এজেন্ট নিযুক্ত করেন।[৪৩] তাঁর পেছনে এসোসিয়েশন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ১০,৯৭৪ টাকা, ১১ আনা, ৪ পাই খরচ করে। সরকারের চোখেও এটি ছিল অভিজাতদের সভা, জমিদাররাই সভার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন। 'সমাচার দর্পণ' 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' কথা বলতে গিয়ে 'ঐ সভাগত প্রায় সমুদয় মহাশয় বড় ২ প্রতাপশালী জমিদার'[৪৪] এই সংবাদটি জানাতে ভোলে নি। জমিদারের স্বার্থরক্ষী এই সভাকে 'ভূম্যধিকারী সভা'র ঈষৎ মার্জিত রূপ বলতে পারি। মার্জিত এই কারণে, 'ভূম্যধিকারী সভা'র উদ্দেশ্য যেমন তার নামেই ধরা পড়ত, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র উদ্দেশ্য কিন্তু তার নামে ধরা পড়ে নি, পড়েছিল তার কাজে। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য : 'An analysis of the activities of the British Indian Association will show that though they upheld the general interests of the country when their own class interests were not involved, yet they tried generally, to promote the welfare of the Landlord at the expense of the Ryots and other classes'.[৪৫]

আগেই দেখিয়েছি, এই পর্বে জমিদার এবং বিত্তশালী অভিজাতরাই দেশকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, তাঁদের স্বার্থই বিবেচিত হত দেশের স্বার্থ বলে। কাজেই এই পর্বের 'অভিজাত' রাজনৈতিক সভাগুলিও তাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়ে হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—কারণ, সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থারই তা প্রতিফলন মাত্র।

৪৩ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন', 'সমাচার দর্পণ', ১০. ১. ১৮৫২।

৪৪ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন', 'সমাচার দর্পণ', ১০. ৪. ১৮৫২।

৪৫ *'Indian Political Associations and Reform of Legislature' (1818-1917)'*
Dr. Bimanbehari Majumdar, P. 74.

৬. আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলাসাহিত্য (১৮২৬-৫৬)

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কি ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তমান, কেমন অসংখ্য ঘটনার ভিড়ে ভরা তা বলে এসেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা এই পর্বের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্দোলন বা প্রচার, এবং রাজনৈতিক চেতনা কি পরিমাণে সমকালীন সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়েছে তারই আলোচনা করব। বলে রাখা ভাল, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সমগ্র বাংলাসাহিত্য আমাদের বিচার্য নয়, সমকালীন কোনো আন্দোলনের ছাপ যেখানে সাহিত্যে পড়েছে, কেবলমাত্র সেখানেই আমরা বিচারে অগ্রসর। এই প্রতিফলনের সন্ধানে সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্যকে আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করেছি। সমকালীন আন্দোলনের প্রতিফলন বিভিন্ন বাংলা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় যেখানে আত্মগোপন করেছিল, তার পরিচয় আমরা নতুন করে নেবার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে এই পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলির মতো ইংরেজি পত্রিকাগুলি থেকেও সংবাদ অল্পবিস্তর আহরণ করেছি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাসাহিত্যে সমকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতিফলন খোঁজার আগে এই সময়ের বাংলাসাহিত্যের প্রকৃত চেহারাটা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যের নবজন্ম ঘটল। এই নবজন্মের প্রস্তুতি-পর্বের ইতিহাস জানার জন্য পেছন ফিরে তাকালে দেখব, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় রাজা বদল ঘটেছে, জনসাধারণ অবশ্য এতে খুব বিচলিত হয় নি। তাই পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ প্রবেশকে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে অলস কৌতূহলে দেখেছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এল এর ক'বছর পরে, সরকারী ভাষ্য-অনুযায়ীই এতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারাল। সমকালীন বাংলাসাহিত্যে কিন্তু এসবের কোনো ছাপ পড়ল না। সাহিত্যে তখন 'গানের যুগ'—কবি, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, ভক্তিগীতি আর প্রেমগীতির একাধিপত্য। এযুগের কবি-গীতিকাররা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক নন, শিক্ষাদীক্ষার অভাব তাঁদের মধ্যে লক্ষ্যগোচর, রুচিও সবসময় রুচিকর নয়। তাঁরা গান গাইতেন জীবিকার প্রয়োজনে, জনমনকে তৃপ্ত করতে। কলকাতার হঠাৎ-নবাবরা ছিলেন তাঁদের ভাগ্যবিধাতা। আর এই ভাগ্য-

বিধাতাদের কাছে জীবন বড় রঙীন! সেই রঙের নেশা জমাতে সেখানে ঢালাও ফুর্তি, ফেনা-ওপচানো পানপাত্র, বাইজির গা গরম করা নাচ আর তারই মধ্যে কবির রসালো গান! বাইরের জগতের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আর তাই পলাশির যুদ্ধ, কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, নন্দকুমারের ফাঁসি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে পথে পথে ছড়ানো নরকঙ্কাল, বাংলার পল্লীঅঞ্চলে ১৭৬৩-৯৯ এর মধ্যে অন্তত ১৬ বার প্রজাবিদ্রোহ, ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে রাতারাতি জমি ও মানুষের ভাগ্যের ভাঙাগড়া—এই সব ঘটনা চোখের সামনে দেখেও নিধুবাবুর মতো গীতিকার বা রাম বসুর মতো কবিওয়ালা আমাদের মিলন বিরহের সংবাদ শুনিয়েছেন! পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন থেকে তাঁদের এই বিকৃত বিলাস-কলা-কৌতূহল চরিতার্থ করার ধারা অব্যাহত রইল উনিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত।

'বিদ্যাসুন্দর', 'রতিমঞ্জরী', 'রসমঞ্জরী'ই শুধু কলকাতার উঠতি বাবুদের উদ্দীপ্ত করত না। 'আদিরস', 'বেশ্যারহস্য', 'চারুচিত্তরহস্য', 'হেমলতা', 'রতিকান্ত', 'কুঞ্জরীবিলাস', 'প্রেম নাটক', 'প্রেমবিলাস', 'প্রেমতরঙ্গ', 'পুলকন-দীপিকা', 'প্রেম রহস্য', 'শৃঙ্গার তিলক', 'রতিবিলাস', 'সম্ভোগ রত্নাকর', 'রমণী-রঞ্জন', রসসাগর', 'রসরসামৃত', 'রসতরঙ্গিনী', 'রসেন্দুপ্রেমবিলাস', 'রতিকেলি', 'রতিশাস্ত্র', 'রস রত্নাকর', 'শৃঙ্গার রস', 'শৃঙ্গার তিলক', 'স্ত্রীচরিত্র', 'স্ত্রীপুলকন-দীপিকা'[১] ইত্যাদি বইগুলিও তাদের এনার্জি-টনিকের কাজ করত। কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমার' (১৮৩৬), মদনমোহনের 'বাসবদত্তা' (১৮৩৭), তারাচাঁদ দত্তের 'মন্মথ কাব্য' (১৮৪৪), মুন্সী এরাদতের 'কুরঙ্গভানু' (১৮৪৫), পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসিক তরঙ্গিনী' (১৮৫৫), উমাচরণ ত্রিবেদীর 'মদন মাধুরী'র ও (১৮৫৬) বাজার ছিল গরম। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাসাহিত্য শুধুমাত্র কবি, পাঁচালি, যাত্রা, উত্তাপহীন মঙ্গলকাব্য, রাধাকৃষ্ণের খেউড়, রামায়ণ-মহাভারতের বৈশিষ্ট্যহীন অনুবাদ, আর ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক কাব্যকৌতুকের অনুকরণেই সীমাবদ্ধ রইল না। তা যাত্রা করল নতুন ভাবে, নতুন পথে, তার চরিত্র হয়ে উঠল 'brilliant, diverse and complex.' সেখানে দেখা গেল গদ্যের চর্চা, সমাজচেতনার প্রকাশ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়া, সাংবাদিকসুলভ মনোবৃত্তি, যুক্তিতর্ক

১ রেভাঃ লং-এর মতে এই বইগুলি 'beastly equal to the worst of the French School.'—'*A Descriptive Catalogue of Bengali Works*' (1855), J. Long, P. 679.

এইসব। মহৎ কোনো সৃষ্টির দ্বারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য চিহ্নিত না হলেও, সব দিক দিয়েই একে শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তুতিপর্ব বলতে পারি। আর এই শক্তি সঞ্চয়ের বাসনাকে উদ্দীপ্ত করল বাংলা ছাপাখানা। আর কে না জানে, ছাপাখানা মানে আধুনিকতা, গতিশীলতা, সমকালকে ধরে রাখার শক্তিশালী হাতিয়ার তা।

আজকের দিনে গল্প মনে হলেও, কথাটা কিন্তু সত্যি যে ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতায় ১৭৮০-র আগে ছাপাখানার কোনো অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। যদিও ছাপাখানা একটা যাতে হয়, তার জন্য কেউ কেউ উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর, ১৭৬৮-তে কোম্পানির এক নামকরা কর্মী মিঃ বোল্টস কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় এক বিজ্ঞাপন এঁটে শহরে কোনো ছাপাখানা না থাকার ফলে ব্যবসার ক্ষতি ও অন্যান্য অসুবিধার কথা বলে, প্রেস স্থাপনে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তিকে সবরকম সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হন।[২] কিন্তু এ আহ্বানে আদৌ কোনো সাড়া তিনি পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। অল্পদিনের মধ্যেই হুগলিতে একটি প্রেস হয়, আর এখান থেকেই ১৭৭৮-এ হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ ছাপা হয়। এই প্রথম বাংলা ভাষা মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। এর বছর দুই পরে, কলকাতায় কোম্পানির প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। হুগলির প্রেসটিই স্থানান্তরিত হয়ে কলকাতায় এসেছিল, অথবা এটি নতুন কোনো প্রেস তা অবশ্য বলা মুশকিল। এই কোম্পানির প্রেসে বাংলা ভাষার লেখা ছাপা যেত—এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। ১৭৮৩-তে 'ক্যালকাটা গেজেট প্রেসে' অবশ্য বাংলা ছাপা যেত। দেখতে দেখতে ক'বছরের মধ্যে কলকাতায় প্রেসের ব্যবসা বেশ জমে উঠল। কলকাতায় বাবুরামই হিন্দুদের মধ্যে প্রথম কোলব্রুকের সহায়তায় একটি প্রেস করেন। ভাগ্য তাঁর ভালই ছিল, কারণ এ ব্যবসা থেকেই তিনি লাখ চারেক টাকা কামান।[৩] তাঁর পরে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যও এ ব্যবসায় বেশ নাম করেন। কেরী কলকাতার এক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ৪০ পাউণ্ড (মতান্তরে ৪৬ পাউণ্ডে) একটা কাঠের প্রেস কিনে তাতেই 'নিউ টেস্টামেণ্ট' ছাপান। তিনি যখন মালদা থেকে শ্রীরামপুর চলে আসেন, তখন সঙ্গে কাঠের

২ '*First Establishment of a Press in Calcutta*', 'The Friend of India', Vol. 1. No. 9, 26. 2. 1835, P. 65.

৩ '*On the effect of the Native Press in India*', 'The Friend of India', (Quarterly), Vol. 1. No. 1. 1821.

প্রেসটিও আনতে ভোলেন নি। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই আগুন লেগে তাঁর সাধের কাঠের প্রেসটি পুড়ে যায়। দেখতে দেখতে কেরী, উইলকিন্স, কোলব্রুক, পঞ্চানন, মনোহর ইত্যাদির চেষ্টায় বাংলা ছাপার প্রভূত উন্নতি হল। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুথিবাহিত সাহিত্যের যুগ শেষ হল। এল ছাপা বই-এর যুগ, যাকে সে যুগে অনেকে ভয়ের চোখে দেখত, অনেকে আবার তা দেখে ধর্মহানির আশঙ্কায় চোখ বুজত!

ধর্মহানি সত্যই ঘটল—পদ্যছন্দের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তির যে ধর্ম এতদিন চলছিল! ক্রমে গদ্যই হয়ে উঠল আধুনিক বাঙালীর চিন্তা ভাবনা ধ্যানধারণার ধারক ও বাহক। গদ্যই হল যুক্তি তর্কের জিজ্ঞাসার বাহন—সে জিজ্ঞাসা প্রসারিত হল সমাজ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে। সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তববাদী বাঙালীর কৌতূহল প্রকাশ পেল, যাকে ধারণ করল বাংলাসাহিত্যের আর এক নবজাতক—সাময়িক পত্রিকা।

১৮১৮-তে শ্রীরামপুর-মিশনরিরা যখন বাংলায় প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশ করলেন—তখন বাঙালীসমাজ চমকে ভাবল, এই জিনিসের অভাবই তো আমরা বোধ করছিলাম, গ্রাহকতালিকার শীর্ষে নাম লেখালেন দ্বারকানাথ ঠাকুর; লর্ড হেস্টিংসও তা সিকি ডাকমাশুলে বিলির ব্যবস্থা করে দিলেন। আর সাময়িকপত্রের ধর্ম তো একদিকে সমকালকে ধরে রাখা, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ কালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চালানো। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১৮১৮-৬৮) বইতে প্রদত্ত তালিকানুযায়ী ১৮১৮ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা ১৩৮। এই ১৩৮টির মধ্যে ১৭টিকে আমরা এই পর্বের প্রধান পত্রিকা বলে মনে করি। এর মধ্যে শ্রীরামপুর-মিশনরিদের 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) ছাড়াও রামমোহনপন্থী 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও সনাতনধর্মী 'সমাচার চন্দ্রিকা'র (১৮২২) নাম বহুশ্রুত। রক্ষণশীল 'সম্বাদ তিমিরনাশক' (১৮২৩) ও রামমোহনপন্থী 'বঙ্গদূত'ও (১৮২৯) উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর' (১৮৩১), ইয়ংবেঙ্গলের 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), দীর্ঘস্থায়ী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৮৩৫) ও প্রগতিশীল 'সংবাদ ভাস্কর'কেও (১৮৩৯) আমরা ভুলে যাই নি। গালিগালাজ ও অশ্লীলতাপূর্ণ 'সংবাদ রসরাজ' (১৮৩৯), এদেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখবৃদ্ধিতে আন্দোলনেচ্ছু 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২), সমাজসচেতন 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) ও ঈশ্বরজ্ঞান প্রচার অভিলাষী তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ব-

বোধিনী'ও (১৮৪৩) স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' (১৮৫০) প্রকাশিত হয়েছিল কুরীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিজ্ঞ হয়ে। এগুলি ছাড়াও 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণীবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদি-দ্যোতক' মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), প্রধানত স্ত্রীলোকের জন্ম প্রকাশিত 'মাসিক-পত্রিকা' (১৮৫৪), এবং মূলত সংবাদপত্র হিসাবে পরিচিত 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (১৮৫৬) এযুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। দেখাই যাচ্ছে, এই পত্রিকাগুলির কোনোটি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মতামতবাহী, কোনোটি বা বিশেষ ধর্মীয় ভাবধারা প্রচারে উৎসাহী, আবার কোনোটি বা সামাজিক কুরীতি সংস্কারের বাসনায় উদ্বুদ্ধ। নিছক সাহিত্য পত্রিকা বলতে যা বোঝায়, বোধহয় এর কোনোটিই তা নয়।

আর এইসব পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে আছে তৎকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের রূপ, আর তার বিচিত্র সামাজিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় এবং অন্যত্র সমকালীন আন্দোলনকে যারা তুলে ধরলেন, মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তাঁরা কে, কি তাঁদের পরিচয়, কেমন তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, রসরুচি।

পরিচয়ে এঁরা মধ্যবিত্ত—উনিশ শতকে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক সম্প্রদায়। এঁরা অনুসন্ধিৎসু, সমাজসচেতন, আপন ব্যক্তিত্বে আস্থাবান। উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্য তো এঁদেরই হাতে গড়া। উদাহরণ, অক্ষয়কুমার দত্ত বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বা তারাচরণ শিকদার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মিলনস্থল হল নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতা। উল্লেখ্য সাহিত্যসাধকরা সবাই কলকাতাশ্রয়ী হওয়ায় কলকাতা হয়ে উঠল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎসমুখ।[৪] পল্লী থেকে নগরে সাহিত্যের উত্তরণ ঘটায় গ্রামীন বাংলা সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল পুরোপুরি 'নাগরিক' সাহিত্য। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের এই নাগরিক লক্ষণ অনাধুনিক সাহিত্য থেকে তার পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলল।

শুধু নাগরিক লক্ষণই নয়, আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ওপর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব। সাগরপারের

---

৪ বাংলাসাহিত্যের আধুনিক একজন ইতিহাসকার বাংলাসাহিত্যের আধুনিক যুগকে 'কলকাতা পর্ব' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দ্র. '*Bengali Literature*' (1948), J. C. Ghosh, **Chap IV, Calcutta Period (19th Century).**

যায় না জানা বিভিন্ন কবিসাহিত্যিক এদেশের তরুণদের সামনে নিয়ে এলেন এক অজানা জগতের খবর। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ও দৈন্যের পাশে ইংরেজি সাহিত্যের নবীনতা বাঙালীকে আকৃষ্ট করল। সেক্সপীয়র, বায়রন, স্কট, মিলটন, কাউপার, পোপ, ড্রাইডেন ইত্যাদিরা নব্যশিক্ষিত বাঙালী তরুণদের প্রেরণাস্থল হয়ে উঠলেন। রামায়ণ মহাভারতের স্থান নিল ইলিয়ড, ওডিসি। তাই এযুগে কেবল মধুসূদনই নয়, আরো অনেক শিক্ষিত বাঙালী যুবক ইংরেজিকেই প্রাণের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে, তাতে শুধু লিখতে, বলতে, পড়তেই আরম্ভ করলেন না, তাঁরা স্বপ্নও দেখতে আরম্ভ করলেন ইংরেজিতে! এর পেছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিতের উজ্জ্বল সামাজিক ও আর্থিক ভবিষ্যতের প্রলোভনও কাজ করেছিল। ইংরেজি রাজভাষা, সমাজে তা সম্ভ্রম উদ্রেককারী, এবং ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের সহায়ক। তাছাড়া ইংরেজি লেখা ইংরেজরা পড়ত, কোনো লেখা তাদের ভালো লাগলে লেখকের সম্মানিত হবার সম্ভাবনাও থাকত। কিশোরীচাঁদ মিত্রের কথাই ধরা যাক। ১৮৪৫-এ 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত 'রামমোহন রায়' সম্পর্কিত ইংরেজি লেখাটি তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সহায়ক হয়েছিল।[৫] বলতে পারি, এযুগে সচেতন মধ্যবিত্ত জনমানস নিজেদের স্বার্থে ইংরেজকে ও সেই সূত্রে ইংরেজি সংস্কৃতিকে মোটামুটি প্রসন্নমনে গ্রহণ করেছিল। জীবিকার প্রয়োজনের কথাও ভুললে চলবে না। যে কারণে সাহেবদের অধীনস্থ অনেক গোঁড়া হিন্দু কর্মচারী অফিস থেকে বাড়ী এসে গঙ্গাজল স্পর্শ করে সাহেব-সংসর্গের দোষমুক্ত হত। রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধ্বজাবাহী 'ধর্মসভা'ও ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে নি। ধর্মসভা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সাহেবের দেওয়ানি করেই অন্ন সংগ্রহ করতেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো ব্রাহ্মণপণ্ডিত টিকি রাখলেও, বিশেষক্ষেত্রে কোট-প্যান্ট পরে যেতে ভুল করতেন না।[৬]

অনিবার্যভাবেই এরকম পরিবেশে বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণদল একইসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে অনুরাগী এবং বাংলাসাহিত্যে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন।[৭] আর

৫ 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র', মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ. ৬৯; 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ৩৬।

৬ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', পৃ. ৪২।

৭ অবশ্য বাংলাভাষার প্রতি কিছুটা অবহেলা প্রাক্ উনবিংশ শতাব্দীতেও লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত, আরবী-পারসীরই তখন একাধিপত্য। নবাবী আমলে পারসীর বদলে বাংলায় লিখলে রাজস্ব বিভাগের কর্মীরা কোনো আবেদন গ্রহণই করত না। (দ্র. '*Early Bengali Literature*-

এই বিতৃষ্ণাকে বাড়িয়ে তুলল উনিশ শতকের বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থা—যাতে মাতৃভাষার স্থান—সবার পিছে-সবার নীচে।

হিন্দু কলেজে বাংলা পড়ান হত দিনের শেষভাগে। এইসময় ছাত্রদের প্রায়ই ছুটি দিয়ে দেওয়া হত বাড়িতে পড়ে নেবার জন্য। হিন্দু কলেজের বাংলার শিক্ষক একসময় রামকমল সেনের রাঁধুনি-বামুন ছিলেন, তিনি রান্না ভালোরকম জানলেও বাংলা ভালো জানতেন কি—অন্তত ছাত্রদের আকৃষ্ট করার মতো? রাজনারায়ণ বসুরা যে তাঁর সঙ্গে রান্নার গল্প করে সময় কাটাতেন, তা তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে'ই উল্লেখ করেছেন। ১৮৪৯-এও হিন্দু কলেজে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নামমাত্র। "তথায় পাঠের শৃঙ্খলা নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই, এবং কেহ তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণও করে না। বাংলা শিক্ষা করা আর না করা একপ্রকার ছাত্রদিগেরই স্বেচ্ছাধীন।"[৮] ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেও হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পাঠের নিয়মে দেখি কেবলমাত্র বুধ ও বৃহস্পতিবারের শেষ ঘণ্টা (৩-৪৷৷০) বাংলা পাঠের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সোমবারের শেষ ও শনিবারে তার আগের ঘণ্টা (২-৩) বাংলা পাঠের জন্য নির্দিষ্ট। দুটি শ্রেণীতেই গণিত, ইতিহাস ও সাহিত্যের (ইংরেজি) জন্য বাংলার দ্বিগুণেরও বেশি সময় বরাদ্দ ছিল।[৯]

and Newspapers', 'The Calcutta Review', Vol. 13, 1850, P. 131) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রথমদিকে দ্বিতীয়-রাজভাষা পারসী না জানলে বাঙালীর ছেলের কোথাও কাজকর্ম জুটত না। অভিভাবকরা তাই বাংলা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ছেলেদের পারসী শেখাতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরবী-পারসী বিভাগের প্রতি সরকারি মনোযোগ ছিল অসীম। আরবী-পারসী বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও ১৮১৩ পর্যন্ত কলেজখাতে বরাদ্দ ২৬৪,১০৬ টাকার দুই-তৃতীয়াংশ ১৬৭,০০০ টাকা পেয়েছিল এই বিভাগ। (দ্র. '*British Orientalism & Bengal Renaissance*', David Kopf, P. 86) সংস্কৃত আর আরবী পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে সরকারি সাহায্য ছিল অকৃপণ। অন্যদিকে অনাদৃত বাংলাভাষা কেউ পড়তে চাইত না, তাই ছাত্রের অভাবে কেরীকে বাংলা ক্লাস খুলতে রীতিমতো বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমদিকে সংস্কৃত পণ্ডিতরাও জনবোধ্য বাংলাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখত। যে ভাষা পড়লেই বোঝা যায় তা এইসব পণ্ডিতদের (!) মতে ভাষাই নয়! (দ্র. 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', রামগতি ন্যায়রত্ন, ৩য় সং, ১৩১৭, পৃ. ২০৭।) মৃত্যুঞ্জয় বাংলার শিক্ষক ও লেখক হয়েও 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় সংস্কৃতের তুলনায় বাংলার অপকৃষ্টতার কথা বলতে দ্বিধা করেন নি। রামমোহনের 'লৌকিক ভাষা'য় 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

৮ 'বঙ্গদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস', 'তত্ত্ববোধিনী', ৬৯ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৭৭১ শক।

৯ 'হিন্দুকালেজের শিক্ষাপ্রণালী', ঐ, ৮৬ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৭৭২ শক।

বাংলা ভাষার প্রতি এই অবহেলায় 'তত্ত্ববোধিনী' আক্ষেপ প্রকাশ করে বলে, হিন্দু কলেজে বাংলাশিক্ষার সুরীতি নেই, বাংলা শেখা আর না শেখা ছেলেদের ইচ্ছাধীন—তারা পণ্ডিতদের গ্রাহ্য করে না। পাঠে মনোযোগ দেয় না, আর তা না দিলেও কোনো শাসন হয় না। মেডাক ও বেথুন বাংলাশিক্ষার অনুকূলে মতামত প্রকাশ করার পরেও, অবস্থা ছিল এইরকম শোচনীয়।[১০] শুধু হিন্দু কলেজেই নয়, এযুগে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বাংলা শিক্ষার মান অতি শোচনীয়। বিদেশী লেখকের ভাষায় এইসব প্রতিষ্ঠানে 'Scarcely anything can be lower than the Native standard of vernacular education.'[১১]

বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এই ধরনের অবহেলা ও অমনোযোগের ফলে নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে তার প্রতি বিরাগ দেখা দিল। নবাবী আমলে বাংলা যেমন হয়ে উঠেছিল ফারসী-কণ্টকিত,[১২] এযুগে তেমনি হয়ে উঠল ইংরেজি শব্দ ও বাক্যবিন্যাসে ভরপুর। 'সুশিক্ষিত', 'সুধীর', 'সুসভ্য', 'প্রতিজ্ঞাপালক' ইয়ংবেঙ্গলের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলায় 'সংবাদ প্রভাকর' বেদনাবোধ না করে পারেনি। তাঁদের কথোপকথনের সামান্য নমুনাই প্রমাণ করবে বাংলা ভাষাকে তাঁরা কেমন আধা-ইংরেজি করে তুলেছিলেন :

'কেমন ভাই বাড়ীর সকল মঙ্গলতো,—

—মশায়, আসুন, 'লাস্ট নাইটে' বড় 'ডেঞ্জরে' পড়েছি, 'আঙ্কেলের কালারা' হয়েছে, 'পল্‌স' বড় 'উইক' হোয়েছিল, আজ মার্নিংয়ে ডাক্তার এসে অনেক 'রিকাবর' করেছে, এখন 'লাইফের হোপ' হোয়েছে…'[১৩]

বাংলা ছেড়ে এইসব নব্যশিক্ষিত তরুণদের অনেকে ইংরেজিতেই সাহিত্য-চর্চা করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষই সম্ভবত বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজিতে কবিতা লেখেন। বাংলায় প্রেমগীতি লিখলেও, ইংরেজিতেই তিনি মনে করতেন নিজেকে ভালোভাবে প্রকাশ

১০ 'হিন্দু কালেজের শিক্ষাপ্রণালী', 'তত্ত্ববোধিনী', ৮৬ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৭৭২ XIক।

১১ '*The Bengali Language and Literature*', 'The Calcutta Review', Vol 11, 1849, P, 515.

১২ পারসী-কণ্টকিত বাংলার চরম দৃষ্টান্ত ১৭৮০-তে লেখা একটি সনদ। এখানে শেষ ক্রিয়াপদটি ছাড়া গোটা বাক্যে একটিও বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। (দ্র. '*The Bengali Language and Literature*', 'The Calcutta Review', Vol. 11, P. 493)

১৩ 'ইয়ংবেঙ্গল', 'সংবাদ প্রভাকর', ৩০৯০ সংখ্যা, ১২. ৪. ১৮৪৮, পৃ. ১৯।

করতে পারবেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'I have composed songs in Bengali, but the greatest portion of my writings in verse is in English. I have always found it easier to express my sentiments in that language than in Bengali.'[১৪] অন্যতম ইয়ং-বেঙ্গল গোবিন্দচন্দ্র বসাকের কবিতা ডিরোজিও সংশোধন করে দিতেন। 'রিফর্মারে' খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে তিনি মিশনরিদের পর্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিলেন। গোহাড় সংক্রান্ত ঘটনার পরিণতিতে গৃহচ্যুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজিতেই তাঁর নিখুঁত সমাজচিত্র 'দি পার্সিকিউটেড' (১৮৩১) রচনা করেন, কালাকানুনের সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ ইংরেজিতেই তাঁর পুস্তিকা রচনা করেছিলেন (১৮৪৯)। বন্ধুদের চিঠিপত্রও তিনি ইংরেজিতে লিখতেন। তাঁর মাতৃভাষার জ্ঞান 'সন্ন্যাসী' শব্দের বানান 'শন্যাসী' লেখায় প্রকাশিত। মধুসূদনের মতো গত শতাব্দীর আর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রাধানাথ শিকদার বাংলা তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসে 'মাসিক পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় বাংলাভাষার চর্চা করলেও, বাংলা উচ্চারণে বিদেশী টান তিনি জীবনে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। প্যারীচাঁদ মিত্রও প্রথম জীবনে ইংরেজি প্রবন্ধ রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন, বেশ কটি গ্রন্থও তাঁর ইংরেজিতে লেখা—যার মধ্যে ডেভিড হেয়ার ও রামকমল সেনের জীবনী অতিখ্যাত। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইংরেজিতে মনুসংহিতার অনুবাদ করেন। অন্যতম ইয়ংবেঙ্গল রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রায় সব রচনাই ইংরেজিতে। মধুসূদনের প্রথম জীবনের সাহিত্যপ্রয়াসও ইংরেজিতে। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ করলেও (জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩১), 'সংবাদ তিমিরনাশকে'র ভাষ্য অনুযায়ী 'বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না, এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভালো পারেন না, তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয়।'[১৫] রামবাগানের দত্ত পরিবারের (কৈলাসচন্দ্র দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি) ইংরেজি সাহিত্যচর্চার কথা সুবিদিত।

কিন্তু সবাই বাংলাকে একচোখে দেখতেন না। অনেকে তার দুরবস্থায়

১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় (১ম) কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৪২।

১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িকপত্রে' উদ্ধৃত, পৃ. ৪০।

বেদনা ও অবহেলায় দুঃখ অনুভব করতেন। আর এঁদেরই চিন্তা ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে মাতৃভাষার অনুকূল করে তুলল। তাঁদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করল একাধিক ঘটনা—মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচার; দেশীয় ভাষায় সাময়িকপত্রের প্রকাশ; ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থে এদেশীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ; কোনো কোনো বিশিষ্ট ইংরেজের (যেমন কেরী, ফরস্টার, মেডাক, বেথুন, লং, ডাফ ইত্যাদি) বাংলাভাষার প্রতি প্রশংসাযুক্ত মনোভাব; মিশনরিদের বাংলাভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ (১৮৩৫-এ শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বাংলাভাষার চর্চা ও তার উন্নতিসাধন জাতীয় কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করে[১৬]); বাংলাভাষা চর্চায় অবহেলা দেখে বিভিন্ন সভাসমিতিতে দুঃখপ্রকাশ (১৮৩৩-এ 'রিফর্মারে' জনৈক পত্রলেখক হিন্দু যুবকদের বাংলাভাষার প্রতি অবহেলার এবং তাঁদের গঠিত সভাসমিতিতে বাংলাভাষার প্রতি অমনোযোগের কথা উল্লেখ করে, এইসব সভাসমিতিতে বাংলার প্রতি মনোযোগ দিলে ও এই ভাষায় সকল বিষয়ের আলোচনা করলে, তা জাতির গর্বের কারণ হবে বলে মত প্রকাশ করেন[১৭]); নবগঠিত কোনো কোনো সভাসমিতিতে[১৮] বাংলাভাষা চর্চায় নবোদ্যম ইত্যাদি। সমাজের সর্বস্তরেই কমবেশি বাংলাপ্রীতি প্রকাশ পেতে লাগল। এমনকি ইংরেজিনবিশ ইয়ংবেঙ্গলের একান্ত নিজস্ব সংগঠন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'তে ১৩. ৬. ১৮৩৮-এ উদয়চাঁদ আঢ্য 'এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাকরণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব' পাঠ করেন। এই প্রস্তাবে বাংলাভাষার প্রতি অবহেলা ও অনাদরে ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষা 'দেশীয় ভাষায় হওয়া অত্যুচিত' বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বাংলাভাষার প্রতি অবহেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এমন কথাও লিখল, 'এদেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাষার আলোচনা করা অতি কর্তব্য আর এই ব্যাপার

১৬ '*The Bengali Language*', 'The Friend of India', 19. 2. 1835, P. 59.

১৭ '*Cultivation of the Bengally language recommended to the Regenerated Hindoos*', 'The Reformer', 24. 3. 1833.

১৮ 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' (১৮৩৩), 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি' (১৮৩৪), 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' (১৮৩৬), 'ভূম্যধিকারী সভা' (১৮৩৭), 'বঙ্গরঞ্জিনী সভা' (১৮৪৪), 'জ্ঞানদায়িনী সভা' (১৮৪৯), 'বঙ্গভাষানুশীলন সভা' (১৮৫৩), 'বাগ্‌বাদিনী সভা' (১৮৫৫) প্রভৃতি এ ধরনের কটি সভা।

প্রয়োজনীয় ও উপকারক…।'[১৯] নানা পত্রপত্রিকায় ক্রমেই বাংলাভাষায় প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগল। অন্যদিকে ১৮৩৭-এ আদালতে দেশীয় (বাংলা) ভাষার প্রচলন[২০], এবং ১৮৩৯-এ আদালতে ফারসীর বিলোপের ফলে বাংলাভাষার ব্যবহারিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পেল। সবমিলিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সুদিনের লক্ষণ ফুটে উঠল। আর এই সুদিন যাঁরা আনলেন তাঁরা কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না, শুধু সৃষ্টিসুখের উল্লাসেই তাঁরা সৃষ্টি করেন নি। এই সময়কার উল্লেখ্য প্রায় সব সাহিত্যিকেরই সাহিত্যসাধনা তাঁদের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ।[২১]

রামমোহন রায়ের অন্যান্য ভূমিকা সম্পর্কে যে যাই বলুক, তিনি মুখ্যত ধর্ম ও সমাজসংস্কারক। সেইসঙ্গে শিক্ষাসংস্কারক এবং রাজনীতি-বিদও বটেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্থান কোথায় এ প্রশ্ন না তুলেও বলতে পারি, সাহিত্যিক রামমোহন নিঃসন্দেহে তাঁর মুখ্য পরিচয় নয়। তিনি কলম ধরেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। ধর্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কারের বাসনাই তাঁকে প্রাণিত করেছিল বেদান্ত গ্রন্থ রচনায়, বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদে, খ্রীষ্টীয় গোঁড়ামির প্রতিবাদ করায় ও সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব রচনায়। সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ মূলত একজন পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদক হিসাবে হলেও, 'বাঙালী মায়ের মতো হৃদয়বান' মানুষটি সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল, বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণে কলম ধরেছিলেন। সারস্বত সাধনার চেয়ে সমাজসংস্কারই তাঁর কাছে বড় হয়ে-

১৯ 'হিন্দুকালেজে বাঙ্গালা শিক্ষা', 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ২৫ সংখ্যা, ১. ৮. ১৮৪৩।

২০ অবশ্য বাস্তবে আদালতে বাংলাভাষা কতখানি চালু হয়েছিল সন্দেহ। ১৮৫২-তে 'সমাচার দর্পণে' অন্তত ১৫০ জন স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে মফস্বল আদালতে হিন্দুস্থানী ভাষার অতি প্রচলনজনিত অসুবিধার উল্লেখ করে আদালতে বাংলাভাষা ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেখান হয় (দ্র. 'সমাচার দর্পণ', ১৭. ১. ১৮৫২, পৃ. ৩০০)। বাঙালীরা অবশ্য সবাই সেযুগে আদালতে বাংলাভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল না। শ্রীহট্টের রতনগোবিন্দ দাস প্রভৃতিরা 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পূর্বোক্ত আবেদনপত্রটি সম্পর্কে বলেন, আইন আদালতের কাজ উর্দুতেই চলেছে, চলবে, বাংলাতে তা চালাতে ক্লেশ হবে (দ্র. 'সমাচার দর্পণ', ২১. ২. ১৮৫২, পৃ. ৩৪৩-৪)।

২১ 'Every great writer of this period of transition was of necessity a politician, a social reformer, or a religious enthusiast' '*Bengali Literature in the 19th Century*' (2nd Ed, 1962) Dr. S. K. De, P. 51.

ছিল। তাই 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী' হওয়া সত্বেও তাঁর প্রধান পরিচয় একজন মহাপ্রাণ সংস্কারক রূপে। বিদ্যাসাগর নিজেও বিধবাবিবাহ প্রচলন তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম মনে করতেন, সুললিত বাংলা গদ্যরচনা নয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার 'প্রথম গদ্য স্টাইলিস্ট'। 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায় 'বাবুর উপাখ্যান' (১৪. ২. ১৮২১ ও ৯. ৬. ১৮২১ 'সমাচার দর্পণে'র এই দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত) যদি তাঁর রচনা হয়, তাহলে সেখান থেকেই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের পথ চলা শুরু। কিন্তু ভবানীচরণ সেযুগের অন্যতম মৌলিক রসস্রষ্টা সাহিত্যিক এবং সমাজচিত্রকর হলেও, সেকালে তাঁর প্রধান পরিচয় 'ধর্মসভা'র সম্পাদক এবং সনাতন হিন্দুধর্মের নিষ্ঠাবান সেবক হিসাবে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ভাষ্য-অনুযায়ী তাঁর রচনা সমাজ সংশোধন করলেও, সেযুগে তাঁর যে জীবনী লেখা হয়েছিল, তা 'ধর্মসভা' সম্পাদকের জীবনী, 'নববাবুবিলাস' লেখকের জীবনী নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও সেই একই কথা। তিনি বাংলা গদ্যের এক কুশলী লেখক, কিন্তু বাংলা গদ্যের লেখকের চেয়েও ব্রাহ্মধর্মের পুনর্জন্মদাতা দেবেন্দ্রনাথই আমাদের পরিচিত। এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের স্থানের চেয়ে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের স্থান অনেকবেশি গৌরবোজ্জ্বল। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল কারণ প্রয়োজনের তাগিদ, তাই রসসাহিত্য নয়, 'ধর্মোপদেশ' সাহিত্যই তাঁর সম্বল। বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার একদিকে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার করেছেন, যা দেখে দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমি কোথায় আর তিনি কোথায়!' তাঁর 'চারুপাঠ' দীর্ঘদিন আমাদের তৎকালীন মায়েদের বোধকে সুচারু করেছে। 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় একাধিক প্রবন্ধে তাঁর সমাজ সচেতনতা ভাষা পেয়েছে। কখনও বহুবিবাহের বিরোধিতায়, কখনও বিধবাবিবাহের সমর্থনে, আবার কখনও পল্লীগ্রামের প্রজাদের অসহায় অবস্থাকে চিত্রিত করতে তিনি কলম ধরেছেন। কিন্তু সাহিত্যিক অক্ষয়কুমারের চেয়ে যে অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক, যিনি বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান না বিচিত্র শক্তিমান এই নিয়ে তর্ক করেন, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা-এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হাত তোলার প্রস্তাব করেন, অঙ্কের সূত্র অনুসরণ করে প্রার্থনার অনাবশ্যকতা দেখান, এবং ব্রাহ্মধর্মের দেবেন্দ্রনাথী ভক্তিবাদকে অন্তত কিছুটা যুক্তিবাদে পরিণত করেন—

তিনি কি সাহিত্যিক অক্ষয়কুমারের চেয়ে গৌণ ব্যক্তিত্ব? অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্যের স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত? তিনি শুধুই 'কবিতা রচক'-'দেশের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক' বলে আক্ষেপ করেছিলেন তাঁরই কাব্যশিষ্য দ্বারকানাথ অধিকারী। আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত শুধু 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক, নবীন সাহিত্যিকদের অনির্বাণ উৎসাহদাতা আর প্রাচীন কবিদের পরিচয় উদ্ধার-কর্তাই নয়, তিনি উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ, গ্রাম বাংলা আর আজব শহর কলকাতার তথ্যনিষ্ঠ রূপকারও। এই ঈশ্বর গুপ্তও তো বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো শুধু একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধকই ছিলেন না। 'ধর্মসভা'র উৎসাহী সদস্য হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। প্রথম যৌবনে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গার, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা এবং আত্মস্থ হবার পর মিশনরি আক্রমণের বিরুদ্ধে ও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে তাঁর দীপ্ত ভূমিকা, 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'র উৎসাহী সদস্য হিসাবে তাঁর উপস্থিতি—এইসব ভোলবার নয়। ঈশ্বর গুপ্ত এত বেশি সমাজসচেতন যে অনেক সময় কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি সংবাদই পরিবেশন করেছেন। তাই তিনি শুধু কবি নন, বাংলার প্রথম সাংবাদিক-কবিও। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এমন উঠেপড়ে লেগেছিলেন যে, তিনি একজন লেখক তা অনেকে ভুলেই গেছেন! প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যসাধনা মুখ্যত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হলেও 'বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা' 'মাসিক পত্রিকা'র প্রকাশ আমাদের আলোচ্য পর্বের মধ্যে। প্যারীচাঁদ মিত্র নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নাম—কিন্তু যদি বলি তাঁর প্রধান পরিচয় সমাজসচেতন ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধিরূপে—তাহলে কি ভুল হবে? ১৮৫৪-তে রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে স্ত্রীলোকের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা'র প্রকাশ তো তাঁর সমাজসচেতনতারই উদাহরণ।

আগে দেখিয়েছি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অস্থির এবং নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল। বাঙালী যেন এই পর্বে জীবনকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী। এ পর্ব বাঙালীর আত্মরক্ষার এবং আত্মআবিষ্কারের পর্ব। ধর্ম ও সমাজজীবনের ভাঙাগড়ায় অস্থির এই পরিবর্তমান পর্ব আক্ষরিক অর্থেই সাহিত্যসৃষ্টির পর্ব নয়। অন্যদিকে বাঙালী তার মধ্যযুগীয় নির্বিকারত্ব এইসময় কিছুটা কাটিয়ে

ওঠে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামার, পলাশির যুদ্ধের বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন সমকালীন বাংলা সাহিত্যে প্রায় না থাকলেও, উনিশ শতকে নবজিজ্ঞাসার সূচনায় ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাবলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে ছাপ রাখল, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল এই পর্বের আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্য। সর্বত্র সাহিত্য হয়ে উঠতে না পারলেও, সমকালকে তা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে।

(২)

বাংলা খ্রীষ্ট সাহিত্য ও তার প্রতিক্রিয়া

কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীদের মুক্তির পথ দেখাতে হবে, প্রভু যিশু ছাড়া কে সেই পথ দেখাবেন? আর সেই জন্যই তো মোহান্ধ বাঙালীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম কতখানি খারাপ ও খ্রীষ্টধর্ম কতখানি উন্নত। তা দেখাবার অনেক পথের মধ্যে একটি দেশীয় ভাষায় ধর্ম-প্রচার। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরা তাই নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলায় বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টমাহাত্ম্যমূলক ও অন্যধর্মের কুৎসামূলক পুস্তক রচনা ও প্রচারে মেতে উঠলেন।

আলোচ্য পর্বে (১৮২৬ ৫৬) বাংলা ভাষায় রচিত খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পুস্তক-গুলিকে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) বাইবেলের অংশ-বিশেষের অনুবাদ ও প্রচার; (১৮১১-৪৯-এর মধ্যে ক্যালকাটা বাইবেল সোসাইটি দেশীয় ভাষায় ধর্মপুস্তকের সমগ্র বা অংশবিশেষের যে ৬০২, ২২৬ কপি প্রচার করে, তার এক-চতুর্থাংশই বাংলা।[২২]) (খ) অন্যধর্মের চেয়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যমূলক পুস্তিকা ও পত্রিকা। এইসব পুস্তিকাগুলি খ্রীষ্ট ও বাইবেল মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে হিন্দুধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র, তীর্থমাহাত্ম্য, হিন্দু দেবদেবীর কুৎসা ও হিন্দু অবতারদের নিন্দাবাদে মুখর থাকত। হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের চেয়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণায় এই সব পুস্তিকাগুলির লেখকরা ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। এগুলি প্রচুর সংখ্যায় ছাপা এবং বিনামূল্যে বিতরিত হত। এই ধরনের পুস্তিকাগুলির

২২ '*Early Bengali Literature and Newspapers*', 'The Calcutta Review', Vol. 13, 1850, P. 139.

মধ্যে খ্রীষ্টীয় গল্পকাহিনীগুলি কিছুটা ভালো—যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। এটি বাংলা সাহিত্যের এক 'বিস্ময়কর সৃষ্টি' না হলেও খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচার পুস্তক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণই যে পৌত্তলিক হিন্দুদের মুক্তির একমাত্র উপায়, বইটিতে তাই দেখানো হয়েছে। সাধারণ বাঙালীর কাছে বইটির বিশেষ কোনো আকর্ষণ না থাকলেও, চার আনা দামের এই বইটি 'ক্যালকাটা ট্রাক্ট সোসাইটি ৩০০০ কপি ছাপিয়েছিল, এবং প্রায় সব ভারতবর্ষীয় ভাষাতেই বইটি অনূদিত হয়েছিল। তিন আনা দামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপ্যাখ্যানে'র (১৮৫৬) নামও প্রসঙ্গত মনে আসতে পারে। এই গল্পকাহিনীটির নায়িকা সুশীলা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কাজেই তার জীবন এবং কর্ম সব কিছুই মধুময়!

১৮২৬-৫৬-র মধ্যে বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক অন্তত ৬ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হল: (১) মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (১৮৪৩), জে. রবিনসন সম্পাদিত; (২) উপদেশক (১৮৪৭), জে. ওয়েঙ্গার সম্পাদিত; (৩) সত্য-প্রদীপ (১৮৫০), টাউনসেণ্ড সম্পাদিত; (৪) সত্যার্ণব (১৮৫০), জে. লং সম্পাদিত; (৫) সংবাদ সুধাংশু (১৮৫০), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; (৬) অরুণোদয় (১৮৫৬), লালবিহারী দে সম্পাদিত। অন্য ধর্মের কুৎসা ও খ্রীষ্ট-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে এই পত্রিকাগুলির উৎসাহের কোনো অভাব ছিল না। এইসব পত্রিকা থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের একটু নমুনা দেখা যাক:

'হিন্দুরা প্রায় সকলপ্রকার পাপ করে বিশেষত: তাহারা দেবপূজারূপ মহাপাপে দোষী আছে ঘৃণ্য দেবপূজাকারি হিন্দুরা কি ধার্মিক। তাহা নহে।··· যে দেবতারদের উপর ভরসা রাখে ও যাহারদের সেবা করে সে দেবতারা কি তাহারা মৃত ও অতি দুষ্ট লোক ছিল এবং আপনারা স্বর্গলাভ করিতে পারিল না তবে কি তাহাদের পূজকদিগকে তাহা দিতে পারে। হিন্দুরদের তাবৎপূজা মিথ্যা পাপ শেষে তাহারা দেখিবে যে এবং ঐ পাপের নিমিত্ত পরকালে দুঃখভোগ করিতে হইবেক···।'[২৩]

খ্রীষ্টমাহাত্ম্যসূচক প্রচার পুস্তিকাগুলিতে মোটামুটিভাবে ৬টি রচনারীতি চোখে পড়ে:

(ক) পদ্য: 'ত্রাণোপায়', 'নিস্তার রত্নাকর' (৩য় সং, ১৮৩৮)[২৪], 'ধর্ম-

২৩ 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র', এপ্রিল, ১৮৪৩, পৃ. ৫১-২।

২৪ উল্লিখিত প্রত্যেকটি পুস্তিকার যে সংস্করণ আমরা দেখেছি, তার প্রকাশকাল উল্লিখিত।

পুস্তকের সার' (১৮৩৬), 'সদ্ধর্ম প্রকাশ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। গতানুগতিক পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত এই পুস্তিকাগুলির রচনারীতির একটু নমুনা 'ত্রাণোপায়' থেকে দেখা যাক :

'এখন ছাড় দেবদেবী সকল ঘৃণিত জানিয়া
কর পিতা ঈশ্বর সেবা কেবল তাঁকে মানিয়া।'

(খ) কথোপকথনের রীতি : এই রীতিটি খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তিকায় বহুল ব্যবহৃত। 'রামহরি ও সাধু' (১৮৩৫), 'মহাপ্রায়শ্চিত্ত' (১৮৩৭), 'ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা' (৫ম সং, ১৮৩৭), 'সত্য আশ্রয়' (১৮৩৮), 'কোন শাস্ত্র মাননীয়' (১৮৩৯) ইত্যাদি পুস্তিকাগুলি এই রীতির উদাহরণ। এগুলির ভাষা অন্যান্য খ্রীষ্টসাহিত্যের তুলনায় কিছুটা সহজ, সরল।

(গ) গদ্যাশ্রয়ী গুরুগম্ভীর রীতি : 'মহাবিচার' (১৮৩৫), 'মনোযোগের বিষয়' (১৮৩৫), 'মধুর চরিত্র' (১৮৩৬), 'ধর্মব্যবস্থা' (১৮৩৮), 'ধর্ম অবতার' (৪র্থ সং, ১৮৩৮), 'খ্রীষ্টের উপদেশ কথা' (১৮৩৯), 'স্বকর্তৃভক্তির বিষয়', 'ভ্রমনাশক' ইত্যাদি পুস্তিকাগুলি এই রীতিতে রচিত। এর অনেকগুলির ভাষাই 'সাহেবি বাংলা'র দৃষ্টান্তস্থল। ১৮৩৫-এ ১০,০০০ কপি মুদ্রণ সৌভাগ্য অর্জিত 'মহাবিচার' থেকেই একটু ভাষার নমুনা দেখা যাক :

'শুন, রাজাদের রাজনীতি এই যে আপনার আজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া তদনুসারে প্রজাগণের বিচার করেন ; এখন দেখ, ঈশ্বর আছেন রাজাদের উপর রাজা, মনুষ্য সকল হইয়াছে তাঁহার প্রজা, আর তিনি নিজে একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যাহাতে তাবৎ মনুষ্যের বিচার করিবেন।'

(ঘ) পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট মাহাত্ম্যপ্রচার : এই রীতিতে রচিত একটি মাত্র পুস্তিকাই ('ধর্মবিষয়ক পত্রকৌমুদী', ১৮২৮) আমাদের চোখে পড়েছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান ট্রাক্ট সোসাইটি' প্রকাশিত ৬৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ১৬টি পত্রের মধ্য দিয়ে বাইবেল ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্মের সত্যতাবোধক প্রমাণ বিবেচনা করে কোন শাস্ত্র ঈশ্বর দত্ত, আর কোনটা নয় বলা হয়েছে। খুড়ো রাধাগোবিন্দ ও ভাইপো হরিনারায়ণ এই দুই পত্রলেখকই বাইবেল ও 'সত্যধর্ম' অনুরাগী হওয়ায় আলোচনা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। পুস্তিকাটির ফর্মে বৈচিত্র্য থাকলেও, বিষয়বস্তু সেই গতানুগতিক—হিন্দু দেবতার কুৎসা, হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দাবাদ, বাইবেল মাহাত্ম্য !

(ঙ) কিছু অংশ প্রবন্ধধর্মী গদ্যে ও কিছু অংশ প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে বা পদ্যে রচিত : এই রীতিতে রচিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা' (১৮৩০), 'খ্রীষ্টের আশ্চর্য ক্রিয়া' (৬ সং, ১৮৩৭), 'পরের পরিত্রাণ চেষ্টা করা খ্রীষ্টীয়ানদিগের উচিত' (১৮৩৭) ইত্যাদির নাম করতে পারি। এগুলির গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ কোনোটিই উল্লেখযোগ্য নয়।

(চ) খ্রীষ্টগীতি : বাংলায় প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করে জনবহুলস্থানে মিশনরিরা তা গান করতেন। কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান, টমাস প্রভৃতি ধুরন্ধর পাদরি থেকে আরম্ভ করে কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বসু পর্যন্ত এ জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'গীত পুস্তক' (১৮২৬), 'ধর্মগীত' (১৮৪৬) প্রভৃতি এ জাতীয় গানের সংকলন গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে। খ্রীষ্টগীতিগুলি ভাব, ভাষা কোনোদিক দিয়েই বিশেষ উল্লেখের দাবি করতে পারে না। ৪৭টি প্রার্থনাসঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ 'গীত' (২য় সং, ১৮৩৫) থেকে একটি গানের ৪টি লাইনই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট :

'পালনের কর্তা আছেন জগতে ঈশ্বর
কিছুর অভাব কভু না হইবে আমার।
তৃণযুক্ত স্থানে শয়ন করান আমার
স্রোত জলের নিকটে চরাণ নিরন্তর'

[৩ সংখ্যক গীত]

খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রচারের কাজে 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস', 'চর্চ মিশনরি প্রেস', 'দি ক্যালকাটা খ্রীশ্চান ট্রাক্ট এ্যাণ্ড বুক সোসাইটি', 'ভার্নাকুলার কমিটি অফ দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীশ্চান নলেজ' ও 'বিশপ কলেজ প্রেস'ই অগ্রণী। এদের সকলের মধ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল মার্চ, ১৮২৩-এ প্রতিষ্ঠিত 'দি ক্যালকাটা খ্রীশ্চান ট্রাক্ট এ্যাণ্ড বুক সোসাইটি'র। মে, ১৮২৩-এ সোসাইটি প্রথম ট্রাক্টটি প্রকাশিত হয়।[২৫] এখান থেকে প্রকাশিত অনেক পুস্তিকা মিশনরি স্কুলে পাঠ্য ছিল। ১৮২৬-৫৬-র মধ্যে সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা ট্রাক্ট ও গ্রন্থের মোট প্রচার সংখ্যা ২৭০,৫৬২৩।[২৬] সোসাইটি এইপর্বে

২৫ *'The First Report of the Cal. Christian Tract & Book Society'*, (Cal, 1828).

২৬ *'Catalogue of the Christian Vernacular Literature in India'* (1870), J. Murdoch, P. 14.

কমপক্ষে খ্রীষ্টমাহাত্ম্যসূচক ১৩৮টি গ্রন্থ ও ৭৮টি ট্রাক্ট প্রকাশ করে।[২৭] এইসব ট্রাক্টগুলি বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হত। যেমন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি প্রকাশিত ১১টি ট্রাক্টের মধ্যে রেভাঃ পীয়ার্স লিখিত ২৪ পাতার 'সত্য আশ্রয়' নামক ট্রাক্টটি ১১টি সংস্করণে ১৬০,০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। সোসাইটির আর কোনো ট্রাক্ট অবশ্য এত অধিক সংখ্যায় ছাপা হয় নি।

আগেই বলেছি, বাংলায় খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান এই ত্রয়ীর যোগাযোগে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে শ্রীরামপুর মিশন এ বিষয়ে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্যপর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কমপক্ষে ৩৬টি ট্রাক্ট ও ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ট্রাক্ট সোসাইটির ট্রাক্টগুলির মতো এগুলিও প্রচুর সংখ্যায় ছাপা হত। যেমন মার্শম্যানের লেখা ৮ পাতার 'জগন্নাথ' পুস্তিকাটি ১৮২৯-৪১-র মধ্যে কয়েকটি সংস্করণে ১২,০০০ কপি ছাপা হয়। কিংবা ওয়ার্ড ১৮৩১-২-এ পীতাম্বর সিংহের যে জীবনী লেখেন, তাও ১৮৩৭-এ দ্বিতীয় সংস্করণে ১০,০০০ কপি ছাপা হয়। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান ছিলেন নামকরা হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী, কাজেই তাঁদের এইসব পুস্তিকায় কি ধরনের মনোভাব প্রতিফলিত সহজেই বোঝা যায়!

'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট মিশন'-এর উদ্যোগে আমাদের আলোচ্য পর্বে অন্তত ৩টি ট্রাক্ট ও ১টি গ্রন্থ ('আউটলাইনস্ অফ খ্রীশ্চান থিওলজি', জে. ওয়েঙ্গার) প্রকাশিত হয়। 'লণ্ডন মিশনরি সোসাইটি', 'ক্যালকাটা ট্রাক্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার আগে বেশ ক'টি বাংলা ট্রাক্ট ও গ্রন্থ প্রকাশ করে। মার্ডক তাঁর ক্যাটলগে সোসাইটি প্রকাশিত যে ২৯টি পুস্তিকার নামোল্লেখ করেছেন, তার একটি ছাড়া (লাইফ অফ্ রেভাঃ সি. পিফার্ড, ১৮৪২) সবকটিই আমাদের আলোচ্য পর্বের পূর্ববর্তী। 'চর্চ মিশনরি প্রেস'ও আলোচ্যপর্বে অন্তত ৩টি পুস্তিকা প্রকাশ করে। 'ভার্নাকুলার কমিটি অফ দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীশ্চান নলেজ'ও এ বিষয়ে পেছিয়ে রইল না। 'বিশপ কলেজ প্রেস' থেকেও ১৮২৬-৫৬-র মধ্যে খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক অন্তত ৪০টি গ্রন্থ প্রকাশ পেল। সবারই এক কথা, খ্রীষ্ট ছাড়া মুক্তি নেই!

---

২৭ ১৮২৬-৫৬-র মধ্যে সোসাইটি প্রকাশিত গ্রন্থ ও ট্রাক্টগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দ্র. মার্ডকের পূর্বোক্ত ক্যাটালগ, পৃ. ১৪-২১; ও লং-এর ক্যাটালগ, পৃ. ৬৮৯-৬৯৮।

বাংলায় খ্রীষ্টমাহাত্ম্য রচনায় পর্তুগীজ মিশনরিরাই পথ প্রদর্শক। ১৭/১৮শ শতাব্দী থেকেই তাঁরা এ বিষয়ে রীতিমতো সক্রিয়। বাংলায় খ্রীষ্টমাহাত্ম্যমূলক পুস্তিকাগুলির অধিকাংশ লেখকই ছিলেন বিদেশী খ্রীষ্টান। এইসব বিদেশী খ্রীষ্টান লেখকদের মধ্যে শ্রীরামপুরের কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান ছাড়াও রবিনসন, লসন, কীথ, ইয়েটস, চেম্বারলেন, পীয়ের্স, উইলিয়মসন, ওয়েঙ্গার, টাউনলে, পীয়ার্সসন, ওসবর্ণ, জে. মুর, স্যাণ্ডি, জে. আলেকজাণ্ডার, এ. ডালাস, জি. মাণ্ডি, জি. জর্জলি, মিসেস ম্যলেন্স, জে. লং ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব বিদেশী খ্রীষ্টান লেখকরা লোকসমক্ষে খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বাংলা শিখেছিলেন, খ্রীষ্টের বাণী বাংলার গ্রাম শহরে ছড়িয়ে দিতে কলমও তাঁরা ধরেছিলেন। কিন্তু এঁদের অনেকেরই বাংলা ভাষার গতি, এর অন্তর্নিহিত শক্তি, জটিলতা, রহস্য ইত্যাদি বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের অভাব থাকায়, রচনা অনেক স্থলেই নিতান্ত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেই এ কথা বলছি। অন্যদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, বাংলাভাষাপ্রেমিক কেরী সাহেবের ভাষাও, দেশীয় পণ্ডিতদের প্রচুর সাহায্য সত্ত্বেও, আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে স্থানে স্থানে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। এইসব কারণে সাহেব খ্রীষ্টানদের লেখা এইসব পুস্তিকাগুলির ভাষাকে 'খ্রীষ্টানী বাংলা' বা 'সাহেবী বাংলা' নামে অভিহিত করা হত। এ ধরনের পুস্তিকাগুলির গা থেকে যে 'সাহেব সাহেব গন্ধ' বেরোত, এ-বিষয়ে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একমত।

অবশ্য খাস বাঙালীরাও এ সময়ে যে খ্রীষ্ট-সাহিত্য রচনা করেছেন, তার ভাষাও এমন কিছু জলবত্তরল নয়—একথা মনে না রাখলে বিদেশী লেখকদের ওপর অবিচার করা হবে। উনিশ শতকে বাঙালীদের মধ্যে খ্রীষ্টমাহাত্ম্য রচনায় রামরাম বসুই পথ প্রদর্শক। ধর্মান্তরিত যে সব বাঙালী খ্রীষ্টান খ্রীষ্টমাহাত্ম্য-কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গিরি, তারাচাঁদ দত্ত, লালবিহারী দে, পীতাম্বর সিংহ, কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালাচাঁদ, শিমুয়েল পীর বক্স, বিপ্রচরণ চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ শীল, রাধানাথ শীল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাঙালীদের মধ্যে রচনার সংখ্যাধিক্যে, গুরুত্ববিচারে ও গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান প্রথম। খ্রীষ্টধর্মীয় বাঙালী তাত্ত্বিক কৃষ্ণমোহন তাঁর অন্যান্য প্রয়াস ছাড়াও 'উপদেশ কথা' (১৮৪০),

'সত্যস্থাপন ও মিথ্যানাশন' (১৮৪১), 'ধর্মজিজ্ঞাসুদের শিক্ষার্থ প্রশ্নোত্তর' (১৮৪২), 'ধর্মপোষক বক্তৃতা' (১৮৪৭), ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অবিরাম খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। 'দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীশ্চান নলেজ'-এর একজন উৎসাহী কর্মী হিসাবে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টমাহাত্ম্যমূলক কটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদও করেন। এসব দেখে তাঁর ভক্ত-জীবনীকার তাঁকে বাংলা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের জনকের গৌরব দিতে কুণ্ঠিত হন নি।[২৮]

আগেই বলেছি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার এইসব পুস্তিকা। সাহিত্য হিসাবে এগুলির মূল্য কতটুকু তা উহ্য রেখেও, জনসাধারণকে এগুলি কোনোদিক দিয়ে প্রভাবিত করতে পেরেছিল মনে হয় না। তবু সমসাময়িক তপ্ত ধর্মান্দোলনের একটুকু রেশ যেন অবশিষ্ট রয়ে গেছে এইসব প্রচার পুস্তিকায়। এইসব প্রচার পুস্তিকা পড়ে কেউ খ্রীষ্ট-অনুরাগী হয়ে উঠেছিল শোনা যায় নি, সমসাময়িক খ্রীষ্টবিষয়ক পত্রিকাগুলি ও 'ক্যালকাটা ট্রাক্ট সোসাইটি'র রিপোর্টও এ সম্পর্কে নীরব। প্রসঙ্গত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য:

'মিশনরি সাহেবদের ভজনালয়ে যে কেহ উপস্থিত থাকে তাহার বর্ণপরিচয় থাকুক আর না থাকুক মিশনরি সাহেবেরা তাহাদিগকে ধর্মপুস্তক গছাইয়া দেন তাঁহারা মনে করেন ঐ সকল ব্যক্তি স্ব ২ নিকেতনে গিয়া অবকাশক্রমে ঐ সকল পুস্তক পাঠ করত জ্ঞানী হইয়া বাটী হইতে আগমনপূর্বক তাঁহাদের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিবেক। কিন্তু যাহারা পুস্তক গ্রহণ করে তাহারা ধর্মালয় হইতে নিষ্ক্রমণ অথবা মিশনরি সাহেবের দৃষ্টিপথ অতিক্রমণ করিয়াই পুস্তক ছিন্ন করত সেই কাগজ আপনাদের সামান্য কার্য্যে বিনিয়োগ করে। অতএব আমাদের বিবেচনায় মিশনরি সাহেবদের স্বধর্মপ্রচার নিমিত্ত এই শেষোক্ত উপায় নিতান্ত বিফল।'[২৯]

পুস্তিকাগুলির মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টমাহাত্ম্যপ্রচার 'নিতান্ত বিফল' হলেও, এগুলি সমসাময়িক খ্রীষ্টধর্ম প্রচার অভিযানের ও সেই সূত্রে হিন্দুধর্ম, হিন্দু দেবদেবী ও অবতারদের ওপর অবিরাম কুৎসা বর্ষণেরই অপরদিক।

২৮ '*Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea* (1893), **R. C. Ghosha**, **P. 54.**

২৯ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ৩০. ৭. ১৮৫১, পৃ. ৩।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের এদেশীয় ধর্ম, রীতিনীতিকে আক্রমণ করে লেখা পুস্তিকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এদেশীয় জনগণের মধ্যে। পথ দেখালেন রামমোহন রায়। যুক্তিবাদী মন নিয়ে লেখা তাঁর 'দি প্রিসেপ্টস অব যেশাস' গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরিদের কি পরিমাণে ক্ষুব্ধ করেছিল শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তার পরিচয় বহন করছে।[৩০] পাদরি সাহেবদের কাছে তাঁর শাণিত কটি প্রশ্ন তাঁদের রীতিমতো বিচলিত করে তোলে।[৩১] 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ'-এ খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের প্রতি তাঁর কটাক্ষ রীতিমতো উপভোগ্য।

শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টীয় প্রচার অভিযান জোরদার হয়ে উঠলে একদিকে 'সংবাদ প্রভাকর' অন্যদিকে 'তত্ত্ববোধিনী' তাদের কলমকে কাজে লাগায়। 'সংবাদ প্রভাকর' 'ঈশুখ্রীষ্টী' 'হেঙ্গামায়' শঙ্কিত হয়ে পড়লেও, পরজাতিকে ধর্মভ্রষ্ট করা 'যাঁহারদিগের উপজীবিকা' সেইসব 'দুরাত্মা' মিশনরি-দের ছেড়ে কথা কয় নি।[৩২] প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত খ্রীষ্টধর্মকে 'নেড়া নেড়ীর ধর্ম' বলে অভিহিত করলেন। 'সংবাদ সুধাংশু'র পাদরি-সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি লিখলেন, হিন্দুরা ৩৩ কোটি দেবতার পূজা করেন বলে পাদরি সম্পাদক তার নিন্দা করতে পারবেন না, 'কারণ যাঁহারা পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ধর্মাত্মা ঈশ্বর, মেষ ঈশ্বর, ঘুঘু ঈশ্বর, ভূত ঈশ্বর মান্য করত রাশি রাশি ধর্মপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি লম্পটতার অপবাদ প্রদানপূর্বক তাঁহা কর্তৃক কুমারী গর্ভে সন্তান উৎপাদন স্বীকার করিতেছেন তাঁহারা তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা তুলিয়া উপহাস করেন ইহাই আশ্চর্য সেই উপহাস কেবল উপহাসের যোগ্যই হইবেক।'[৩৩] 'মিশনরি', 'ছদ্ম মিশনরি', 'দুর্ভিক্ষ' (১ম ও ২য় গীত) প্রভৃতি কবিতাতেও তিনি খ্রীষ্টধর্ম ও মিশনরিদের এক হাত নিয়েছেন।

অন্যদিকে 'তত্ত্ববোধিনী'ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধে যোগ দেয়। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ডাফ এ ব্যাপারে উল্লেখ্য ভূমিকা নেন। ১ চৈত্র, ১৭৬৬ শকে 'তত্ত্ববোধিনী' লিখল, আর তো সহ্য হয় না, মিশনরিদের দৌরাত্ম্য এখন 'সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত!' দেশবাসীকে 'নির্লজ্জ মিশনরিদের'

৩০ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ফেব্রুয়ারি, ১৮২০, পৃ. ২৩-৩১ ; ও মে, ১৮২০, পৃ. ১৩৩-৯।

৩১ অগস্ট, ১৮২১-এর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় (পৃ. ২৫২-৭) প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়।

৩২ 'সংবাদ প্রভাকর', ৩৯০০ সংখ্যা, ২০. ১২. ১৮৫০।

৩৩ 'সংবাদ প্রভাকর', ৪০১২ সংখ্যা, ৩০. ৪. ১৮৫১।

কুহকজাল ছিন্ন করার আহ্বান জানাল পত্রিকাটি। কখনও বা খ্রীষ্টধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখাল, 'খ্রীষ্টীয়ধর্ম নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ভ্রান্তিমূলক ধর্ম।'[৩৪] রীতিমতো ধর্মযুদ্ধ আর কি। 'সংবাদ ভাস্কর', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সংবাদ রসরাজ', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', 'সংবাদ রসসাগর', 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্মবিরোধী পত্রিকাগুলিও চুপ করে বসে রইল না। ২৫. ১০. ১৮৪৯-এ 'সম্বাদ ভাস্কর' পাদরি সাহেবদের কটাক্ষ করে লিখল :

'খ্রীষ্টীয়ান ধর্মে কোন ইন্দ্রিয়ের সুখ নাই কেবল রাজধর্ম ভাবিয়া কয়েকটি হিন্দু বালক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাহারদিগের আশা ছিল গাড়ি চড়িবে বাড়ী পাইবে, বিবি সম্ভোগ করিবে, সাহেব হইয়া স্বদেশীয় শত্রুগণকে ডেমরাস্কেল বলিবে, চাবুক মারিবে, ইহার কিছুই হয় নাই, বাটীতে যাহা আহার করিত, এইক্ষণে তাহাও পায় না। খ্রীষ্টীয়ান ধর্মে এত কষ্ট স্বীকার করিতে কে যাইবে, অতএব পাদরি সাহেবেরা অহঙ্কার করিবেন না। তাহারদিগের উপদেশে হিন্দুরা পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করিতেছেন···।'

শুধু এইসব পত্রিকাগুলিতেই নয়, খ্রীষ্টান মত খণ্ডন করার জন্য এ সময় বাঙালীরা ব্যগ্র হয়ে উঠে ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব গ্রন্থকার বাইবেলের দোষ দেখিয়েছেন, তাঁদের গ্রন্থের সার-সংগ্রহ করে মাসে মাসে এক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য এদেশের লোকের আনুকূল্য প্রার্থনা করে। হিন্দু-বালকেরা যাতে মিশনরিদের 'ভ্রান্তিমূলক যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্যে' মুগ্ধ হয়ে খ্রীষ্টধর্মে প্রবৃত্ত না হয়, তাই ছিল 'এক্সট্রাকটস্ কনসর্নিং ক্রিশ্চিয়ানিটি' নামক চার আনা মূল্যের এই মাসিক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য। জুলাই, ১৮৫২-তে এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী এই অভিনব মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রশংসা করে (হিন্দু) 'ধর্মের প্রতি উপদ্রব আর সহ্য হয় না' বলে মন্তব্য করেন।[৩৫] অগস্ট, ১৮৫২-এ এই মাসিক পুস্তকের দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে জনৈক ব্যক্তি তা হরেকৃষ্ণ আঢ্যের স্কুলে দিতে গেলে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ন্যাস সাহেব তাঁকে বেত মেরে অভ্যর্থনা করেন।[৩৬] মাসিক পুস্তিকাটি খ্রীষ্টানদের কতখানি বিচলিত করেছিল ঘটনাটি তারই প্রমাণ।

---

৩৪ 'ভারতবর্ষীয় লোকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম কেন অবলম্বন করে', 'তত্ত্ববোধিনী', ১৩৪ সংখ্যা, ১ আশ্বিন, ১৭৭৬ শক।

৩৫ 'সংবাদ প্রভাকর', ৪৩৮৬ সংখ্যা, ২২. ৭. ১৮৫২।

৩৬ ঐ, ৪৪২২ সংখ্যা, ৩. ৯ ১৮৫২।

খ্রীষ্টধর্মবিরোধী এই ধরনের অন্তত ৭টি মাসিক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ২৮. ১২. ১৮৫৪-এ 'সংবাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দু'বছর এর প্রচার বন্ধ থাকার পর অতি আবশ্যকীয় বোধ করে তা পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়। ঐ বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, 'আর বঙ্গভাষায় রচিত উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও উহার সঙ্গে প্রকাশ হইবেক।' বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজি এবং বাংলা দু'ভাষাতেই বাঙালীরা এই সময় তাদের খ্রীষ্টবিরোধী মনোভাব প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় নি।

খ্রীষ্টধর্মবিরোধী পূর্বোল্লিখিত মাসিক পুস্তকের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও প্রকাশক ছিলেন দুর্গাচরণ গুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথের ছেলেদের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী দুর্গাচরণ গুপ্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দু'খণ্ডে মিশনরিদের আতঙ্কস্বরূপ টম পেনের 'এজ অব রীজন' প্রকাশ করেন। বইটির জনপ্রিয়তা ১৮৫৬ সালেও বজায় ছিল। খ্রীষ্টধর্মের ওপর আক্রমণ বলে কোনো ইউরোপীয় বা ইউরেশীয় কম্পোজিটর বইটি কম্পোজ করতে অস্বীকার করায়, হিন্দু কম্পোজিটরদের সাহায্যে তা মুদ্রিত করতে হয়।[৩৭] বইটির আদর না থাকলে প্রকাশক নিশ্চয় এত কষ্ট করতেন না। খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী প্রচার অভিযানে বাঙালীদের একটি বড় হাতিয়ার ছিল টম পেনের বইটি। ১৮৩২-এ পেনের বইটির অনুবাদ সম্ভবত 'সংবাদ প্রভাকরে' স্থান পায়। ১৮৩৪-এ মুখ্যত পেনের 'এজ অব রীজন'-এর অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী পুস্তিকা প্রকাশ পায়।[৩৮]

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্যক্তি নানা যুক্তির সাহায্যে খ্রীষ্টধর্মের 'অলীকত্ব নিষ্পন্ন' করে এক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আনুকূল্য প্রার্থনায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় পাঠান। স্বদেশানুরাগী দেবেন্দ্রনাথের এ ব্যাপারে সাহায্য করা কর্তব্য বলে 'সংবাদ প্রভাকর' মত প্রকাশ করে।[৩৯] শেষপর্যন্ত পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমরা জানি না। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জনৈক হিন্দু' 'খ্রীষ্টধর্মের স্বপক্ষীয় সাক্ষ্য সম্পর্কে মন্তব্য' নামে একটি পুস্তিকায় খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করেন।

খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করে এইসময় বাঙালীরা ইংরেজিতে যেসব পুস্তিকা রচনা

৩৭ 'ক্যালকাটা লিটরারি গেজেট', ২. ২. ১৮৫৬, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর' গ্রন্থে উল্লিখিত, পৃ. ৫৫।

৩৮ '*A Descriptive Catalogue of Bengali Works*' (1855), J. Long, P. 694.

৩৯ 'খ্রীষ্টীয় ধর্মবিরুদ্ধ গ্রন্থ', 'সংবাদ প্রভাকর', ৪১১২ সংখ্যা, ১. ১. ১৮৫২।

করেছিল, তার মধ্যে কৈলাসচন্দ্র বসুর *'Christanity ? What is it ?'* বা শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের *'Rational Analysis of the Gospel'* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সময় 'শ্রীযুক্তবাবু কালীকুমার দাসও খ্রীষ্টধর্মের পর্যালোচন বিষয়ে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী এইসব পুস্তক প্রকাশকে স্বাগত জানিয়েও এর দ্বারা মিশনরি কাজের আদৌ কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এই প্রশ্ন তোলে। প্রস্তাবলেখক খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হলে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, বিনামূল্যে খ্রীষ্টধর্ম বিরুদ্ধ গ্রন্থ বিতরণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'এই সমস্ত উপায় দ্বারাই খ্রীষ্টানদের অভিষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।'[৪০]

সবদিক বিচার করে বলতে পারি, যে ভাষায় ও সুরে মিশনরিরা হিন্দুদের আক্রমণ করতেন, সংখ্যা এবং কুৎসা দুদিক দিয়েই বাঙালীরা তার ধারে কাছে পৌছতে পারে নি। তবু, মিশনরিদের আক্রমণ যে একতরফা ছিল না, বাঙালীরাও যে সেযুগে প্রতি-আক্রমণ করেছিল, সাময়িকপত্রে ছড়ানো ছিটানো টুকরো টুকরো রচনা বা খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী এইসব পুস্তিকাগুলি তারই প্রমাণ।

(৩)

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য

ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন তাঁর ধর্মভাবনা প্রচারের জন্য চারটি উপায় অবলম্বন করেন: (১) কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক; (২) বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যপ্রকারে শিক্ষাদান; (৩) পুস্তকপ্রচার; (৪) সভা-সংস্থাপন।[৪১] পুস্তক-প্রচারের মধ্য দিয়ে ধর্মভাবনা বিস্তারের ক্ষেত্রে এদেশে মিশনরিরাই পথ-প্রদর্শক। রামমোহনের এ বিষয়ক প্রয়াস মিশনরি প্রভাবেরই ফল খ্রীষ্টান মিশনরিদের মতো ব্রাহ্মরাও অনেক সময় তাঁদের মতপ্রকাশক পুস্তিকাগুলি কম দামে বিক্রী করতেন।[৪২] রামমোহন শুধু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই নন,

৪০ 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ৩১. ১. ১৮৫৩।

৪১ 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৩।

৪২ 'তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য,' 'তত্ত্ববোধিনী', ১২ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৭৭১ শক, পৃ. ৮০; ও ১৫ সংখ্যা, কার্তিক, ১৭৭১ শক, পৃ. ১০৮।

তিনি ব্রাহ্ম-সাহিত্যেরও জনক। বাংলায় সম্ভবত তিনিই প্রথম একেশ্বরবাদী পুস্তিকা লেখেন।

ব্রাহ্মমত প্রকাশক বিভিন্ন পুস্তিকাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) ব্রহ্মসঙ্গীত; (খ) বৈদান্তিক মত পরিপোষক বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ; (গ) বৈদান্তিক মত পরিপোষক ও সেইসূত্রে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্মের তুলনায় ব্রাহ্মধর্মের ও উপাসনা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক পুস্তিকা ও পত্রিকা।

ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ রামমোহন। ১৮২৮-এ প্রকাশিত ৩২টি ব্রহ্মসঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁর যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত মনটি প্রতিফলিত। 'আত্মীয়সভা'র অধিবেশনে এই গানগুলি গাওয়া হত। তাঁর জীবিতকালেই বইটির দু'তিনটি সংস্করণ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরও তা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মের নিরকারত্ব, সংসারের অনিত্যতা, বৈরাগ্য, নির্বেদ ইত্যাদি সঙ্গীতগুলির মধ্যে ধ্বনিত। তাঁর ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি 'পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়নিমগ্ন মনকেও উদাসীন' করে তুলতে পারে বলে রামগতি ন্যায়রত্ন সার্টিফিকেট দিয়েছেন।[৪৩] তিনি প্রায় দেড়শ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাও রামগতি জানাতে ভোলেন নি। ১৮২৮-এ রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' থেকে শুরু করে ১৮৫৬ পর্যন্ত সময়কালে ব্রহ্মসঙ্গীতের যে সংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

(১) ব্রহ্মস্তোত্র (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত);

(২) ব্রহ্মগীত, ১৮৩৫, তত্ত্ববোধিনী সভায় গীত ৭২টি ব্রহ্মসঙ্গীতের সংকলন;

(৩) ব্রহ্মসঙ্গীতপুস্তক;

(৪) রামমোহন রায়ের গীতাবলি, কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত;

(৫) নির্গুণ স্তোত্র অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গীতসমূহ (ব্রাহ্মসমাজ, ১৭৬৫ শক), বিভিন্ন ব্যক্তি রচিত গানের সংকলন;

(৬) গীতাবলি, ১৮৪৬, রামমোহন ও অন্যান্যদের ৮২টি ব্রহ্মসঙ্গীতের সংকলন;

(৭) ব্রহ্মবিষয়ক গীতসমূহ, ১৭৭৫ শক, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালীন গীত ৭২টি ব্রহ্মসঙ্গীতের সংকলন।

৪৩ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (অন্ন সং, ১৩১৭), রামগতি ন্যায়রত্ন, পৃ. ২১১।

এছাড়াও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মাঝেমাঝেই ব্রহ্মসঙ্গীত মুদ্রিত হত যেমন, ১৭৬৬ শকের ১ কার্তিকের 'তত্ত্ববোধিনী'তে ১০টি, ১৭৬৭শকের ১ চৈত্রে ১টি, বা ১৭৭১ শকের ১ শ্রাবণে ৪টি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছিল।

রামমোহন ছাড়া আলোচ্য পর্বের অন্যান্য উল্লেখ্য ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতার মধ্যে কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরতন হালদার, গৌরমোহন সরকার, কালীনাথ রায়, নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। এছাড়া অজ্ঞাতনামা গীত রচয়িতাদের সংখ্যাও কম নয়। 'অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা'-এই গানটি ভৈরবচন্দ্র দত্তের রচনা জানার পর থেকে বিদ্যাসাগর নাকি তাঁকে 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে থাকেন।

এইসব ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে কটি পুরোপুরি সংস্কৃতে, অনেকগুলি এত বেশি তৎসম শব্দবহুল যে সংস্কৃত বললেই চলে। অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত মৌলিকতার স্পর্শশূন্য, সংস্কৃত ভাবেরই বাংলা রূপান্তর। অধিকাংশ ব্রহ্মসঙ্গীতই বৈরাগ্য, মানবজন্ম-দুরবস্থা ইত্যাদি অতিশয় নীরস তত্ত্বকথা প্রচারে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে অবশ্য কোনো কোনো গানে তত্ত্বকথাকে অতিক্রম করে সাহিত্যরস প্রকাশ পেয়েছে। রামমোহনের 'মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে' বা গৌরমোহন সরকারের 'কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি'-ইত্যাদির কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি।[৪৪]

ব্রাহ্মমত পরিপোষক যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৮২৬-৫৬) অনূদিত হয়েছিল, বক্তব্যের দিক দিয়ে সেগুলি মৌলিক নয়, রচনারীতিও খুব প্রশংসাযোগ্য কিছু নয়। এ ধরনের পুস্তকের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বর্মণের 'বেদার্থ-সার' (১৮৫০), আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'বেদান্তসার', 'ভগবতগীতা', 'অধিকরণমালা', 'পঞ্চদশী', 'হস্তামলক', পরমানন্দ ন্যায়রত্নের 'যোগবাশিষ্টসার' (১৮৪৮), কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের 'রামগীতা' (১৮৪৬), শঙ্কর আচার্যের 'বেদান্ত-কৌস্তুব্যাখ্যান' (১৮৫০), রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বেদান্ত কৌস্তুব্যাখ্যা' রামজয় তর্কালঙ্কারের 'বেদান্ত দর্পণ' (১৮৫৪) প্রভৃতি ছাড়াও 'বেদান্তসূত্র' (১৮৪৩), 'কঠোপনিষদ' (১৮৫০), 'ঋগেদ সংহিতা' ইত্যাদির নাম করিতে পারি। এ ধরনের পুস্তকের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্ম' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই ব্রাহ্মদের ধর্মগ্রন্থের অভাব পূরণের জন্য ঘণ্টাতিনেকের

---

৪৪ 'ব্রহ্মবিষয়ক গীতসমূহ' (তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭৭৫ শক), ৮ ও ৪৬ সংখ্যক গীত।

মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' রচনা করেন। এটির অনুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত, মূল অবলম্বন উপনিষদ, রচনা দেবেন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী 'ঈশ্বরপ্রসাদে' এবং উদ্দেশ্য 'ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি' রচনা। বইটি ব্রাহ্মদের মূল গ্রন্থ, যদিও সজীব ধর্ম কোনো পুস্তকে নেই বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

এই সময়ে প্রকাশিত বেশ কিছু গ্রন্থকে বৈদান্তিক মত পরিপোষক ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ব্রাহ্ম সাহিত্যের আক্রমণের চেহারাটা এই রচনাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই আক্রমণ একদিকে খ্রীষ্টান মিশনরি, অন্যদিকে পৌত্তলিক হিন্দুদের প্রতি বর্ষিত। সাকার উপাসনার অসারত্ব, নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, হিন্দু দেবদেবীর নিন্দাবাদ ও সেইসূত্রে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয়।[৪৫] রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে রামগোপাল রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, শঙ্কর আচার্য, ব্রজমোহন দেব, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুচরণ ধর, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, মধুসূদন তর্কালঙ্কার, নীলরত্ন হালদার, লোকনাথ বসু, শ্যামানাথ চতুর্ধুরীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এইসব গ্রন্থগুলিতে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানকে কি চোখে দেখা হত, তা দেখাতে ব্রজমোহন দেবের 'পৌত্তলিক প্রবোধ'[৪৬]থেকে একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। প্রাজ্ঞ-পৌত্তলিকের কথোপকথন ছলে লেখা ৫টি প্রকরণে বিভক্ত এই বইটিতে প্রাজ্ঞ পূজাকে 'ঘুষ' দেওয়া বলেই ক্ষান্ত হন নি, সুর আরও চড়িয়ে বলেছেন :

'তাঁহাকে জগতের কারণ ও বিশ্বের নিয়ন্তা ইত্যাদি প্রকার ভাবনা করিয়া উপাসনা কর্তব্য হয়, সুতরাং এইরূপ শ্রবণ মননকে তাঁহার উপাসনা জানিবে, কিন্তু আইস তুমি বইস তুমি বস্ত্র ও অঙ্গুরি প্রভৃতি গ্রহণ কর, পুষ্পের আঘ্রাণ লও, আহার কর, পশ্চাৎ বিদায় হও, এই রূপ খেলা যাহাকে তোমরা উপাসনা কহ, সে পুত্তলিকার উপাসনা বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা নহে।'[৪৭]

শেষে অবিকল খ্রীষ্টান পাদরিদের সুর নকলকরে বলেছেন, 'অতএব তোমরা

৪৫ গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দ্র. লং-এর পূর্বোক্ত ক্যাটালগ, পৃ. ৭০৮-৭১০।

৪৬ প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থটির নাম ছিল 'পৌত্তলিক মুখচপেটিকা'। পরিবর্তিত নাম 'পৌত্তলিক প্রবোধ'।

৪৭ 'পৌত্তলিক প্রবোধ' (তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭৬৮ শক), ব্রজমোহন দেব, পৃ. ২৬-৭।

আমারদিগের দয়ার পাত্র হও কিন্তু দ্বেষের যোগ্য নহে, পুনর্বার কহিতেছি পুত্তলিকা খেলা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধা কর।'

এই সব পুস্তিকাগুলির সাহিত্যমূল্য কতখানি আছে সন্দেহ। অধিকাংশ পুস্তিকাই অতিক্ষুদ্র এবং নীরস গদ্যে রচিত। এইসব পুস্তিকায় ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় আলোচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত কচিৎ আমাদের চোখে পড়েছে।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একদিকে যেমন বিভিন্ন পুস্তক রচনা করে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের' আনুকূল্য করছিলেন, অন্যদিকে ছিল তাঁদের মত-প্রকাশক একাধিক পত্রপত্রিকা, এবং এখানে ওখানে গড়ে ওঠা নানা সভা-সমিতি। আমাদের আলোচ্য পর্বে ব্রাহ্মমত পরিবেশক অন্তত ৩টি পত্রিকা প্রকাশ পায়। 'তত্ত্ববোধিনী' (অগস্ট, ১৮৪৩), 'সত্যসঞ্চারিনী পত্রিকা' (অগস্ট, ১৮৪৬), ও 'সত্যজ্ঞানসঞ্চারিনী পত্রিকা' (এপ্রিল, ১৮৫৬)—এই তিনটি ব্রাহ্ম পত্রিকার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী'র শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী। একেশ্বরবাদী মত প্রচার ছাড়াও খ্রীষ্টধর্ম অভিযানের বিরুদ্ধে 'তত্ত্ববোধিনী'র বিশেষ ভূমিকার কথা আগে বলে এসেছি। এছাড়া পৌত্তলিক উপাসনার নিন্দাসূত্রে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতেও পত্রিকাটির উৎসাহের অভাব ছিল না।[৪৮] সেজন্য পত্রিকাটিকে অনেকে প্রীতির চোখে দেখত না। এমনকি এযুগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' গ্রহণ করলেই 'নাস্তিক পাষণ্ডাদি দুর্নাম' জুটত। ধর্মীয় গোঁড়ামিহীন অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় পত্রিকাটির মাসিক প্রচার সংখ্যা ৭০০ পর্যন্ত উঠলেও, দেবেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও অন্যান্যদের ধর্মোপদেশমূলক রচনার মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি নিরাকার উপাসনার জয়ধ্বনি চালিয়ে যেতে থাকে। আবার কখনও বা 'একমেবাদ্বিতীয়' ঈশ্বরের বদলে তাঁর বহুপ্রকার মূর্তি ও রূপ কল্পনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখে:

'যিনি নিরবদ্য নিরঞ্জন তাঁহাতে লোকেরা মানবীয় স্বভাবের আরোপ

৪৮ 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত এ ধরনের কটি লেখা:
১৫ সংখ্যা, ১ কার্তিক, ১৭৬৬ শক—সাকার উপাসনার সমালোচনা;
১৭ সংখ্যা, ১ পৌষ ১৭৬৬ শক—কাল্পনিক ধর্মের সমালোচনা ও সেই সঙ্গে পরব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দান;
২৭ সংখ্যা, ১ কার্তিক, ১৭৬৭ শক—পৌত্তলিক উপাসনার নিন্দা ও সেইসঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; যিনি কেবল ভক্তিরূপ সুগন্ধ সহকারে প্রীতি পুষ্প দ্বারা পূজনীয় হয়েন, সামান্য পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা লোকেরা তাঁহার পূজা করিতে রত হইয়াছে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে।'[৪৯]

(৪)

হিন্দু রক্ষণশীলতা ও বাংলা সাহিত্য

এইরকম নানাবিধ আক্রমণের সম্মুখীন হিন্দুধর্মের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রথম প্রতিক্রিয়াকে বলতে পারি সামাজিক প্রতিক্রিয়া, যার চূড়ান্ত নিদর্শন মেলে 'ধর্মসভা'য়—সতীদ্বেষীদের সঙ্গে আহার ব্যবহার বন্ধের ফরমান জারিতে, কিংবা সমাজ থেকে বহিষ্কারে।

হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার দ্বিতীয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় সমসাময়িক সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। এই প্রয়াসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগে সনাতন হিন্দুধর্মের পরিপোষক প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন, এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর বা বিভিন্ন হিন্দু তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য-কীর্তন। এই সময়ে রচিত কিছু গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা—অনেক সময় অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে লেখকেরা তা প্রতিপন্ন করেছেন। এইসব ধর্মীয় পুস্তকের মাহাত্ম্য বজায় রাখার জন্য 'ধর্মসভা'র সম্পাদক গোঁড়াহিন্দু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা অতিযত্নে তুলট কাগজে ব্রাহ্মণ-কম্পোজিটর দ্বারা মুদ্রিত করেছিলেন বলে শোনা যায়। হিন্দু-ধর্মের আত্মরক্ষাকল্পে প্রচারিত এইসব গ্রন্থের পুনঃপ্রচারের পেছনে কোন মনোভাব কাজ করেছিল, তা এ থেকেই বোঝা যাবে।

আমাদের আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত সনাতন হিন্দুধর্মের পোষক বহু পৌরাণিক, বৈষ্ণব ও শাক্ত গ্রন্থের নাম আমরা লং-এর পুস্তক তালিকায় পাই।[৫০] এই সময় প্রকাশিত বেশিরভাগ বই-ই হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত। ৩০. ১. ১৮৩০-এর 'সমাচার দর্পণে' 'গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক' সম্পর্কিত যে সংবাদ পাই,

৪৯ 'ধর্মতত্ত্ববিবেক', 'তত্ত্ববোধিনী', বৈশাখ, ১৭৭৬ শক, পৃ. ১১

৫০ লং-এর পূর্বোক্ত ক্যাটালগ, পৃ. ৭০১-৮।

তাতে দেখি 'সমাচার দর্পণে'র তালিকা অনুযায়ী ১৮২৯-এ বাংলা ভাষায় ছোট বড় ৩৭টি পুস্তক প্রকাশিত হয়। আর 'ঐ ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্মসংক্রান্ত'—তাও জানাতে দর্পণকার ভোলেন নি।[৫১]

এই পর্বে প্রকাশিত হিন্দুধর্মের পোষক গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি পূর্বতম ভক্তিবাদী গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন (যেমন রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি), কোনোটি বা ঐ গ্রন্থগুলির অংশবিশেষের ওপর ভিত্তি করে লেখা, কোনোটি আবার আরাধ্য দেবতার অসংখ্য নামতালিকা বা নিছক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন (যেমন অষ্টোত্তর শতনাম, গঙ্গামাহাত্ম্য, শিবস্তব, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, কালী কৈবল্যদায়িনী, গোপাল স্তোত্র, হরিভক্তি রসামৃত, বিষ্ণুর সহস্র নাম ইত্যাদি)। এছাড়াও এই পর্বে বৈষ্ণবরা তাঁদের কটি ধর্মগ্রন্থ(গীতগোবিন্দ, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদি) বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এইসব গ্রন্থগুলি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের উত্তপ্ত ধর্মীয় পরিবেশে নিরুত্তাপে প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো বাদ-প্রতিবাদ বা জটিলতার জন্ম এগুলি দেয় নি, বা কোনো বিতর্কেরও সৃষ্টি করে নি। এই ধরনের গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলার রক্ষণশীল ধনী সম্প্রদায়, এগুলির পাঠক বা শ্রোতা—বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এইসব গ্রন্থগুলির অধিকাংশ লেখকই অজ্ঞাতনামা। বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর আচার্য, জয়নারায়ণ ঘোষাল, দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতাদের নাম আজকের দিনে সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও মুছে গেছে। কারণ গতানুগতিক পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত এইসব গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য বলতে গেলে কিছুই নেই। বইগুলি নিতান্ত চর্বিতচর্বণ, পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতেই নিঃশেষিত। তবু, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বহুনিন্দিত ও বহুসমালোচিত সনাতন হিন্দুধর্মের সচল অস্তিত্বেরই এটি অন্য দিক।

আগে বলেছি, এই সময় একদিকে যেমন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ, দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন চলছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন পুস্তকের মধ্য দিয়ে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্ম ও তার আচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারের মাহাত্ম্য, পৌত্তলিকতা ও সাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণাও ছিল অব্যাহত। এ ধরনের বই-এর মধ্যে কাশীনাথ বসুর 'শ্রাদ্ধ মাহাত্ম্য' ও 'দর্শন দীপিকা' (১৮৪৮), রাধামাধবের 'পাষণ্ড দলন', হরিনারায়ণ গোস্বামীর 'হিন্দুধর্মচন্দ্রোদয়', গৌরীকান্তের 'বিপ্র-

৫১ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৬।

ভক্তিচন্দ্রিকা' (১৮৩২), 'জ্ঞানার্জন' (১৮৩৯), 'মোহনাশক চন্দ্রিকা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিরাগ যখন ক্রমবর্ধমান, ঠিক সেই সময় এই গ্রন্থগুলিতে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার দ্বিতীয় সাহিত্যিক প্রয়াসকে বলতে পারি আক্রমণাত্মক। হিন্দুধর্মের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকরা ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও নাস্তিকদের আক্রমণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশ করে যে সব গ্রন্থ বা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলোকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এই আক্রমণগুলির অধিকাংশই সাময়িকতার দ্বারা চিহ্নিত। সাময়িকপত্রেই এগুলির জন্ম, এবং বলতে বাধা নেই, সুস্থ শালীন ধর্মবিচারের বদলে অনেক-ক্ষেত্রেই পাই অশালীনতা ও অসংযম। সাময়িকপত্রের নাম না জানা বিভিন্ন লেখক হিন্দু ধর্মতত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা পরধর্মের প্রতি আক্রমণেই অধিক উৎসাহী ছিলেন।

আলোচ্য পর্বে (১৮২৬-৫৬) সনাতনধর্মের পরিপোষক অন্তত ১০ খানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে ধর্মসভা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮০০। ১৮২৩-এ ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী ও পৌত্তলিকতার সমর্থক হিসাবে 'সংবাদ তিমিরনাশক' আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩১-এ রামচন্দ্র পালের সম্পাদনায় 'নাস্তিকহর্ত্তা' হিসাবে 'সংবাদ রত্নাকরে'র আত্মপ্রকাশ। ১৮৩২-এ আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের আনুকূল্যে সনাতনপন্থী 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশিত হয়, পত্রিকাটির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬-এ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা উচ্ছেদ করে কৃষ্ণপূজা প্রচারের জন্য নন্দকুমার কবিরত্নের সম্পাদনায় 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' প্রকাশিত হলে, 'তত্ত্ববোধিনী' তার প্রচেষ্টাকে সাগরস্রোতরোধে বালির বাঁধের মতো উপহাসের কারণ বলে অভিহিত করে। 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক বিশ্বাস করতেন, 'হিন্দুধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই সত্য নহে', এবং সেই কারণেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরিদের সমালোচনায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্মের সমালোচনা এই পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই স্থান পেত।[৫২]

৫২ 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'য় প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্মবিরোধী কয়েকটি রচনা :
১৪১ সংখ্যা, ১৫ কার্তিক, ১২৫৮—তত্ত্ববোধিনী পত্র ও ব্রাহ্মধর্মের সমালোচনা ; →

পত্রিকা-সম্পাদক নন্দকুমার ধারাবাহিকভাবে 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'য় 'অথ সন্দেহ নিরসনং' নামক লেখায় শাস্ত্র অবলম্বন করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন ও পরমহংসোক্তিচ্ছলে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত এই লেখাটিতে, তিনি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্মকে তীব্র আক্রমণ করে 'হিন্দুধর্মের তুল্য কোন জাতীয় ধর্ম নহে' বলেছেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রক্ষণশীল মতবাহী 'দুর্জনদমন মহানবমী'র প্রকাশ। পত্রিকাটির রুচিহীনতা পীড়াদায়ক। ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান—এই দু'দলের প্রতিই পত্রিকাটি অপ্রসন্ন। পত্রিকাটির প্রকাশকালে ব্রাহ্মদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বিরোধ চরমে উঠলেও 'যে ব্রাহ্ম সেই খ্রীষ্টিয়ান' বলতে পত্রিকাটির বাধে নি। পৌরাণিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী কোনো কিছুর প্রতিই পত্রিকাটি প্রসন্ন ছিল না। বাইবেলের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম নিবারণের জন্য বাইবেলের প্রত্যেক প্রস্তাব খণ্ডন করে বাংলা-ইংরেজি পুস্তক লেখার প্রস্তাবও এতে স্থান পেত।[৫৩] ব্রাহ্মদের প্রতি আক্রমণ তো ছিলই। পত্রিকাটির ৭ম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত 'ব্রাহ্ম ও কর্মির কথোপকথন'-এ ব্রাহ্মধর্মের সমালোচনা চোখে পড়ার মতো। লেখাটিতে

'ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান তুল্য তুল্য অনুরূপ।
হিন্দুধর্ম মজাইতে দুই কাম কূপ॥'

ইত্যাদি পয়ার-পংক্তি লেখাটির মূল উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

'বিষ্ণুসভা'র মুখপত্র ব্রাহ্মবিরোধী 'হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়' (১৮৪৭), খ্রীষ্ট-ধর্মবিরোধী 'হিন্দুবন্ধু' (১৮৪৭), সনাতন হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশক 'ধর্মমর্ম-প্রকাশিকা' (১৮৫০), 'স্বধর্ম পোষণ করত, খ্রীষ্টধর্ম দোষণ' করার উদ্দেশ্য নিয়ে

১৪২ সংখ্যা, ৩০ কার্তিক, ১২৫৮—ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সমালোচনা ;
১৪৫ সংখ্যা, ১৫ পৌষ, ১২৫৮—ব্রাহ্মদের সমালোচনা ;
১৪৬ সংখ্যা, ২৯ পৌষ, ১২৫৮—ব্রাহ্মধর্মের তীব্র সমালোচনা ;
১৪৮ সংখ্যা, ৩০ মাঘ, ১২৫৮—'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের' মত যে বেদবিরুদ্ধ, তা দেখিয়ে ব্রাহ্মধর্মের সমালোচনা ;
১৪৯ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন, ১২৫৮—পৌরাণিকধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রাহ্মধর্মের নিন্দাবাদ ;
২য় কল্প, ১০ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র, ১২৬৩—ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সমালোচনা ;
ঐ, ১১ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন, ১২৬৩—ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সমালোচনা।

৫৩ 'দুর্জনদমন মহানবমী', ৭ম সংখ্যা, ৬. ৭. ১৮৪৭।

প্রকাশিত 'ধর্মরাজ' (১৮৫৩) প্রভৃতি সনাতন ধর্মপোষক সব পত্রিকাগুলিরই ভঙ্গি অল্পবিস্তর আক্রমণাত্মক।

হিন্দুধর্মের প্রতি নানাবিধ আক্রমণের এই যুগে পৌরাণিক হিন্দুধর্মও যে প্রতি আক্রমণ করেছিল, কঠোর ভাষায় ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদের ধিক্কার জানিয়েছিল, এইসব পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় আজও তার কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। সাহিত্য হয়ে উঠতে না পারলেও, তৎকালীন বাঙালীসমাজের একাংশের মনোভাবকে তা তুলে ধরেছে।

(৫)

নাস্তিকতা ও বাংলাসাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু তরুণ নিরীশ্বরবাদী হয়ে ওঠে, তা আগে বলে এসেছি। প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসহারা, ব্রাহ্মধর্মীদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় প্রচারে উৎসাহহীন এইসব তরুণদের অনেককেই জীবনে নানা বাধার মুখোমুখি হতে হয়। ১৮৩০-এ খ্রীষ্টান মিশনরি আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে বাঙালী তরুণ সমাজে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করে যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন—তাও বলে এসেছি।

এই নাস্তিকতার ধারায় ক্ষীণতম প্রতিফলন সমকালীন বাংলা সাহিত্যে আমাদের চোখে পড়ে নি। এ সম্পর্কিত দু'চারটি বিক্ষিপ্ত সংবাদই (যা কোনোক্রমেই সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত নয়) কেবলমাত্র সমকালীন সাময়িকপত্রগুলির পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য-শিক্ষিত নাস্তিক তরুণদের মনোভাব সমকালীন সাহিত্যে প্রতিফলিত হল না কেন? কারণ, একাধিক। প্রথমত, মুষ্টিমেয় এইসব শিক্ষিত তরুণদের যুক্তিনিষ্ঠা, অগতানুগতিক সাহসী আচরণের ক্ষমতা ইত্যাদি থাকলেও, সৃষ্টিক্ষমতা যাকে বলে তা ছিল কিনা সন্দেহ। নিজেদের ধর্মসম্পর্কীয় মনোভাবকে সাহিত্যের আঙিনায় আনার তাগিদ তাঁরা অনুভব করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তা করার উপযুক্ত ক্ষমতা বোধহয় তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, এইসব শিক্ষিত তরুণরা (যাঁদের অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র, এবং ডিরোজিও-শিষ্য) যে পরিমাণে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, সেই পরিমাণেই মাতৃভাষার প্রতি

অন্তত এই পর্বে উদাসীন। দুর্বল ও মর্যাদাশূন্য বাংলাভাষায় তাঁদের চিন্তাকে রূপ দেবার কল্পনা সম্ভবত তাঁরা করতে পারেন নি। ইংরেজিয়ানার সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকেই তাঁরা প্রাণের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজিতেও তাঁরা তাঁদের ধর্মচিন্তাকে ভাষা দিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তৃতীয়ত, নাস্তিকদের প্রতি এই সময় সমাজের মনোভাব অতি কঠোর ও নির্মম হওয়ায়, এই পর্ব আক্ষরিক অর্থে তাঁদের আত্মরক্ষার পর্ব। সাহিত্যসৃষ্টি করার মতো পরিবেশ তাঁরা পান নি, এবং সে রকম মানসিক অবস্থাও তাঁদের ছিল না। চতুর্থত, এইসব যুক্তিবাদী তরুণদের প্রথম যৌবনের মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোহভঙ্গ-জনিত হতাশা তাঁদের অনেককে গ্রাস করায় অনেকেই প্রথম যৌবনের ধারণা থেকে উত্তর যৌবনে বিচ্যুত হয়েছিলেন। স্বভাবতই পরিণত বয়সে চিন্তাধারার পরিবর্তনের জন্য তাঁরা তাঁদের প্রথম জীবনের ধারণাকে সাহিত্যে রূপ দিতে উৎসাহী হন নি। আমাদের অনুমান, সেকালীন উগ্র তরুণদলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণে'র পৃষ্ঠায় হয়তো তাঁদের এ ধরনের চিন্তাধারা স্থান পেয়েছিল, কিন্তু 'জ্ঞানান্বেষণ' বর্তমানে লুপ্ত, তাই আমাদের অনুমান, নিছক অনুমানই !

নাস্তিকদের ওপর বাঙালীসমাজের বিরূপতার কথা আগেই বলে এসেছি। ১৮৩১-এ 'নাস্তিক-হর্তা' হিসাবে 'সংবাদ রত্নাকরে'র প্রকাশে 'সমাচার চন্দ্রিকা' আনন্দ প্রকাশ করে। সল্টবোর্ডের দেওয়ান নীলরত্ন হালদার ১৮৫১-তে 'সর্বামোদতরঙ্গিণী'তে সব ধর্মের মর্ম যে পরমেশ্বরপোসনা, সর্বজীবে দয়া—ইত্যাদি অনেক কথা বলে 'নাস্তিকতাও রচিত' করেন। 'নাস্তিক প্রবোধ', 'নাস্তিক-নিরাস' নামে দু'একটি পুস্তিকাও এ সময় অনূদিত হয়েছিল।

যাঁরা নাস্তিক, তাঁরা তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে কিছু না বললেও, 'কস্যচিৎ পাষণ্ডশঙ্কায় সঙ্কুচিতস্য' ব্যক্তি ৩১. ৭. ১৮৪৫-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নাস্তিকদের মত-বিশ্বাস-যুক্তিকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। সনাতনীরা নাস্তিকদের মতবাদকে কি চোখে দেখতেন, তা তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। লেখাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো কঠিন :

'উক্ত বাবুরদের এবং অন্য ২ দেশ বিদেশীয়দিগের মধ্যে আর এক স্বতন্ত্র দল হয়, ইহাঁরা নাস্তিক নামে বিখ্যাত হন, ইহাঁরদের বিদ্যা বুদ্ধি সকলের উপর এক গুণ উচ্চ, তর্কসংগ্রামে তাঁহারদিগকে কেহ পরাভব করিতে পারেন না ইহাঁরা স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিংড়িয়া এই সকল কথা বাহির করিয়া লোকসকলকে বলেন যে

"পাপ পুণ্য, পরমেশ্বর" এই তিন কাল্পনিক শব্দ অবোধ প্রবোধের নিমিত্ত কোন সুবোধ কর্তৃক রচিত হইয়াছে, উক্ত শব্দাদির কোন নিগূঢ় অর্থ নাই, যাহা নাম ধাম ও স্বরূপের দ্বারা কিছুই নিরাকরণ হয় না, সে বস্তু মিথ্যা, যাহার প্রকাশ্য প্রমাণ কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর নয় সে বস্তু মিথ্যা, যাহা তর্কসংগ্রামে একেবারে সংহার হয় সে বস্তু মিথ্যা, অতএব এমত নিরাকৃতি, নিরর্থক, নিঃসার বস্তুকে কি প্রকারে স্থায়ী করিয়া পূজনীয় পদার্থ গ্রাহ্য করিয়া মান্য করা যাইবেক, এইরূপ বিতণ্ডা দ্বারা পরমেশ্বরীয় পদার্থ উড়াইয়া কহেন যে পৃথিবী আদির গতিবিধির নিয়মস্বভাব বশত সকলেই চলিতেছে, "যথা অগ্নির দাহন স্বভাব, বায়ুর চলাচল স্বভাব, মৃত্তিকার উর্বরতা স্বভাব, মেঘের বারিদান স্বভাব, ইত্যাদি এই সকল নিয়মের সহিত পরমেশ্বর কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখেন না, যেমত পূর্বাপর হইয়া আসিতেছে ও হইবেক" ইত্যাদি কহিয়া পুনরায় কহেন যে "অতএব মনুষ্যের বিশেষ কর্তব্য এই যে আপনাকে যথাসাধ্য সর্বদা সুখে রাখিতে চেষ্টা করে যেহেতু আত্মসুখাভিলাষ মনুষ্যের স্বভাব এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীস্থ সকলের নিয়ম সমভাবে চলিতেছে, যথা আত্মসুখের কারণ অন্যকে সুখী করিতে হইবেক নতুবা মনুষ্যসকলে বন্ধুবান্ধবীয় প্রেমশৃঙ্খল দ্বারা কদাচ একত্র হইয়া বদ্ধ থাকিত না, ইত্যাদি পৃথিবীর সকল নিয়ম ঐরূপ স্বভাববশত হইতেছে পরমেশ্বর যে এক পদার্থ লোকেরা কহিয়া থাকে তাহা সকলই অলীক ও ভ্রান্তি" এইরূপ ক্ষীণ কুতর্ক দ্বারা ইঁহারা অকথনীয় কথা সাব্যস্ত করিতে চাহেন, সম্পাদক মহাশয় এই সকল কতিপয় অল্পাশয় ক্ষীণ জাতি মনুষ্য নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় কুপথগামী হওত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেছে, হায় কি ভগবানের চমৎকার খেলা—'

(৬)

সতী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সতীদাহকে নিয়ে বাঙালীসমাজে ঝড় ওঠে। সচেতন জনমনে দেখা দেয় তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া। গোঁড়া রক্ষণশীলরা যুগপ্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। রামমোহন রায় বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো কিছু লোক-এ প্রথা বিরোধী হয়েও, আইনের সাহায্যে তা বন্ধ করতে চাইলেন না। পক্ষান্তরে

কিছু খ্রীষ্টান মিশনরি, কয়েকজন ইংরেজি পত্রিকা-সম্পাদক ও কিছু নাম না জানা বাঙালী অবিলম্বে এ প্রথা আইনের সাহায্যে রদ করতে চাইলেন।

সতীপ্রথা এইপর্বে বাঙালীসমাজকে চঞ্চল করলেও বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রতিফলন নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সহমরণের অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে রামমোহনের তিনটি বাংলা পুস্তিকা, রামমোহনের এ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে কালাচাঁদ বসুর আদেশে রচিত কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' ও ১৮৩০-এ প্রকাশিত সতীদাহ আবেদন ও আরজীর উত্তর সম্বলিত একটি বাংলা পুস্তিকা—মোট এই ৫ খানি পুস্তিকায় সতীদাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লং-এর পুস্তক তালিকায় সতীপ্রথার সমর্থনে রচিত 'সতীধর্ম' নামক একটি বাংলা পুস্তিকার উল্লেখ আছে, যদিও পুস্তিকাটির প্রকাশ-কাল কবে তা বলা হয়নি।[৫৪]

কিন্তু সতীপ্রথার মতো চাঞ্চল্যকর একটি আন্দোলন নিয়ে এত স্বল্পসংখ্যক পুস্তিকা রচিত হওয়া কিছুটা বিস্ময়কর। বিশেষ করে সতীপ্রথার দুই শিবিরের দুই প্রধান, রামমোহন আর ভবানীচরণ-দুজনেই যখন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের উল্লেখ্য লেখক! সতী বিষয়ক আলোচনা একরকম শাস্ত্রবিচার, আর তর্ক-বিতর্কেই সীমাবদ্ধ; রসসাহিত্যের পর্যায়ে একে কেউ উন্নীত করেন নি, বা তখনকার উত্তপ্ত পরিবেশে হয়তো তা করাও সম্ভব ছিল না। সতীপ্রথার বিরুদ্ধবাদী রামমোহন এ সম্পর্কে একাধিক পুস্তিকা রচনা করলেও, ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদনায় এবং 'ধর্মসভা'র একনিষ্ঠ সেবায় নিজের সব উদ্যমকে নিঃশেষ করে দেওয়ায়, বিষয়টিকে সাহিত্যের আঙিনায় আনার তাগিদ অনুভব করেন নি! বলতে বাধা নেই, ভবানীচরণ যদি শুধু 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় কলমবাজি না করে এ নিয়ে কোনো পুস্তিকা লিখতেন, তাহলে তিনি হয়তো এ আন্দোলনের সামাজিক দিকটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের জন্মলগ্নের জড়তা এই সময় সাহিত্যকে আশ্রয় করে থাকায়, গতানুগতিকের চর্বিতচর্বণেই তৃপ্ত এই পর্বের কবিসাহিত্যিকরা সমকালীন কোলাহল থেকে সযত্নে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও হয়তো গদ্যরচনায় অনভ্যস্ত অনেকে এ বিষয়ে কলম ধরতে দ্বিধা করেছিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত হয়। সতীপ্রথাকে নিয়ে সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলায় পুস্তিকা

৫৪ লং-এর পূর্বোক্ত বাংলা ক্যাটালগ, পৃ. ৬৮৪।

লেখেন। ২২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে কথোপকথনচ্ছলে সতীপ্রথার শাস্ত্রীয়তা আলোচিত। এর ইংরেজি অনুবাদটি ৩০. ১১. ১৮১৮-তে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। বিনামূল্যে বিতরিত এই পুস্তিকাটি সমকালে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। রামমোহনের পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদটি ২৪. ১২. ১৮১৮-এ গভর্নমেণ্ট গেজেট পুনর্মুদ্রিত করে। প্রসঙ্গত পত্রিকাটি মন্তব্য করে, হিন্দুশাস্ত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই সতী বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার নিরাপদ পথ। আর রামমোহনের পুস্তিকায় 'This appears to have been done with great assiduity, anxiety, and care, and consequence has been a decision hostile to the ancient custom.'[৫৫] এর পরের দিনের 'ক্যালকাটা জার্নালে' পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করা হয়, 'if anything is likely to influence the opinion or the practice of the Hindoos in this particular, nothing is more calculated to effect it than arguments drawn from their own sacred books to prove that it is not necessary to future happiness.'[৫৬] পরের দিন ২৬. ১২. ১৮১৮-তে 'সমাচার দর্পণ' পুস্তিকাটির স্থূল মর্ম প্রকাশ করে, সহমরণ বিষয়ে যথার্থ-বিচারে শাস্ত্রে যে কিছু পাওয়া যায় না, তার উল্লেখ করে। সমকালে রামমোহনের পুস্তিকাটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'। আলোচনাপ্রসঙ্গে বইটির বিষয়বস্তুর সারমর্ম দিয়ে ও রচয়িতার প্রচুর প্রশংসা করেও পত্রিকাটি মন্তব্য করে :

'There is no appeal made to their national honor, no attempt to kindle their indignation against a custom which reflects such disgrace on the character of the country, no endeavor to arouse all their feelings against a practice so repugnant to every principle of humanity; nor that we suspect for a moment that the benevolent individual who composed it, would have hesitated to employ such arguments, had he not been convinced of their complete inutility.'[৫৭]

৫৫ '*Government Gazette*', Vol. IV, No. 187, 24. 12. 1818.

৫৬ '*The Calcutta Journal*', Vol. 1, No. 25, 25. 12. 1818, P. 563.

৫৭ '*On the Burning of Widows*', 'The Friend of India', December 1818, P. 305.

বাংলায় সতীপ্রথার অতি প্রচলন, ৪টির মধ্যে ৩টি সতী যে জবরদস্তিমূলক, এ প্রথা যে শাস্ত্রবিরোধী এসব কথা বলে—সরকার এ প্রথা নিষিদ্ধকরণে উদ্যোগী হবেন বলে আশা সমালোচনাটিতে ধ্বনিত।

রামমোহনের আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রচুর শাস্ত্রোক্তি সম্বলিত শাস্ত্রবিচার মাত্র। নিবর্ত্তকের মতে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরোধী সতীপ্রথা 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা' ছাড়া কিছু নয়। নিবর্ত্তকের যুক্তি প্রবর্ত্তকের চেয়ে অনেক জোরালো হওয়ায় প্রবর্ত্তক শেষ পর্যন্ত নিবর্ত্তকের মত 'বিশেষভাবে' বিবেচনা করতে রাজী হয়েছে। পুস্তিকাটি যে উদ্দেশ্যমূলক, তা না বললেও চলে। ভাষা অনেকস্থলেই স্বচ্ছন্দ নয়—তবে এটির রচনাকাল ১৮১৮ মনে রাখলে ভাষার জটিলতা আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারি। প্রকাশের পর পুস্তিকাটি যে একটি দেশীয় সাময়িকপত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রদত্ত সংবাদ অবলম্বনে বিলাতের 'এশিয়াটিক জার্নাল' তা জানায়।[৫৮] দেশীয় সাময়িকপত্রটি 'সমাচার দর্পণ' নয়, গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' হলেও হতে পারে। যাই হোক, পুস্তিকাটির ব্যাপক প্রচারে ঘটনাটি সাহায্য করে।

১৮১৯-এ রামমোহনের পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করেন। কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা ২৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি রচনায় কাশীনাথ বহিরঙ্গরীতিতে রামমোহনকে অনুসরণ করেছেন। যদিও উভয়ের মনোভঙ্গির পার্থক্য গ্রন্থ-সূচনাতেই লভ্য। রামমোহন যেখানে গ্রন্থশীর্ষে 'ওঁ তৎসৎ' দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করেছেন, কাশীনাথ সেখানে শুধু যে, 'শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং' দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করেছেন তাই নয়, তাঁর পুস্তিকাটির সমাপ্তিবাক্য 'এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মণ্ডুক শ্রুতি প্রভৃতি আছে, তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়'—তাঁর রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। যাঁর মনোভাব এমন, তিনি যুগপ্রচলিত সতীপ্রথাকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন, সহজেই বোঝা যায়। পুস্তিকাটির সঙ্গে তার ইংরেজি তর্জমাও প্রকাশিত হয়। ১৮. ৯. ১৮১৯-এর 'সমাচার দর্পণে' এই নতুন পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই। কাশীনাথের পুস্তিকাটি নিছক শাস্ত্রবিচার, আদ্যন্ত শাস্ত্রোক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন, সহমরণের শাস্ত্র-প্রমাণ ও তার বঙ্গানুবাদের বাইরে লেখকের কোনো মৌলিকতা প্রকাশ পায়

৫৮ 'Bengali Journal', 'The Asiatic Journal and Monthly Register', July, 1819, P. 69.

নি। ১৮১৯-এর অক্টোবর সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় কাশীনাথের পুস্তিকাটির ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। সমালোচনার প্রথমাংশে কাশীনাথের বক্তব্যকে তুলে ধরার পর, এ প্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয় মৃত্যুঞ্জয়ের যুক্তি অবলম্বনে সমালোচক তা দেখিয়েছেন। সমালোচকের মতে অধিকাংশ মেয়েই যখন এ প্রথা পালন করে না, তখন এটিকে ধর্মীয় নীতিও বলা চলে না। পুস্তিকাটির আলোচনাসূত্রে অযৌক্তিক, অমানবিক ও অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথার বিস্তৃত আলোচনা রচনাটিতে স্থান পায়। এটি যে রামমোহনের পুস্তিকার প্রতি তীব্র আক্রমণ, তাও জানাতে সমালোচক ভোলেন নি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই সমালোচনাটি থেকে আমরা জানতে পারি, যারা এখনও এই বীভৎস প্রথা ত্যাগে অনিচ্ছুক, তাদের মধ্যে প্রচারের জন্য রামমোহন রায় এর একটি প্রত্যুত্তর রচনা করেছেন। শীঘ্রই পুস্তিকাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে, তিনি ইংরেজদের অনুগৃহীত করবেন বলে সমালোচক আশা প্রকাশ করেন।[৫৯]

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র অজ্ঞাতনামা সমালোচককে নিরাশ করেন নি রামমোহন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিশন প্রেস থেকে তাঁর 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশিত হলে, ৪. ১২. ১৮১৯-এর 'সমাচার দর্পণ' রামমোহনের সহমরণ বিষয়ে পুনর্বার বাংলায় পুস্তক করার বিবরণ দিয়ে, এর ইংরেজিও সমাপ্তির মুখে বলে খবর দেয়। ৩৩ পৃষ্ঠার এই বাংলা পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। অনুবাদটি রামমোহন 'মার্কুইস অব হেস্টিংস'কে উৎসর্গ করেন।

কাশীনাথ তাঁর পুস্তকে যেখানে অন্যমত 'অশাস্ত্র' কথা লেখেন, রামমোহন এই পুস্তকে তার উত্তর বিস্তৃতভাবে দেন। দেশাচারসিদ্ধ জিনিস শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় বলে কাশীনাথের মন্তব্যকে খণ্ডন করে রামমোহন উত্তর দেন, 'স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতকসকল দেশাচারবলেতে ধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না।' প্রত্যুত্তর দেবার সময় রামমোহনের নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি, যুক্তিনিষ্ঠা এবং সূক্ষ্ম পরিহাসরসিকতা পুস্তিকাটিকে স্বাদু করে তুলেছে। কাশীনাথের গ্রন্থে বিধায়ক স্ত্রীলোকের প্রতি যেসব দোষারোপ করেন (যেমন তাঁরা অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসঘাতী, সানুরাগা, ধর্মভয়হীন

৫৯ '*The Friend of India*', October, 1819, P. 483-4.

ইত্যাদি) রামমোহন তাঁর পুস্তিকায় দৃঢ়ভাবে তা খণ্ডন করেন। পুস্তিকাটির এই অংশ সম্পর্কে রামমোহন-অনুরাগী রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্যটি উপাদেয় :

'রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধহয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহেন। এই স্থলে রামমোহন রায় তাঁহার বরাঙ্গিণী মোয়াক্কেল-দিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন, এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না।'[৬০]

রামমোহনের শেষ আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে—'দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।' এই অংশটি ৩৬ বছর পরে রচিত বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকের শেষাংশের আবেদনকে স্মরণ করায়। সতী সম্বন্ধীয় সবকটি বাংলা রচনার মধ্যে ভাব, ভাষা, আন্তরিকতা ইত্যাদি দিক দিয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী। রামমোহনের গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও এই পুস্তিকাটি। পুস্তিকাটিতে কিভাবে সতীদাহ নিবারিত হতে পারে সে বিষয়ে রামমোহন একেবারেই নীরব। তা সত্ত্বেও তাঁর পুস্তিকাদুটি সতীপ্রথার দুর্বলতা তুলে ধরে, এবং এ প্রথার প্রতি অনেকের যুগসঞ্চিত শ্রদ্ধার মনোভাবে ফাটল ধরায়।[৬১]

১৮২৯-এ সতী সম্পর্কীয় রামমোহনের শেষ বাংলা পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয়' প্রকাশিত হয়। ১১ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি 'বিপ্রনামা' ও 'মুগ্ধবোধছাত্র' নামে দু'ব্যক্তির পত্রের উত্তরে লিখিত। পত্রগুলি সম্ভবত 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। সতীদাহ কাম্যকর্ম এবং সেই হিসাবে তা যে পালনীয় নয়, পুস্তিকাটিতে রামমোহন তাই দেখান। এতে রামমোহন পত্রলেখকদের সরাসরি আক্রমণ করে, মুগ্ধবোধছাত্র ও তাঁদের অধ্যাপক 'কিঞ্চিৎ লাভার্থী' হয়ে ধর্মলোপ করতে প্রস্তুত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন। তাঁরা উভয়েই শাস্ত্রের অন্যথা করে নিজেদের 'কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্মত্যাগিনী' বলতে প্রবর্ত হয়েছেন, কারণ 'স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে!' রামমোহনের এই পুস্তিকাটি নিছক যুক্তিআশ্রয়ী শাস্ত্রবিচার, মানবিক কোনো আবেদন নয়। নতুন কোনো কথা না থাকলেও

৬০ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ২৪।

৬১ '*On the effect of the Native Press in India*', 'The Friend of India' (Quarterly), Vol. I. No I, 1821, P. 126.

রামমোহনের বিদ্রূপাত্মক বাচনভঙ্গি ও নিজ বক্তব্যে দৃঢ় আস্থা পুস্তিকাটিতে লক্ষণীয়। বিদ্রূপই সাহিত্য এখানে। সতীপ্রথা নিবারণ সম্পর্কে পূর্বোক্ত দুটি পুস্তিকার মতো এটিতেও তিনি নীরব।

আইন করে সতীপ্রথা নিবারিত হলে রক্ষণশীলরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল বেণ্টিঙ্কের কাছে এর প্রতিবাদ করে 'সতীপ্রথা-আবেদন' অর্পণ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ১০০ পাতার এই পুস্তকটিতে ১২০ জন পণ্ডিত স্বাক্ষরিত সতীদাহ-সমর্থক শাস্ত্রবাক্যগুলির একটি সংকলনও যুক্ত হয়।[৬২]

রামমোহন বা কাশীনাথের সতী সম্পর্কিত পুস্তকের বাদানুবাদকে বহুগুণে ছাপিয়ে উঠল সমকালীন সাময়িকপত্রগুলি। বলতে পারি, সতী আন্দোলন বাংলা সাময়িকপত্রের মরা গাঙে জোয়ার আনল। 'The discussion which arose out of the Suttee question imparted an extraordinary impulse to all Native Papers, and gave them a degree of interest and importance in the Native community, which they had never enjoyed before. Subscribers flowed in apace, and the editors were urged by the eagerness of the public to hear of the progress of the great event which agitated Native society.'[৬৩] 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ-কৌমুদী' দায়িত্ব নিল সাধারণ মনের খোরাক মেটানোর। সতীপ্রথার বিলোপ আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখল, মুসলমানরাও এ প্রথায় হস্তক্ষেপ করেন নি, আর ইংরেজরা কিনা তাই করতে চলেছে! সন্দেহ নেই, হিন্দুধর্মের শেষ অবস্থা উপস্থিত।[৬৪] চন্দ্রিকাকারের সঙ্গে দর্পণকার কিন্তু একমত হতে পারলেন না। শাস্ত্রালোচনা করে তিনি দেখালেন, সতীপ্রথা নিবারিত হলে হিন্দুধর্মের কোনো হানিই হবে না।[৬৫] শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, সতীপ্রথা নিয়ে দর্পণ ও চন্দ্রিকার বাদানুবাদ লেগেই ছিল। রক্ষণশীল মনকে তৃপ্ত করত 'সমাচার চন্দ্রিকা', আর এই অমানবিক প্রথার বিরোধীরা সাগ্রহে 'সমাচার-

৬২ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রক্ষিত এই পুস্তকটি বর্তমানে অদৃশ্য হওয়ায় আমরা তা দেখার সুযোগ পাইনি।

৬৩ '*The Friend of India*', 15. 1. 1835, P. 18.

৬৪ '*Abolition of Suttees*', reprinted from the 'Samachar Chundrika', 'The Calcutta Monthly Journal', November, 1829, P. 96-9,

৬৫ 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল'-এর পূর্বোক্ত সংখ্যা, পৃ. ৯৯-১০২।

দর্পণ' বা 'সম্বাদ কৌমুদী'র পৃষ্ঠা উল্টে এ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতেন। অন্যদিকে রামমোহনপন্থীদের পত্রিকা 'বঙ্গদূত' এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় বোধ করে অনুপ্রাসবহুল গদ্যে লেখে :

'ইদানী সহগমনের বিষয়ে ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্যাদি নানা ভাষায় ভাবিত সম্বাদপত্রে নানাপ্রকার বাদানুবাদ দেখা যাইতেছে কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মের বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচার সমাচারচ্ছলে সমাচার পত্রে প্রচার হওয়াতে মীমাংসার আশা সুদূর পরাহতা কেবল বাদানুবাদের সহযোগে অপবাদ সংবাদে বিবাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনা সম্ভব, বরং লাভঃপর পাঠকবর্গের পাঠে নিরর্থক সময়চ্যুতির দ্বারা বিতুষ্টির হেতু অনুভব হইতেছে এমতে অত্রপত্রে তদ্বিষয়ক অসম্মদাদি [র] কোন মতামত প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ হইল না। ধর্মবিষয়ে বিচার আবশ্যক হইলে স্বতন্ত্র পত্রে ইহার বিস্তার প্রকাশ হইলে উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম শাস্ত্রাভিপ্রায় অনায়াসে নির্য্যাস হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা বাগ্‌জালের জঞ্জাল রহিত হইয়া অপক্ষপাতির বিবেচনায় স্বপক্ষ বিপক্ষের পক্ষাপক্ষ অবশ্যই নিরপেক্ষ হইবেক তখন রাজা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত জানিয়া যাহা ধর্তব্য ও যাহা কর্তব্য তাহা সহজেই অবধারণ ও নিরাকরণ করিতে পারিবেন...।'[৬৬]

শুধু বাংলা পত্রিকাতেই নয়, সমকালীন ইংরেজি পত্রপত্রিকাগুলিতেও এই আন্দোলনের ছোঁয়া লেগেছিল। বিদেশী সম্পাদকরা কেউ একে মনে করতেন অশাস্ত্রীয়,[৬৭] কেউ মেয়েরা কেন সতী হন তারই কারণ সন্ধান করতেন,[৬৮] কেউ বা আইন প্রণয়ন করে এই বর্বরপ্রথাকে নিষিদ্ধ করার আবেদন জানাতেন,[৬৯] কেউ বা সরকারি প্রয়াসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন,[৭০] আবার কেউ বা এমন কথাও বলতেন, এমন একদিন আসবে যখন হিন্দুরা

৬৬ 'বঙ্গদূত', ৩১ সংখ্যা, ৫. ১২. ১৮২৯, পৃ. ৩২৬-৭।

৬৭ '*Review of a Pamphlet on the Subject of Burning Widows*', 'The Friend of India', October, 1819.

৬৮ '*Female Immolations*', 'The Friend of India', March, 1822.

৬৯ '*Burning of Widows*' (a letter to the editor by NAUTICUS), 'The Calcutta Journal', 9. 5. 1819.

৭০ '*On the abolition of Suttee,*' 'The Calcutta Magazine & Monthly Register', January, 1830.

নিজেরাই নিজেদের এই বীভৎস প্রথার কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবে।[৭১] কখনও এই বর্বর নৃশংস প্রথারোধের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হত,[৭২] আবার কেউ বা আশা প্রকাশ করতেন, ঈশ্বরেচ্ছায় এদেশে যখন ব্রিটিশ সরকারের শুভাগমন ঘটেছে, তখন আশা করা যায়, সরকার নিশ্চয়ই আইন করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে, অসংখ্য নিরীহ মেয়েকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচাবেন।[৭৩] কেউ আরো সোজাসুজি লিখতেন, অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথা নিতান্ত অমানবিক, তাই সরকারের কর্তব্য তা নিবারিত করা, আর তা করার সময়ও এসেছে।[৭৪] ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন-গুরু হরিহরানন্দ একে মনে করতেন নিছক স্ত্রী-হত্যা,[৭৫] আবার কোনো নাম না জানা বাঙালী ইংরেজি পত্রিকায় চিঠি লিখে এ-বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে, সতীপ্রথার ওপর আরোপিত সরকারি বিধিনিষেধগুলিও তুলে নেবার প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে, এরকম করলে তবেই সতীপ্রথা মর্যাদা হারিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।[৭৬]

এ প্রথা নিবারণ করার সময় এসেছে একথা 'বেঙ্গল ক্রনিকলে'র সম্পাদক ঠিকই ধরেছিলেন। কারণ, সময় সত্যই এসেছিল। তাই যারা চেয়েছিলেন, আর যারা চান নি—তাঁদের সবাইকে চমকে দিয়ে বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯-এ সতীদাহ নিবারক আইনজারি করলেন। বাংলার পত্রিকাজগৎ আবার চকিত হয়ে উঠল, লেখালেখির পালা শুরু হল নতুন উদ্যমে। আইন জারি হবার কিছুদিন পর 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখল, 'সতীর বিপক্ষে যে ২ মহাশয়রা সর্বদা প্রকাশ্য পত্রে নানাপ্রকার লিপি লিখিয়া থাকেন অর্থাৎ সতীর বিপক্ষ আইন হওয়াতে

৭১ '*Burning of Widows*' (reprinted from the 'India Gazette'), 'The Calcutta Monthly Journal', December, 1829, P. 34.

৭২ '*Burning of Widows alive*', 'The Friend of India', November, 1822, P, 314-5.

৭৩ '*On the Burning of Widows*', 'The Friend of India' December, 1818, P. 311.

৭৪ '*The Bengal Chronicle*', 23. 6. 1829, P. 490.

৭৫ '*The Calcutta Journal*', 11. 4. 1819.

৭৬ '*Burning of Hindoo Widows*' (a letter to the editor of the 'India Gazette' signed by Bengalensis), 'The Calcutta Monthly Journal', June, 1829.

অনেক স্ত্রীর প্রাণরক্ষা হইল ইহাতে দেশের মহোপকার হইয়াছে তাঁহারা কেবল ইহাই লিখিতে পারেন'[৭৭]—অন্যসব কথা লেখার জন্য তো ছিলেন স্বয়ং চন্দ্রিকাকার। লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে দরবার পর্যন্ত করা হল। কিন্তু সেখানের বিচারেও নিষেধ-আইন বলবৎ থাকলে, কেউ হলেন আনন্দিত, আবার কেউ হলেন ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধদের ক্ষোভকে ভাষা দিল 'সমাচার চন্দ্রিকা', সুরে সুর মেলালো 'সংবাদ রত্নাবলী'। সেই পুরানো একঘেয়ে কথা, শুনে লাভ নেই। বরং শোনা যাক প্রগতিশীল বাঙালী যুবকদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণে'র বক্তব্য :

'এইক্ষণে কহিতেছি হে আমারদের মিত্রেরা আপনারা এক সভা করিয়া আপন ২ আহ্লাদসূচক প্রবি-কৌন্সেলের এক ধন্যবাদ পত্র বিলাতে প্রেরিত করুন।

কেননা বর্ত্তমান রাজ্যাধিপতি ও তন্মন্ত্রিগণেরা যে আমারদের দেশের স্ত্রীলোকের প্রাণদান করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের ধন্যবাদ না করা আমারদের নিতান্ত অবিজ্ঞতা প্রকাশ সদ্বিবেচনা করিলে সকলেরি তাঁহারদিগের ধন্যবাদ করা উচিত, কিন্তু ধর্মসভার দলস্থেরা তাহা করিবেন না বিশেষতঃ এই সমাচার শ্রবণে তাঁহারা একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং তাঁহারা এবিষয়ের কি লিখিয়া যে বিদেশস্থ ধন দাতারদিগের প্রবোধ জন্মাইবেন এই ভাবনাতে তাঁহারদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইবে এখনে রাগান্বিত হইয়া চন্দ্রিকাকার যাহাই বলুন কিন্তু স্ত্রী হত্যারূপ তাঁহারদের পরম ধর্ম আর ফিরিবেক না কেবল মনের খেদই চিরকাল রহিবে।'[৭৮]

কিন্তু চন্দ্রিকাকার যে নিতান্ত শোকাহত! শোকাহত চন্দ্রিকাকারকে অগতির গতি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে 'জ্ঞানান্বেষণ' যে পরামর্শ দিয়েছিল তাই উদ্ধৃত করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি :

'হে আমারদের পরমেশ্বর যাহাতে স্ত্রীহত্যা করিতে পারি এমত শক্তি আমাকে দেও ইহাতে পরমেশ্বরের যদ্যপি স্ত্রীহত্যা করিতে বাঞ্ছা হয় তবে চন্দ্রিকাকারের প্রতি অবশ্য প্রত্যাদেশ করিবেন।'[৭৯]

৭৭ 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৫. ৫. ১৮৩১, পৃ. ৫৫।

৭৮ 'সমাচার দর্পণ' ('জ্ঞানাম্বেষণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত), ৮০০ সংখ্যা, ১০. ১১. ১৮৩২, পৃ. ৫৩৫।

৭৯ 'চন্দ্রিকাকারের প্রতি সৎপরামর্শ' ('জ্ঞানাম্বেষণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত), 'সমাচার দর্পণ', ৮১০ সংখ্যা, ১৫. ১২. ১৮৩২।

সতীপ্রথার জের কাটতে না কাটতে শুরু হলো বিধবাবিবাহ নিয়ে বাঙালী-সমাজে আলাপ-আলোচনা। আর এই আলোচনা শুধু শাস্ত্রীয় বিতর্ক ও মতভেদেই সীমাবদ্ধ না থেকে, একদিকে যেমন বৃহত্তর জনজীবনকে স্পর্শ করল, অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যেও ছাপ রাখল। শাস্ত্রীয় মতবাদ আলোচনী নিবন্ধ, নাটক, নকশা, ব্যঙ্গরচনা, কবিতা, পাঁচালী, এমনকি বাঙালী পল্লীকবির গানেও এই আন্দোলনের প্রতিফলন দেখে আমাদের অনুমান, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মতো অন্য কোনো সামাজিক পরিবর্তন, বা পরিবর্তন-প্রয়াস সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এতখানি ছাপ রাখতে পারেনি। একটি আইন প্রণয়নের সাফল্য সর্বস্ব আন্দোলন এককালে আমাদের নিরুত্তাপ সমাজজীবনে কি প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চার করেছিল, তার কিছুটা প্রমাণ তো এর ব্যাপক সাহিত্যায়নে।

সমকালীন বাংলা পত্রিকাগুলি এ আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দেয়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বা 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ ভাস্কর' বা 'সংবাদ প্রভাকর', 'মাসিক পত্রিকা' বা 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', বা 'সমাচার-সুধাবর্ষণ'-এর পাতায় পাতায় এ আন্দোলনের ছাপ আজও রয়ে গেছে। ইংরেজি পত্রিকাগুলিও যে গা বাঁচিয়ে চলতে পারেনি, 'ইংলিশম্যান', 'হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সর' বা 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পুরানো সংখ্যাগুলি তার সাক্ষ্য দেবে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নায়ক নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর। তাঁর পূর্বে এ বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হলেও, তাতে প্রাণের স্পর্শ যে তিনিই সঞ্চার করেন, সেকথা বলে এসেছি। কিন্তু বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জনক যেমন নন বিদ্যাসাগর, তেমনি বাংলায় এ বিষয়ক প্রথম পুস্তক রচনার কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য নয়।

বিদ্যাসাগরের রচনার আগে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রামজয় শর্মা 'বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা' এবং তার ভাষার্থ 'ধর্মসভা'র অনুমতিক্রমে মুদ্রিত করেন। পুস্তিকাটির ভূমিকায় বলা হয়, বিধবার পুনর্বিবাহের কথা প্রচার করে 'কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি' গবর্নমেণ্টে পাঠানোর জন্য এক ব্যবস্থাপত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে পাঠান। সোসাইটির সম্পাদক ঐ ব্যবস্থাপত্রের 'যাথার্থ্য নির্ণয়ের'

জন্য তা 'ধর্মসভা'য় পাঠিয়ে দেন। 'ধর্মসভা' তার যে উত্তর দেয়, সাধারণের জন্য তার মর্মার্থ এই পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত। এতে বিভিন্ন শাস্ত্র পর্যালোচনা করে বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে, 'যাঁহারা বিধবার বিবাহাদি স্ত্রীধর্ম বলিয়া ব্যবস্থা দেন তাঁহারদিগের শাস্ত্রার্থজ্ঞান নাই।' বিধবা-বিবাহের অনিষ্টকারিতার দীর্ঘ ফর্দ দিতেও লেখক ভুল করেন নি।

'ধর্মসভা' যখন এত কথাই বলল, তখন তার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র 'যন্ত্রাধ্যক্ষ'ই বা পেছিয়ে থাকেন কেন! ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এটির লেখক কে—আমরা ঠিক জানি না। কারণ পুস্তিকাটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত একটি সংবাদেই সীমাবদ্ধ:

'হিন্দু বিধবার বিবাহ। উক্ত বিষয়ে যুবা লোকেরা এক্ষণে মনোযোগী হইয়াছেন দৃষ্টে চন্দ্রিকা যন্ত্রাধ্যক্ষ তদ্বিরুদ্ধে হিন্দু ব্যবস্থাপকদিগের মতঘটিত এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।'[৮০]

বিধবাবিবাহের বিপক্ষে এইসব কথাবার্তার মধ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', লেখক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যতদূর জানি, এটিই বিধবাবিবাহের সমর্থনে বাংলায় লেখা প্রথম পুস্তিকা। পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে তিনি দেখালেন, 'কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম।' পুস্তিকাটিতে প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি বিধবাবিবাহজাত পুত্রের 'পৌনর্ভব' সংজ্ঞা হবে কিনা তারও বিচার করলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক রোধ হতে পারে এসব দেখিয়ে, তিনি শেষে আবেদন জানালেন, এর শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যা লেখা হল, তা আলোচনা করে সকলে দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?

বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে 'সংবাদপ্রভাকর' তাঁর লিখিত প্রমাণাদিতে 'একপ্রকার অকাট্য' বলে ঘোষণা করে লিখল, 'ঐ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।'[৮১] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৭৭৬

৮০ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২২৮০ সংখ্যা, ২৪. ১০. ১৮৫০।

৮১ 'সংবাদ প্রভাকর', ৮. ২. ১৮৫৫।

শকের ফাল্গুন সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে।[৮২]

বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা প্রকাশের পর বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনার ধুম পড়ে গেল। নামী-অনামী নানাজন ছোট-বড় পুস্তিকা প্রকাশ করে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। ১৭৭৬ শকের চৈত্র মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ' নামক লেখাটি থেকে জানতে পারি, ঐ পুস্তিকার প্রত্যুত্তরস্বরূপ ৪/৫ খানি গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। এর একটি ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, যিনি বছর দেড়েক আগে এই বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত বলে বিধান দিয়েছিলেন, তাঁরই সহায়তায় প্রস্তুত। ১৮৫৫-এর মার্চ মাসের মধ্যে এর প্রত্যুত্তরে ৭/৮ খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হল।[৮৩] এই বছরের মধ্যেই প্রত্যুত্তর-পুস্তিকার সংখ্যা পৌছল ৩০-এ।[৮৪]বাংলা ও সংস্কৃতে লেখা এ ধরনের কটি প্রতিবাদ পুস্তকের নাম বিহারীলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগর-জীবনীতে করেছেন। এগুলি হল:

শ্যামপদ ন্যায়ভূষণের 'বিধবা বিবাহের নিষেধক। বিচারঃ', কাশীপুরের শশিজীবন তর্করত্ন ও জানকীজীবন ন্যায়রত্ন সংগৃহীত 'বিধবাবিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া।' কালিদাস মৈত্রের 'পৌনর্ভবখণ্ডনম্,' কলকাতার রামচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবাবিবাহ ব্যবস্থার বিধবোদ্বাহবারকঃ', মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সংকলিত 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ,' অজ্ঞাতনামার 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে', 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিতসম্মত প্রত্যুত্তর,' 'ধর্ম-মর্ম প্রকাশিকা সভা' প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহবাদ' (১ম খণ্ড), রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ সংকলিত 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা-

---

৮২ 'তত্ত্ববোধিনী'তে উদ্ধৃত পুস্তিকার পাদটীকায় বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন, 'কলিকাতাস্থ ধর্মসভার পূর্বসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে যে সমস্ত সংহিতাগ্রন্থ ও অষ্টবিংশতি তত্ত্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সেই মুদ্রিত পুস্তক হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।' বিদ্যাসাগর যে রসিক পুরুষ পাদটীকাটি তার প্রমাণ। এ সময় ভবানীচরণ বেঁচে ছিলেন না, থাকলে 'পবিত্র'ভাবে মুদ্রিত শাস্ত্রগ্রন্থের এরকম 'অপবিত্র' ব্যবহারে নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হতেন।

৮৩ '*The Hindu Intelligencer*', 2. 4. 1855, P. 107.

৮৪ 'no less than thirty tracts were published at different times in reply to the pamphlet.' '*Marriage of Hindu Widows*', 'The Calcutta Review', Vol. XXV, 1855, P. 360.

এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর,' অজ্ঞাতনামার 'বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত নহে,' পীতাম্বর কবিরত্নের 'বিচিত্র স্বপ্নবিবরণ' ও 'ধর্মসভা'-প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ-নিষেধ-বিষয়িনী ব্যবস্থা'।[৮৫] বিহারীলাল উল্লিখিত শেষ পুস্তিকাটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি বিদ্যাসাগরের পুস্তকের প্রত্যুত্তর নয়, এটির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। বিহারীলাল পুস্তিকার নামটিও ঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেন নি। পাদটীকায় পুস্তিকাটি সম্পর্কে যা বলেছেন—তাও যথার্থ নয়।

সমকালীন একটি পত্রিকা বাংলায় এ বিষয়ক পুস্তিকার উল্লেখপ্রসঙ্গে কাশী-পুরের শশিজীবন ও রামজীবন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, পলতার শ্যামনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি রচিত পুস্তিকা ছাড়াও 'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা' প্রকাশিত পুস্তিকার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করে, বিধবাবিবাহের পক্ষে যেখানে ১টি মাত্র পুস্তিকা, সেখানে এর বিপক্ষে ৭/৮টি পুস্তিকাই বলে দিচ্ছে, দেশীয় মন এ আন্দোলনের জন্য কতখানি প্রস্তুত![৮৬]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের প্রতিবাদপুস্তকের মধ্যে যেগুলি আমাদের চোখে পড়েছে, সেগুলিতে মোটামুটিভাবে দুটি রীতি অনুসৃত। প্রথমটি শাস্ত্র-বিচারের, দ্বিতীয়টি নিছক কটূক্তি ও গালিগালাজের।

যেসব বইতে শাস্ত্রবিচারের পথ অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১৭৭৭ শকাব্দে বর্ধমানের মহারাজার আদেশানুসারে পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সংগৃহীত 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সমূহ'-এর কথা প্রথমেই উল্লেখ্য। ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটি বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে লেখা হলেও, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক রচনার পর পদ্মলোচনের উত্তর-পুস্তকটি পান। পুস্তকটিতে লেখকের বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-দ্বিতীয় পুস্তকে আক্ষেপ করে লিখেছেন, যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়, যথার্থপক্ষ অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত, বলিতে পারা যায় না।' গ্রন্থটিতে লেখকের সৌজন্য ও বিনয় চোখে পড়ার মতো। 'মহামান্য' ও 'বিশ্ববিখ্যাত' পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শাস্ত্রব্যাখ্যায় কি ধরনের চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার আলোচনা করে তিনি বিদ্যাসাগরকে 'স্বীয়

---

৮৫ 'বিদ্যাসাগর' (২য় সংস্করণ, ১৩০৭), বিহারীলাল সরকার, পৃ ২৭০-১।

৮৬ '*The Hindu Intelligencer*', 2.4.1855, P. 107.

দুরাশা' ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার সমালোচনা করেছেন তিনি। গ্রন্থশেষে বিদ্যাসাগর যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ লৌকিক যুক্তিযুক্ত আবেদন রেখেছেন, তার সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'লৌকিক কষ্টের ভয়ে কে কবে ধর্মত্যাগ করিয়াছে!' বিধবাবিবাহের অভাব নয়, রাজদণ্ডাভাবই তাঁর মতে, ব্যভিচারের মূল কারণ। পরিশেষে মহামান্য পাঠক ও দেশমান্য বিদ্যাসাগরের কাছে গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন, নিরপেক্ষ-ভাবে এ পুস্তক পর্যালোচনা করে সকলে দেখুন, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত কিনা!'

ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে'-তে সোজাসুজি বললেন, 'ব্যবহার বিরুদ্ধ' বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে উপকার ছাড়া অপকার নেই। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের গৃহীত বচন বর্তমান কালোপযোগি নয়, তার ওপর এদেশের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে বিধবাবিবাহ কোনোমতেই খাপ খায় না। এ প্রথা চালু নেই বলেই এদেশে 'সতী স্ত্রী সংখ্যা' সবচেয়ে বেশি। অশাস্ত্রীয় এ প্রথা চালু হওয়া মোটেই উচিত বা কর্তব্য নয়। বিশেষ করে, যেখানে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানেও তো ভাল ফল কিছু দেখা যাচ্ছে না। 'সভ্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা'ও এ কাজকে 'ঘৃণা' করেন। অন্য আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন প্রসন্নকুমার। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে স্বামী যদি মনের মতো না হয়— তাহলে মেয়েরা হয়তো তাকে হত্যাই করে বসবে! তাই তাঁর অভিমত, 'এতদ্দেশে বহুবিবাহ ও অল্পবয়সে বিবাহ ইত্যাদি যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তাহা নিবারিত হইলে বিধবাবিবাহের কোন প্রয়োজন থাকিবেক না।'[৮৭] আর সেগুলি নিবারণে যত্নবান না হয়ে 'নিষ্প্রয়োজনীয় লজ্জাস্কর শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিধবা-বিবাহের নূতন নিয়ম প্রচলিত করণে' যত্নবান হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বোঝা যাচ্ছে, প্রসন্নকুমার সমস্যাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। আর তাঁর সেই চিন্তার ফসলকে সম্পূর্ণ শাস্ত্রালোচনার উপযোগী ভাষায় বিনীত-ভাবে অথচ দৃঢ়তা সহকারে মাত্র ১৬ পাতার এই পুস্তিকাটিতে প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদে লেখা পুস্তিকাগুলির মধ্যে আমাদের মতে এটিই শ্রেষ্ঠ।

৮৭ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে' (১৮৫৫), প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৫

'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা'র অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ১২৬১ বঙ্গাব্দে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখলেন 'বিধবাবিবাহ বাদ' (১ম খণ্ড)। ২৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থকেন্দ্রিক গুরুগম্ভীর এই শাস্ত্রীয় বিচারে দীনবন্ধু কোথাও বিদ্যাসাগরের প্রতি এতটুকু শ্লেষ বা কটাক্ষ করেন নি।

তা না করেও, পীতাম্বর সেন কবিরত্ন তাঁর 'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ'-এ আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, পরাশর সংহিতায় 'বিধবাবিবাহের' কথা দূরে থাক, 'বিধবা' শব্দই নেই। আর যা নেই, তা নিয়ে এত গণ্ডগোল কিসের! বিধবা সে তো মেয়েরা পূর্বজন্মের পাপে হয়। কাজেই আবার বিয়ে হলে আবারও তারা বিধবা হবে—তাহলে 'কতবার নারীদিগের বিবাহ হইতে পারে।' শুধু তাই নয়, মেয়েরা কি সহজ চীজ! একবার যদি তারা শোনে বিধবাবিবাহ চালু হবে—তাহলে যাদের স্বামীরা 'নির্গুণ' বা 'নির্ধন' বা যাদের স্বামী পছন্দ-সই নয়, তারা তো স্বামীকে হত্যাই করবে! পথের কাঁটা হয়ে যদি কোনো ছেলে থাকে, তাকেও মারতে হাত তাদের কাঁপবে না! আর ছেলেকে যদি নাও মারে, তাহলেও ছেলে মার কাণ্ড দেখে লজ্জায় প্রাণত্যাগী কিংবা দেশত্যাগী হবে! শেষে বিদ্যাসাগরের প্রতি ৩টি মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি তাঁর বই শেষ করেছেন। কবিরত্নের দুর্ভাগ্য, এত শত কথা পণ্ডিতী বাংলায় লেখার পরও লোকে তাঁকে চিনল না।

আর এক কবিরত্নেরও এই একই অবস্থা। ইনি 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন। পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের আদ্য-শ্রাদ্ধ করেও সন্তুষ্ট না হয়ে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে ইনি লিখলেন 'বৈধব্য ধর্মোদয়' (প্রথম পুস্তক)। পুস্তিকাটি দেখার সুযোগ না পেলেও, রাধাকান্ত-অনুরাগী গোঁড়া-হিন্দু নন্দকুমার এতে বিধবাবিবাহকে কি চোখে দেখেছিলেন অনুমান করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

শাস্ত্রবিচারের ধার না ধেরে কটূক্তি ও গালিগালাজের পথ ধরলেন অন্য একদল। ১২৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থকারের নামহীন ২১ পৃষ্ঠার 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক কুলপঞ্জিকার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর'-এর কথাই ধরা যাক। লেখকের মতে 'পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধি কল্পনা প্রতারণা মাত্র', এ প্রথা প্রচলিত হওয়া 'কোন মতে উচিত ও শাস্ত্রবিহিত' নয়। কারণ বিধবা হওয়া তো মেয়েদের জন্মান্তরের পাপের ফল। এ প্রথা প্রচলনের প্রচেষ্টা করে

বিদ্যাসাগর ভদ্রসমাজে 'হাস্যাস্পদ' হয়েছেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবা-বিবাহ হলে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ, ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হতে পারে। গ্রন্থকার সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করে লিখলেন: 'ইহা যদি বিদ্যাসাগর নিশ্চয় জানিয়া থাকেন তবে তিনি এই প্রথা স্বগৃহে প্রচলিতা করিয়া নিজ শিষ্যানুচরবর্গকে কেন পথ প্রদর্শন না করান্।'[৮৮] পুস্তিকাটিতে এ ধরনের অশালীন ব্যক্তিগত আক্রমণে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হয়েছিলেন।[৮৯]

বেলঘরিয়ার গোবিন্দচন্দ্র শর্মা (মুখোপাধ্যায়) 'বিধবাবিবাহের নূতন প্রকার উত্তর'-এ শালীনতা ও সাধারণ সৌজন্যের রীতিকে পুরোপুরি বিসর্জন দিলেন। লেখকের মতে 'মহাম্লেচ্ছমত' বিধবাবিবাহপক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে আছে 'গেঁজেল, গুলিখোর', অল্পকিছু 'অর্থপিশাচ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' ও 'ম্লেচ্ছমতে কুসংস্কারিত মহোদয়গণ'। অন্য অনেকের মতো তাঁরও বিশ্বাস, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপ। বিধবাবিবাহের সমর্থকদের ব্যঙ্গ করে পুস্তিকাটির সঙ্গে 'শ্রীমহেশ্বরাদিত্য বিদ্যা-মহার্ণব' এই কাল্পনিক নামে 'বিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হওয়া উচিত'—নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় কয়েকটি অভিনব যুক্তি দেখিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষতা করেছেন। সধবাবিবাহের মতো বিধবাবিবাহও প্রচলিত হওয়া উচিত নয়—এই হল লেখকের বক্তব্য। শালীনতার অভাব, বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষ, অমার্জিত রুচি—সব মিলিয়ে পুস্তিকাটি একটি অপদার্থ রচনা।

এইসব অশালীন আক্রমণগুলি বাদ দিলে বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ গ্রন্থগুলির অধিকাংশতেই 'গভীর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যের সমাবেশ' দেখা যায়। মোটামুটিভাবে পুস্তিকাগুলির প্রধান বক্তব্য তিনটি: বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়, বিধবাবিবাহ এদেশীয় প্রথা ও আচার বিরুদ্ধ, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপ—এর সঙ্গে অন্যান্য হরেকরকম বক্তব্য তো ছিলই। এইসব বক্তব্যকে খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫-এর অক্টোবর মাসে প্রকাশ করলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (২য় পুস্তক)। আগড়পাড়ার মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, আড়িয়াদহের শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, পুটিয়ার ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সয়দাবাদের গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন,

৮৮ 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক কুলপঞ্জিকার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর' (১২৬১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৭।

৮৯ 'বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক', 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (২য় খণ্ড, সমাজ), পৃ. ৩৬।

রামগোপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, জনাই-এর জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, আন্দুল রাজসভার সভাপণ্ডিত, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি, হারাধন কবিরাজ, সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, ভাটপাড়ার রামদয়াল তর্করত্ন, কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ, কাষ্ঠশালীর শিবনাথ রায়, বারাণসীর ঠাকুরদাস শর্মা, পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, মুর্শিদাবাদের রামনিধি বিদ্যাবাগীশ[৯০] প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে খণ্ডন করলেন।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটি শুধু যে আকারে বড় তাই নয়, এটির রচয়িতা নিজের বক্তব্যে আরো আস্থাবান, আরও একনিষ্ঠ যুক্তিপরায়ণ। বিদ্যাসাগরের শিল্পীহাত ও দরদী মনের স্পর্শে পুস্তকটি উষ্ণ। গ্রন্থের উপসংহারে বিদ্যাসাগরের নারীদরদী মনটি প্রকাশিত। 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না'—এ যেন 'বাঙালী মা' বিদ্যাসাগরের দু' ফোঁটা চোখের জল!

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় ভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে গ্রন্থটির উপক্রম ভাগ উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, 'বিধবাস্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ নিরাবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্বতোভাবেই কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা ও ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।'[৯১]

'তত্ত্ববোধিনী'র বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হলেন না। বিদ্যাসাগরের পুস্তকের বিভিন্ন প্রতিবাদগ্রন্থ রচিত হল, যদিও সংখ্যায় তা বেশি নয়।[৯২] এগুলির মধ্যে প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ীর [ও ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্নের] প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য। প্রসন্নকুমার অভিযোগ করেন, বিদ্যাসাগর নিজের মত সমর্থনের জন্য অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্তন করেছেন, তাঁর এ অভিযোগ কতদূর

৯০ নামগুলি বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ-দ্বিতীয় পুস্তক' থেকে সংগৃহীত।

৯১ 'তত্ত্ববোধিনী', অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক, পৃ. ১০৪।

৯২ 'against which only two tracts have as yet appeared.' '*Marriage of Hindu Widows*', 'The Calcutta Review', Vol. XXV, 1855, P. 360.

সমর্থনযোগ্য জানি না। 'বিধবাবিবাহ'-দ্বিতীয় পুস্তকের প্রতিবাদগুলির বিদ্যাসাগর আর কোনো উত্তর দেন নি।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের যে দুটি প্রত্যুত্তর আমাদের চোখে পড়েছে, তার প্রথমটি পূর্বোক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্নের ৬৮ পৃষ্ঠার 'বৈধব্য ধর্মোদয়' (২য় পুস্তক)। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রত্যুত্তরে আক্রমণাত্মক এই লেখাটিতে সাধারণ সৌজন্যের রীতি লঙ্ঘিত। লেখকদ্বয় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে 'মোহজালে আবদ্ধ' হয়ে 'এককালে ভদ্রাভদ্রজ্ঞানে জলাঞ্জলি' দেবার অভিযোগ করেছেন। শাস্ত্রবিচারমূলক এই বইটিতে দেশাচার ও শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ নয়, ব্রহ্মচর্যকেই বিধবাদের একমাত্র উপায় বলা হয়েছে। বইটির আর যাই থাক, সাহিত্যমূল্য অন্তত নেই।

এই ধরনের আর একটি বই কোঁড়কাদি নিবাসী রামধন দেবশর্মার 'বিধবাবেদন নিষেধক পুস্তক'। সংস্কৃত ঘেঁষা, নিতান্ত আড়ষ্ট ভাষায় রচিত এই বইটিতে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার সমালোচনা করে তাঁর মতকে 'প্রলপিত অসাধু' বলা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্রবচন ও তার অনুবাদ কণ্টকিত এই পুস্তকে সবদিক বিচার করে লেখকের সিদ্ধান্ত : 'কলিযুগে বিধবাবিবাহ বিধি নাই, নিষেধই আছে প্রতিপন্ন করা হইল।' বিদ্যাসাগরের 'ধন্য রে দেশাচার' 'হা অবলাগণ!' ইত্যাদি আক্ষেপোক্তিও লেখকের মতে অতি অযোগ্য। কারণ, বিধবা তো মেয়েরা অদৃষ্টানুসারে হয়!

বিধবাবিবাহ বিষয়ক বাংলা পুস্তকগুলি বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের উত্তর-প্রত্যুত্তরেই সীমাবদ্ধ না থেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের আঙিনাতেও পা বাড়াল। রচিত হল বিভিন্ন নাটক, নকশা। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক'টির (১৮৫৬) কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞাপনেই উমেশচন্দ্র বলে দিয়েছেন, এটি লেখার উদ্দেশ্য 'to aid a good but not a very popular cause'. এই উদ্দেশ্যমূলকতা নাট্যকার কখনও গোপন করেন নি। এমনকি বিধবা প্রসন্নর বিবাহসভায় শাস্ত্রবিচারের কালে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে প্রচুর অংশ তিনি বিনা দ্বিধায় উদ্ধৃত করেছেন।[৯৩]

ট্রাজেডি হিসাবে লেখকের দাবি সত্ত্বেও এটি পথিকৃৎ নয়, ট্রাজেডি হিসাবে এটির সার্থকতা সন্দেহস্থল। অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেও নাট্যকাহিনী মুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্যমূলক এই নাটকটি সাহিত্যগুণ বর্জিত নয়।

---

৯৩ 'বিধবাবিবাহ নাটক' (৪র্থ সংস্করণ, ১২৮৫), পৃ. ৭০-৮০।

নাটকটি তীব্র গতিবেগসম্পন্ন, চরিত্রগুলি কথোপকথনে জীবন্ত, কৃত্রিমতা দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। নায়ক মন্মথর প্রতি নায়িকা সুলোচনার হঠাৎ আসক্তি কিছুটা অবাস্তব হলেও বিধবাবিবাহ না হবার বিপদের আভাস দিতেই মনে হয় তিনি তা করেছেন। মন্মথ-সুলোচনার পরিচয় পর্ব এতখানি আকস্মিক না হয়ে যুক্তিবহ হলে, নাটকটি অবশ্যই আরো উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠতে পারত। শুধুমাত্র বাবার ভয়ে, সুলোচনার মন্মথকে তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা থেকে নিবৃত্ত করার ঘটনা অতি সরলীকৃত। সুলোচনা-মন্মথর বিয়েতে সামাজিক বাধা নাট্যকাহিনীকে আরো ঘনীভূত করতে পারত। সুলোচনার মৃত্যুকালীন কথোপকথন দীর্ঘ বিলম্বিত হলেও, তা একদিকে উদ্দেশ্যসিদ্ধি, অন্যদিকে কারুণ্যকে ঘনীভূত করার প্রয়োজনে রূপায়িত—বিজ্ঞাপনে নাট্যকারও সে কথা উল্লেখ করেছেন।

মাঝে মাঝে পদ্য-পংক্তি থাকলেও নাটকটির ভাষা এর সম্পদ, এমনকি ভদ্র-চরিত্রগুলি যেখানে সাধু গদ্যে কথা বলেছে, বা স্বগতোক্তি করেছে—তাও প্রাণের স্পর্শশূন্য নয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বাংলা নাটকের মধ্যে 'বিধবাবিবাহ নাটক'টি আমাদের মতে শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্যমূলক 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'র কৃত্রিমতার পাশে এর সজীবতা—উমেশচন্দ্রের সৃষ্টিক্ষমতার পরিচায়ক। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হিসাবে এটি তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক কতখানি হয়েছিল, সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে বলতে পারি, সমকালীন আন্দোলনকে অবলম্বন করে লেখা উমেশচন্দ্রের এই নাটকটি স্বকাল উত্তীর্ণ হতে পেরেছে লেখকের নামের জোরে নয়, আপন সৃষ্টিশীলতার জোরে। রসসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত এই নাটকটি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যফসল।

অগস্ট, ১৮৫৬-এ প্রকাশিত অজ্ঞাতনামার ৩৩ পৃষ্ঠার 'বিধবা বিষম বিপদ' নামক নাট্যচিত্রটিতে ঘরে অল্পবয়সী বিধবা থাকার বিষময় ফল দেখিয়ে বিধবা-বিবাহকে সমর্থনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অমার্জিত ও অশালীন ভাষায় লেখা কদর্য রুচির এই নাট্যচিত্রটিকে সাহিত্য নামের যোগ্য বলা চলে না।

সমকালে ও পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন বহু পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত এ ধরনের কটি গ্রন্থনামই আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করার পক্ষে যথেষ্ট :

(১) 'বিধবা মনোরঞ্জন' (২ খণ্ড), রাধামাধব মিত্র, ১৮৫৬।

(২) 'বিধবোদ্বাহ', উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৫৬।

(৩) 'বিধবাবিরহ নাটক', শিমুয়েল পিরবকস্, ১৮৫৭।

(৪) 'বিধবা পরিণয়োৎব', বিহারীলাল নন্দী, ১৮৫৭।

(৫) 'চপলা চিত্ত চাপল্য', যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১৮৫৭।

(৬) 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা', হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ১৮৬৩।

(৭) 'বিধবাবিলাস', যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৪।

(৮) 'অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা', প্রাণনাথ পণ্ডিত, ১৭৯৫ শক।

(৯) 'বিধবার দাঁতে মিশি', গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৪।

(১০) 'কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষেধ', শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, ১৮৭৫।

(১১) 'বিধবাবিবাহের নিষেধক', শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, ১২৮৪।

(১২) 'হিন্দু বিধবাবিবাহ সমালোচনী', যাদবচন্দ্র দাস, ১৮৮২।

(১৩) 'বিধবাবিবাহ বিবাদভঞ্জন', যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪।

(১৪) 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা', দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৮৬।

(১৫) 'বিধবাবিবাহ', মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ১৯৪২ সম্বৎ।

(১৬) 'বিধবাবিবাহ খণ্ডনং', শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, ১২৯২।

(১৭) 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা', সমালোচক-গণ্ডুষ জলসঞ্চারি সফরঃ, ১২৯২।

(১৮) 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ', প্রসন্নকুমার শর্মা, ১২৯৩।

(১৯) 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ', ১৮৯০।

নামের তালিকা আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুধু শাস্ত্রীয় বিচার আর নাটক নকশাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। স্বভাবকবি ধীরাজ বিদ্যাসাগরের নামে গান বাঁধলেন, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে'... 'অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত' এই গানটি বিদ্যাসাগর শুনতে যে ভালোবাসতেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মুখের কথাই তার প্রমাণ।[২৪]

ছড়ায়, গানে বিধবাবিবাহ বাংলার সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।"...গান তুলে বেশ

২৪ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', বিপিনবিহারী গুপ্ত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৫২।

দু'পয়সা করে নিল। এই জনপ্রিয় গানকে ব্যঙ্গ করে 'শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে' বলে অন্য একটি গানও প্রচারিত হল। বিধবাবিবাহ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত গানগুলি লোকের মুখে মুখে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের বউ-ঝি থেকে আরম্ভ করে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত তা গাইতে আরম্ভ করে। পল্লীগ্রামে চাষা-ভূষার মধ্যে বিদ্যাসাগরের নামই হল 'বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর!'[৯৫]

বিখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায় তো একটি পালাই লিখে ফেললেন 'বিধবাবিবাহ পালা' নাম দিয়ে। মোট ৬টি গীতে সমৃদ্ধ এই পালাটিতে দাশরথির রক্ষণশীল মনটি প্রকাশিত। দাশরথি-গবেষক এটিকে পালা না বলে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর নকশা বলতে আগ্রহী।[৯৬] 'গুণের সাগর' বিদ্যাসাগরের প্রতি দাশরথির শ্রদ্ধাপূর্ণ কটাক্ষ রীতিমতো উপভোগ্য।

পাঁচালিকার দাশরথি অভিযোগ করেছিলেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে, নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে'—সেই ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাসপ্রিয় মনটি 'বিধবাবিবাহ আইন' ও 'বিধবাবিবাহ'-এই দুটি কবিতায় প্রকাশিত।[৯৭] আর লঘু সুরে লেখা এই কবিতা দুটিই সমালোচকদের ঈশ্বর গুপ্তকে আক্রমণের বড় হাতিয়ার।

আমাদের কেমন যেন মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্ত এমন একজন লেখক, যার প্রতি আমরা অবিচার করেছি, এবং এখনও করছি। স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী, বিধবাবিবাহ-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, একটি ঘোর রক্ষণশীল অনুদার মানুষের নামই আমাদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, 'সংবাদ প্রভাকরে' সংখ্যার পর সংখ্যায় যিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ক্লান্তিহীন, তিনিই স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী রূপে চিহ্নিত। অথচ যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৫৬ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আশ্চর্য নীরব (একটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদ দিলে), সেই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী আমাদের কাছে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরূপে চিত্রিত, এবং গবেষকগণ কর্তৃক সমাদৃত!

আমাদের মনে হয়েছে, ঈশ্বর গুপ্তের দুটি সত্তা—একটি চিন্তানায়কের, অন্যটি ব্যঙ্গরসিকের। সেই মানুষটি—যিনি পরিহাসপ্রিয়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ ছুরিতে পথ কেটে চলেন, তিনিই কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই কবিতায়

৯৫ 'বিদ্যাসাগর' (২য় সংস্করণ, ১৩০৭), বিহারীলাল সরকার, পৃ. ২৮৭।

৯৬ 'দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালি', ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৩৬৮।

৯৭ 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী', কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, পৃ. ৪৮-৫০।

কখনও বিধবাবিবাহকে নিয়ে রহস্য করে লিখেছেন, 'বিধবার বিবাহের উপায়। ওলো দিদি তোয়ের হও', কখনও বা আরও তীক্ষ্ণ কিছু। 'ছুঁড়ির কল্যাণে' যাতে বুড়িরা না তরে সেদিকেও তিনি সজাগ—তাই অক্ষতযোনি বিধবাদের বিবাহই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। জোর করে বিধবা বিয়ে দেবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী মানুষ, শাস্ত্রীয় কূট-কচালের ধার তিনি ধারেন নি। কখনও যুক্তিপূর্ণ ভাষায়[৯৮], আবার কখনও অনুপ্রাসবহুল গদ্যে[৯৯] তিনি তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

এতো গেল ঈশ্বর গুপ্তের একদিকের পরিচয়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের অন্য দিকটা কি আমরা দেখব না? যিনি যুক্তিবাদী, যিনি চিন্তাবিদ, সেই ঈশ্বর গুপ্ত—বিধবা-বিবাহ আইনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত আবেদনে সই করেছেন,[১০০] প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, 'সংবাদ প্রভাকরে' বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ গ্রন্থ সম্পর্কে একবার নয়, বারবার সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন,[১০১] এ ধরনের পুস্তক প্রকাশ করে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলে মত প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নি। 'অহং যথার্থবাদী' স্বাক্ষরে 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত'-তে বিধবাবিবাহ চালু না থাকার ফল আলোচনা করে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রতি 'ধর্মানুরঞ্জিকা'-সম্পাদক যেভাবে কটূক্তি নিক্ষেপ করে শিষ্টাচারের বিধি লঙ্ঘন করেছেন, তার জন্য ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারে নি।[১০২] সব মিলিয়ে সমাজ সচেতন ঈশ্বর গুপ্তকে আর যাই হোক, সেই 'প্রবীণ আর পরম পাকা', যাঁরা 'চক্ষু কর্ণ' দুটি ডানায় ঢেকে রাখেন, তাঁদের দলে ফেলতে আমরা রাজি নই।

ভুলে যাই, ঈশ্বর গুপ্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুস্থানীয়, প্রথমজন বয়জ্যেষ্ঠ হয়েও কনিষ্ঠকে শ্রদ্ধা করতেন, 'প্রভাকরে'র পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর আছে। বিধবাবিবাহ একদিকে যখন ঝড় তুলেছে, পণ্ডিতরা যখন শাস্ত্রীয় আলোচনায় মগ্ন, অন্যদিকে তখন তা গাল-গল্প-পরিহাসেরও বিষয়বস্তু। মেয়েদের মাঘের রোদে ভিজে চুল মেলে সময় কাটানোর খোরাক। ঈশ্বর গুপ্ত তো বৈঠকী

৯৮ 'সংবাদ প্রভাকর', ১ মাঘ, ১২৬৩।

৯৯ ঐ, ৫১৮৬ সংখ্যা, ২০. ৩. ১৮৫৫।

১০০ 'বিদ্যাসাগর' (১৩৭৬ সংস্করণ), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২১৬।

১০১ 'সংবাদ প্রভাকর', ৮. ২. ১৮৫৫ ও ৯. ২. ১৮৫৫।

১০২ ঐ, ৭. ৩. ১৮৫৫।

মানুষ, আড্ডাবাজ, স্বভাবকবি—তিনিও যদি এই পরিহাসেরই সুরে দু'চারটি কবিতা লিখে থাকেন, তাহলে তাই কি তাঁর চিন্তাভাবনার একমাত্র পরিচায়ক? 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই তরুণের মধ্যে যে পরিচয়ের সূত্রপাত, পরবর্তীকালে তাই পরিণত হয়েছিল হৃদয়ের উষ্ণ সম্পর্ক—বন্ধুত্বে। আর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক তো শুধু শ্রদ্ধারই নয়, ঠাট্টা-ইয়ারকিরও!

'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা কখনও বিসর্জন দেন নি—তাই একদিকে 'সংবাদ প্রভাকরে' যেমন বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা বেরিয়েছে, অন্যদিকে রক্ষণশীল ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চাননের লেখা ছাপতেও তিনি ইতস্তত করেন নি।[১০৩] আর ঈশ্বর গুপ্ত? তিনি দুষ্টুমিভরা

১০৩ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখ্য রচনা:

পক্ষে

(১) 'বরাহনগরবাসিনী বিরহিণীবিধবা' রচিত 'বসন্তের প্রতি বিধবার উক্তি', ৪২৮৪ সংখ্যা, ২৫. ৩. ১৮৫২; কবিতাটিতে পরিহাসচ্ছলে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে, ভঙ্গি ঈশ্বর গুপ্তীয়।

(২) 'বিধবাবিবাহ' ('কেসাঞ্চিৎ হিন্দুনাং' স্বাক্ষরিত পত্র) ৫১৫৭ সংখ্যা, ১৪. ২. ১৮৫৫।

(৩) 'প্রেরিত পত্র', ৫৪৪৯ সংখ্যা, ২২. ২. ১৮৫৬, 'অহং দী' স্বাক্ষরে।

ঐ, ৫৪৫১ সংখ্যা, ২৫. ২. ১৮৫৬, 'অহং শ্রীদী***' স্বাক্ষরে, রচনাটির শেষাংশে মেয়েলি ছন্দে লেখা একটি কবিতা আছে। অজ্ঞাত কারণে শ্রীবিনয় ঘোষ কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের লেখা বলে উদ্ধৃত করেছেন ('বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (৩য়), পৃ. ১৮০)। ৫৪৫১ সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এই কবিতাটির তলায় 'অহং শ্রীদী***' এই নাম আছে। ইনি দীনবন্ধু মিত্র বলে আমাদের অনুমান।

বিপক্ষে

(১) 'বিধবার বিবাহ', ৪৬৫৭ সংখ্যা, ৯. ৬. ১৮৫৩, ৮ লাইন পয়ার।

(২) 'কলিযুগে সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে'—বারাণসীবাসী শ্রীঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন লিখিত, ৫৪৬৬ সংখ্যা, ১৩. ৫. ১৮৫৬, পৃ. ৫-১৬। এটি বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রত্যুত্তরে লেখা।

(৩) 'বিধবাবিবাহ', ২.৭.১৮৫৮।

দুই ডাগর চোখ মেলে সবকিছু দেখেছেন, মাঝে মাঝে পরিহাস করার লোভ সামলাতে না পেরে লিখেছেন :

'যে সাগরে কূল নাই, তরি নাই, তরি।
বাপ বাপ, সে সাগরে, দণ্ডবৎ করি।'

আবার পরিহাসের ভঙ্গি ছেড়ে এই মানুষটিই যখন লেখেন, 'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, ঐরূপ পুস্তক সকল প্রকাশপূর্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, যেমত কোন তরু রোপণ করিয়া অনবরত যত্নবারি সেচন না করিলে তাহার ফল দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ কোন গুরুতর কার্যসাধন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক [তা] ও পরিশ্রম প্রভৃতির আবশ্যক করে, কঠিনতর কর্মসকল কোনমতেই অনায়াসে সাধ্য হইতে পারে না।'[১০৪] তখন বিজ্ঞ সমালোচকদের সঙ্গে একমত হয়ে তাঁকে 'বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী' বলতে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বাধে।

একদিকে যখন বিধবাবিবাহকে নিয়ে পুস্তক-পুস্তিকায় উত্তর প্রত্যুত্তরের জমজমাট পালা, অন্যদিকে তখন আসর গরম করে তুলল সাময়িকপত্রগুলি। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে প্রথম লেখাটি প্রকাশের গৌরব সম্ভবত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র। এপ্রিল, ১৮৪২-এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামক পত্র-প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় একে সমর্থন জানানো হয়। জুলাই, ১৮৪২-এ পত্রিকাটির পঞ্চম সংখ্যাতেও বিষয়টি আলোচিত। ক'বছর পরে 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবেই বলে অভিমত প্রকাশ করে, প্রাচীনপন্থীদের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখলেন :

'প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা এই সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে নিয়মবদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন তবে তাঁহারদিগের বংশাবলীকে উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া যাইবেন।'[১০৫]

তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাঁচের দশকে 'তত্ত্ববোধিনী'তে বস্তুবাদী অক্ষয়-কুমার, 'মাসিক পত্রিকা'য় ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ, 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর-

১০৪ 'সংবাদ প্রভাকর', ৫১৫৩ সংখ্যা, ৯. ২. ১৮৫৫।

১০৫ 'সম্বাদ ভাস্কর', ৮ সংখ্যা, ২৮. ৪. ১৮৪৯।

গুপ্ত ও তাঁর সাহিত্য-শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র এই আন্দোলনের সমর্থনে কলম ধরলেন। কেউ বা বেছে নিলেন মধ্যপন্থা। মধ্যপন্থী 'সমাচার দর্পণ' লিখল, বিধবাবিবাহ বিষয়ক কোন আইন 'ফলজনক' হতে পারে না। জ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই 'নির্দয় ব্যাপারও' ক্রমশ লোপ পাবে।[১০৬] বাস্তববাদী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বলল, দেশের লোক একমত না হলে এ প্রথা কখনও প্রচলিত হবে না। তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিরুদ্ধ এই প্রথা প্রচলনের জন্য 'নব্য সভ্য মহাশয়েরদের আন্দোলন নিতান্তই বিফল', একথা বলে পত্রিকাটি প্রস্তাব করল, 'দেশের বিবিধ অশুভকর কুনিয়ম অগ্রে শোধিত হইয়া সৌভাগ্যের সঞ্চার হউক তবে ঐ সৌভাগ্য সম্পত্তি নিমিত্ত ঐ বিষয়ের আন্দোলন করা যাইবেক।'[১০৭]

আর যাঁরা গোঁড়া, তাঁরা বেছে নিলেন গালিগালাজের পথ। 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক বিধবাবিবাহ আইন হলে দেশের কি অবস্থা হবে কল্পনা করে শিউরে উঠে উত্তেজিতভাবে লিখলেন :

'কে কার পিতাকে পিতা বলিবে ; তাহার বিন্দুমাত্র বিচার থাকিবেক না ইচ্ছামত মৈথুন ক্রিয়া চলিবেক অর্থাৎ যাহারা বেশ্যা লইয়া গুপ্তভাবে জঘন্যরূপে সংসার করিতেছে ; তাহারদিগের পরম হিত হইতে পারিবে ; কেন না ; বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে তাহারদিগের আর জঘন্যতা থাকিবেক না ; অনায়াসেই একঘর গৃহস্থ হইয়া উঠিবেক।'[১০৮]

এ আন্দোলনের প্রতি অপ্রসন্ন 'সমাচার সুধাবর্ষণ' লিখল :

'যাহারদিগের ব্যবস্থায় সমুদায় ভারতবর্ষেই প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা হইতেছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে না তাঁহারা এদেশের চিরন্তন কালাবধি অপ্রচলিত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচার করণ পক্ষে সাহায্যার্থ যে রাজশাসন প্রকাশ করিবেন এমত কদাপি বোধ হয় না, এ দেশের অসংখ্য লোকের বিশেষতঃ প্রধান হিন্দুমণ্ডলীয় [র] যে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর নাই তাহা যে গ্রাহ্য হইবেক প্রথমতঃ ইহাই বোধ হয় না যদিও গ্রাহ্য করেন তথাচ ঐ বিষয়ে কিরূপ শস্ত (শাস্ত্র ?) আছে এবং এদেশের

১০৬ 'বিধবারদের বিবাহ' ('সমাচার দর্পণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত),' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১৭. ৬. ১৮৫১।

১০৭ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২৮. ৭. ১৮৫১।

১০৮ 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', ২৪০ সংখ্যা, ১৫ পৌষ, ১২৬২, পৃ. ৮১৭।

প্রধান সমাজীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কিরূপ মত অবশ্য অনুসন্ধান করিবেন। আর যদিস্যাৎ রাজপুরুষগণ বিধবাবিবাহ সাহায্য করিলে আপনারদের জাতীয় ধর্মের উন্নতি বিবেচনা করিয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই আইন করেন তাহা হইলেও যে বিধবাবিবাহ এদেশে চলিত হইবে এমত বোধ হয় না বিধবা-বিবাহ হইলে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের একাংশ উচ্ছিন্ন হইবে তাহাতে যে অত্রত্য ধার্মিক জনগণ সাহস সম্মত হইবেন এমত কদাচ বোধ হয় না।'[১০৯]

আর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' মিঠে-কড়া সুরে লিখল :

'হিন্দু শাস্ত্রে কাজ নাই তার মুখে ছাই।
বিধবার বিয়ে হয় তাই মোরা চাই।'[১১০]

দেখাই যাচ্ছে, বাংলা সাময়িকপত্রগুলি কিছুদিন বিধবাবিবাহ নিয়ে নেচে উঠেছিল। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এ-বিষয়ক অজস্র রচনার মধ্যে কয়েকটি রচনা সাময়িকতা আশ্রয়ী হয়েও অন্তর্নিহিত সাহিত্যগুণের জন্য স্বাদু হয়ে উঠেছে। ১৭৭৬ শকের চৈত্র মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের 'বিধবাবিবাহ' প্রবন্ধটি, বা দীনবন্ধু মিত্রের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রেরিত পত্র দুটি ('সংবাদ প্রভাকর' ২২.২.১৮৫৬ ও ২৫.২.১৮৫৬), বা 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাটির কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। প্রথমটি যুক্তিনিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত সার্থক প্রবন্ধ (যা নাকি অনেক প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিকেও অভিভূত করেছিল)। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি গল্পরসাশ্রয়ী এ বিষয়ক উত্তীর্ণ রচনা। তৃতীয় রচনাটির বিশেষ উল্লেখ করতেই হবে। 'মাসিক পত্রিকা'র অধিকাংশ সংখ্যা বর্তমানে লুপ্ত হওয়ায় রচনাটির পূর্ণ রস আস্বাদনে আমরা বঞ্চিত। 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই রচনাটির যে অংশগুলি আমরা দেখেছি, তা হল :

'শ্রীযুত ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তির বিধবাবিবাহ করিবার আভলাষ', 'মাসিক পত্রিকা', নং ৯, ১৩.৪.১৮৫৫, পৃ. ১০১-৬ ;

১০৯ 'সমাচার সুধাবর্ষণ', ৪৪৫ সংখ্যা, ২১. ৭. ১২৬২ ; ১৫. ১০. ১২৬২-তে প্রকাশিত অন্য একটি রচনায় বিধবাবিবাহকে 'শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ' বলা হয়। অবশ্য ২৭. ৭. ১২৬২-তে প্রকাশিত লঘু সুরের একটি কবিতায় বিধবাবিবাহের প্রতি এ ধরনের বিরূপতা প্রকাশ পায় নি, বরং বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের যুক্তিগুলিকে অকাট্য বলে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

১১০ 'হিন্দু বিধবাদিগের আক্ষেপ', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ৩০৮ সংখ্যা, ১৮. ৭. ১৮৫৩।

'শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি ঘুচিয়া যায়,' 'মাসিক পত্রিকা', নং ১০, ১৪.৫.১৮৫৫, পৃ. ১১৩-৮ ;

'শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষাল বিধবা ভগিনীর বিবাহ দিবেন কিনা বিবেচনা করেন,' 'মাসিক পত্রিকা', নং ১১, ১৪.৬.১৮৫৫, পৃ. ১২৫-৯ ;

'শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষাল আপনার বিধবা ভগিনীর বিবাহের কথা স্ত্রীকে বুঝান', 'মাসিক পত্রিকা', নং ১২, ১৬.৭.১৮৫৫, পৃ. ১৩৭-১৪১ ;

'হিন্দুদিগের বিধবাবিবাহের কথা শুনিয়া ইংরাজদিগের বিবীরা যাহা বলে,' 'মাসিক পত্রিকা' বালম ২, নং ৭, ১২.২. ১৮৫৬, পৃ. ৭৪-৭।

ব্রজনাথ-মনোমোহিনীর এই উদ্দেশ্যমূলক উপাখ্যানটি প্যারীচাঁদের লেখনী-স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অজ্ঞাত কারণে প্যারীচাঁদের এই লেখাটি এ পর্যন্ত তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কাহিনীটির নায়ক ব্রজনাথ অশেষ গুণবতী বিধবা মনোমোহিনীকে বিয়ের প্রস্তাব করে লেখে, 'বিধবাবিবাহে কিছুমাত্র দোষ নাই, এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি, আর দেশের সকলে জানে। কিন্তু কর্মটি দেশাচার নয়, এই জন্যে প্রচলিত হইতেছে না, পরমেশ্বরের কৃপায় শীঘ্র প্রচলিত হইবেক, সন্দেহ নাই।' চিঠি পেয়ে তরুণী মনোমোহিনী অনেক ভাবল, নিজেই যেন নিজেকে বলল, 'যদি বিধবাবিবাহে দোষ না থাকিত, তবে আমি ব্রজনাথকে বিবাহ করিতাম, সন্দেহ নাই।' পরক্ষণেই দেখা দিল দ্বিধা, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত তরুণীটি সমাজের রক্তচক্ষু স্মরণ করেই হয়তো সিদ্ধান্ত করল, 'প্রাণ যায় স্বীকার করিব, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহে কখন সম্মত হইব না।' এ সিদ্ধান্ত নেবার সময় মনোমোহিনীর চোখে কি জল এসেছিল? প্যারীচাঁদ কিছু বলেন নি। না বললেও, একটি তরুণীর চোখের জলের আভাস লেখাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। রচনাটিতে প্যারীচাঁদের সচেতন মনের স্পর্শ পাবার আনন্দকে ম্লান করে দেয় সম্পূর্ণ রচনাটি না পাবার দুঃখ।

শুধু বাংলা পত্রিকাগুলিই নয়, ইংরেজি পত্রিকাগুলিও কোমর বেঁধে আসরে নামল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক বিদ্যাসাগরের বন্ধুলোক, তিনি যে বিধবা-বিবাহ নিয়ে অনেককিছু লিখবেন এতো জানা কথা। আমরা বরং 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর'-এর সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের[১১১] বক্তব্য শুনে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

১১১ বিধবাবিবাহ-বিরোধী কাশীপ্রসাদ সাংবাদিক হিসাবে কিছুটা নিরপেক্ষ ছিলেন। তাই এই আন্দোলনের সমর্থনে লেখা চিঠিও তাঁর কাগজে ঠাঁই পেত। ২৬. ৩. ১৮৪৯ ও ৯.৪.১৮৪৯-এর 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সরে' এ ধরনের দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়। প্রথমটির লেখক এন. এল. ডি, দ্বিতীয়টির বি. এল. এস।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার আলোচনা শেষে তিনি বললেন :

সমাজে আরও বহু কুপ্রথা আছে, যা অল্পায়াসে দূর করা যায়—আর সংস্কারকদের উচিত সেদিকে মনোযোগ দেওয়া। বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি কাল ও শিক্ষার ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। কারণ আমাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কিছু ঘটার আশা সুদূর পরাহত ![১১২]

(৮)

কৌলীন্যপ্রথা ও বাংলা সাহিত্য

সতীদাহ নিবারিত হল, বিধবাবিবাহও চালু হল, কিন্তু কৌলীন্যপ্রথা বাঙালীসমাজে রয়ে গেল অবাধ ও অবারিত। এইসব কুলীন মেয়েদের চোখের জলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক পাতা মনে হয় যেন এখনও ভিজে আছে। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনের বহুপত্নীর অন্যতম হয়ে সিঁথিতে সিঁদুর ছাড়া আর কিছু, তাঁদের অনেকেরই ভাগ্যে জুটত না। স্বামী নামক 'দেবতার' দর্শন পাওয়া—সে তো রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার! ফলে নানাবিধ অনাচার যে সমাজে দেখা দিয়েছিল, তা আমরা আগেই বলেছি।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই, এ প্রথার নানা কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বাংলার জনগণ সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকায় এর বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। আইন করে এ প্রথা নিবারণের প্রার্থনাও জানানো হতে লাগল।

আধুনিক যুগে রামনারায়ণ তর্করত্নই সম্ভবত কৌলীন্যপ্রথাকে নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তাঁর আগে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বহু লেখা বেরিয়েছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও কৌলীন্যপ্রথার প্রতি অম্ল-মধুর কটাক্ষ চোখে পড়ে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র অল্প কথায় কৌলীন্যের অভিশপ্ত রূপকে ফুটিয়েছেন :

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥

১১২ '*The Hindu Intelligencer*', 12. 2. 1855, P. 51.

যদি বা হৈল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥…
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥
সুতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥'[১১৩]

রংপুর-কুণ্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫৩-তে 'সম্বাদ ভাস্কর' 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' ইত্যাদি পত্রিকায় কৌলীন্যপ্রথার কুফল দেখিয়ে 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নামে নাটক রচনার জন্য ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন দেন। সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর জানুয়ারি, ১৮৫৪ পর্যন্ত একখানিও নাটক না আসাতে, ২. ৩. ১৮৫৪-র 'সম্বাদ ভাস্করে' 'এদেশ কি পণ্ডিতশূন্য হইল' বলে আক্ষেপ করা হয়। শেষপর্যন্ত রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এসে পৌঁছয়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারটিও তিনি পান। এই বছরই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটি জনৈক কুলীনের ৮ থেকে ৩২/৩৩ বছরের চারটি মেয়েকে কুলরক্ষার জন্য এক বৃদ্ধ কুদর্শন পাত্রের হাতে সমর্পণের মর্মান্তিক কাহিনী। উদ্দেশ্যমূলক এই নাটকটির বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ স্পষ্টই বলেছেন, 'কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা' ঘটেছে—তা সম্যক অবগত করানোই তাঁর লক্ষ্য। কৌলীন্যের দোষ উদ্‌ঘাটন নাটকটির মূল লক্ষ্য হলেও এ বিষয়ে নাট্যকারের সাফল্য বিতর্কাতীত নয়। বৈচিত্র্যহীন উপাখ্যানাংশ, সংস্কৃত শ্লোক ও শ্লেষোক্তির প্রাচুর্য, পদ্যাংশের যথেচ্ছ ব্যবহার, ঘটনার সংহতি-হীনতা, ভাষার জড়তা ইত্যাদির জন্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেও নাটকটি উল্লেখ-যোগ্য নয়। তবে সমসাময়িক বাঙালীসমাজের একটি মর্মান্তিক প্রথার স্মারক এই নাটকটি। এর মধ্য দিয়ে কুলীন মেয়েদের জমাট বাঁধা কান্না যেন ভাষা পেতে চেয়েছে। এক পরিবারের একাধিক কন্যার একই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত ঘটনা। একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক:

হুগলির কোনো একটি গ্রামে সাতটি মেয়েকে একই রাতে কোনো এক কুলীনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই সাত বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি

১১৩ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'কবি ভারতচন্দ্র' (১৯৭৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৯৫।

দুধের শিশু, তবে জোর করে মার কোল থেকে তুলে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়।[১১৪]

—কাজেই ৬০ বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে এক পরিবারের ৪টি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য রামনারায়ণকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি। সমকালীন বাঙালীসমাজ-জীবনই তাঁকে নাটক রচনার উপাদান যুগিয়েছিল। আমরা আক্ষেপ করে বলি, জীবনটা কেন গল্পের মতো হয় না, আর গল্পটা জীবনের মতো! রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব'-এ বর্ণিত চারটি মেয়ের জীবন কিন্তু গল্প হলেও সত্যি!

উদ্দেশ্যমূলক এই নাটকটি তার উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ করতে পেরেছিল সন্দেহ। এই প্রথার ফলে 'এদেশের কি কি অনিষ্ট হইতেছে, কি উপায় দ্বারা তাহা রহিত হইতে পারে, তাহা রহিত হইলেই বা কি উপকার হইতে পারে, এবং কোন সূত্র ধরিয়াই মৃত মহাত্মা বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার মূল বদ্ধ করেন, এবং তাঁহার বিবেচনারই বা কি দোষ ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থপ্রকাশক মহাশয় কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই', কুলীন-কন্যাদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়—এই তাঁর মূল কাহিনীসূত্র। নাটকটির উক্তরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে'র উক্তি স্মরণীয়—

'কুলীনদিগের বহুবিবাহের বিষয়েও তিনি অতি অল্প লিখিয়াছেন, কেবল স্ত্রীলোকদিগের বিলাপ উক্তি ও বর কন্যার পক্ককেশের বিষয়ই তিনি বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বোধহয় পুস্তকলেখক পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় কুলীনদিগের বিষয় অধিক জ্ঞাত নহেন…।'[১১৫]

—সমালোচনা কঠিন হলেও অসত্য নয়। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' 'ঘৃণিত কৌলীন্যপ্রথা' সকলে একমত হলে অনায়াসে নিবারিত হতে পারে বলে মত প্রকাশ করে লেখে, 'কোন শাস্ত্রেই কুলীনের কথা লিখিত নাই, কিন্তু দেশীয় প্রথা এমত প্রবল যে কেহই তাহার উচ্ছেদ নিমিত্ত সাহসিক হইতে পারেন না, এবং এ বিষয়ে একতাও দৃষ্টি হয় না, অতএব কৌলীন্যপ্রথার প্রতি-কূলে এই পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।'[১১৬] সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্করও। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র এক সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় নাটক ও নাট্যকারের প্রশংসা করে তিনি আশা প্রকাশ করেন,

১১৪ '*Anti Polygamy Tracts, No-1* (1856), P. 10.

১১৫ 'সংবাদ প্রভাকর', ৫১১৪ সংখ্যা, ২৬. ১২. ১৮৫৪।

১১৬ ঐ, ঐ।

'গৌড়ীয় ভাষায় এতাদৃশ মনোহর নাটক প্রকাশে দেশের অনেক কুনীতি নির্মূল হইবে!'[১১৭]

কৌলীন্যপ্রথার ঘোর বিরোধী ঈশ্বরগুপ্ত শুধু 'সংবাদ প্রভাকর' আর 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'ই এই প্রথার বিরুদ্ধে লিখলেন না, পরিহাসের ভঙ্গিতে একটি ছোট কবিতা লিখে[১১৮] কৌলীন্যের অন্তঃসারশূন্যতা, ভয়াবহতা, বীভৎসতা ও অমানবিকতা অপূর্বভাবে তুলে ধরলেন। 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে' তাঁর এই ক্লাসিক লাইনটি যে অতিশয়োক্তি নয়, সমকালীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। কৌলীন্যপ্রথার জন্য বৃদ্ধের বালিকা-বধূ বা প্রৌঢ়ার বালক-স্বামী গল্পকথা নয়, বা ঈশ্বর গুপ্তের কল্পনাও নয়, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজেরই ইতিহাস—তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। এসবের ফলে ব্যভিচার সমাজকে কলুষিত করায় গুপ্তকবি কাতরকণ্ঠে করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, 'এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার।' স্বল্পপরিসরে কৌলীন্য-প্রথার সুপরিচায়ক এই কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের সমাজসচেতন মনের স্পর্শে সজীব, উজ্জ্বল এবং আন্তরিক।

বিদ্যাসাগর-অনুরাগী উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' বিধবাবিবাহকে নিয়ে রচিত বাংলা পুস্তকগুলির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তা বলে এসেছি। নাটকটিতে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে কুলীনকন্যা সত্যভামার মুখের কবিতায় কৌলীন্যপ্রথার ক্লেদাক্ত দিকটি ফুটে উঠেছে। দেখা যাক, কি বলেছেন তিনি :

'আমরা কুলীনঘরে জন্মিয়াছি বটে।
তবু তো এমন বুদ্ধি নাহি আসে ঘটে॥
ঘরে বসে কিনা করি কে দেখে কাহারে।
গঙ্গা জলে ধোয়া মেয়ে আছে কার ঘরে॥
ছমাস নমাস অন্তে কান্তে দেখা পাই।
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম রক্ষা তাই॥
বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই।
যেখানে যা করি দেই তাঁহারি দোহাই॥
বুঝিবার ভুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়।
অমুক যে ভাল নয় এই মাত্র কয়॥'[১১৯]

১১৭ 'সম্বাদ ভাস্কর', ১১০ সংখ্যা, ২৩. ১২. ১৮৫৪।

১১৮ 'কৌলিন্য', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড), মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত, পৃ. ১৭৩-৪।

১১৯ 'বিধবাবিবাহ নাটক' (৪ সং, ১২৮৫), উমেশচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৬৫।

—কি বলবো একে—লঘু সুরে গুরু কথা, নাকি পরিহাসের মধ্যে চোখের জল ?

বাংলা সাহিত্যের এক অনাদৃত লেখক অকালমৃত তারাশঙ্কর তর্করত্ন তাঁর 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'তে বাঙালীসমাজে মেয়েদের দুরবস্থা ও অসহায় অবস্থার চিত্রায়ন প্রসঙ্গে কৌলীন্যের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। আশী বছরের বুড়োর সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে, কিংবা 'স্বীয় কুলোচিত পাত্রের অভাবে' পঞ্চাশ বছরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা, এক পাত্রকে পাঁচ-ছয় কন্যা সম্প্রদান—উনিশ শতকে বাংলার সমাজচিত্র ! তার ওপর বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনের স্বভাব—তারাশঙ্করের ভাষাতেই শোনা যাক :

'কুলীন কন্যাদিগের দুঃখের কথা কি কহিব স্বামী জীবিত থাকিতেও তাহারা বিধবাপ্রায় হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীর স্বামী বৎসরে একবার আইসেন, কোন বা স্বামী বিবাহের পর সে পথ একেবারে বিস্মৃত হন্ আর সে দিকে ভ্রমক্রমেও পদার্পণ করেন না। এই কুলীনাভিমানি স্বামীগণের গুণের কথা কি বলিব তাঁহারদের বৎসরান্তে যদি একবার আগমন হয় এবং আসিবামাত্র যদি দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণা পান্ তবে চিরদুঃখিনী কামিনীর সহিত আলাপ করেন্ নতুবা তাহাকে আরো দুঃখিতা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন সুতরাং তাহাদিগের ধর্ম্ম কিরূপে থাকে।'[১২০] একাধিক স্ত্রী নিয়ে যারা ঘর করে, তাদেরও দুঃখের শেষ থাকে না। এক পাত্রে অনেক কন্যা দেওয়ায় অনেক কুলীনকন্যাকে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। তারাশঙ্কর যে সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসাবে সেযুগে কৌলীন্যের দোষ অনুভব করে তাকে ভাষা দিয়েছিলেন, তা আমাদের তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ করে।

আমাদের আলোচ্য পর্বের কিছু পরে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ বিষয়ে দুখানি পুস্তক রচনা করেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ১ম ১৮৭১, ২য় ১৮৭২। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, তাকে খণ্ডন করে তারানাথ ভট্টাচার্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ে বিচার।' বিক্রমপুরের প্রাচীনপন্থী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজে ১৪টি বিয়ে করলেও ১২৭৫ সালে 'বল্লালি সংশোধনী' নামে কৌলীন্য সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। এজন্য তাঁকে কর্ম্মচ্যুত ও বহুবিধ

১২০ 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (২ সং, ১৮৫১), তারাশঙ্কর তর্করত্ন, পৃ. ৭-৯।

লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়।[১২১] রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে কয়েকটি গান রচনা করে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বিদ্যাসাগর রাসবিহারীর গ্রন্থপাঠে সন্তুষ্ট হয়ে সেটির ইংরেজি অনুবাদ করছেন বলে তাঁকে একটি চিঠিতে জানান।[১২২]

শুধু বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকাতেই নয়, সাময়িকপত্রগুলিও কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারল না। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'সম্বাদ কৌমুদী'র চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কুলীনদের পরিণয়ের দোষ' নামে লেখাটি জনৈক কুলীনের কাহিনী, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য লেখাটিতে স্থান পায় নি। এই লেখাটির ইংরেজি অনুবাদ ২৬. ২. ১৮২২-এর 'ক্যালকাটা জার্নালে' প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কৌলীন্যপ্রথা নিয়ে এ প্রথার সমর্থক 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সঙ্গে, এ প্রথা বিরোধী 'সমাচার দর্পণে'র রীতিমতো বাদ-বিসংবাদ শুরু হয়, যদিও এতে ফল কিছুই হয়নি।[১২৩] 'সমাচার দর্পণ' ছাড়াও 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'বিদ্যোৎসাহিনী', 'বিদ্যাদর্শন', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'তত্ত্ব-বোধিনী', 'জ্ঞানারুণোদয়', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকা-গুলি বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে এই প্রথার প্রতি তাদের বিরূপতা প্রকাশ করতে থাকে। বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এ ধরনের কটি রচনার নামোল্লেখ আমাদের কিছুটা কৌতূহল মেটাতে পারে :

(১) 'কুলীনদের বহুবিবাহ', 'জ্ঞানান্বেষণ', ২৩. ৪. ১৮৩৬ ;

(২) 'বহুবিবাহ', 'বিদ্যাদর্শন', শ্রাবণ, ১৭৬৪ শক ;

(৩) 'বহুবিবাহ' (চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত), 'বিদ্যাদর্শন', ভাদ্র, ১৭৬৪ শক ;

(৪) 'অধিবেদন', 'বিদ্যাদর্শন', ভাদ্র, ১৭৬৪ শক ;

(৫) 'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ (চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত), 'বিদ্যাদর্শন', কার্তিক, ১৭৬৪ শক,—'কলিকাতা নিবাসিনী বেশ্যা'র চিঠিতে কৌলীন্যের কুফল আলোচনা, এবং এই চিঠিটি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

(৬) 'বিক্রমপুর নিবাসি কস্যচিৎ জনস্য' স্বাক্ষরিত পত্র, 'সম্বাদ ভাস্কর', ৩১. ৭. ১৮৪৯ ;

---

১২১ 'শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত. (১ম ও ২য় খণ্ড), রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৭।

১২২ ঐ, পৃ. ৭৭।

১২৩ '*The Calcutta Christian Observer*', March, 1833, P. 132,

(৭) 'কস্যচিৎ সর্বহিতাকাঙ্ক্ষি জনস্য' স্বাক্ষরিত পত্র, 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৩. ৮. ১৮৪৯ ;

(৮) সম্পাদকীয়, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১৯. ৬. ১৮৫১ ;

(৯) 'বন্ধুর লিখিত' বিষয়, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২৮. ৭. ১৮৫১ ;

(১০) 'কৌলীন্যের দোষ', 'দেশ হিতৈষী জনস্য' স্বাক্ষরিত পত্র, 'সমাচার-দর্পণ', ২৪. ৪. ১৮৫২ ;

(১১) শ্রী সূর্যকুমার চক্রবর্তী লিখিত পত্র, 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ২. ৮. ১৮৫২ ;

(১২) 'অস্মদ্দেশীয়েরা কেন কন্যা দায় বলিয়া দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন তৎ-প্রতিকারণ', 'জ্ঞানারুণোদয়', ৩১. ৮. ১৮৫২ ; লেখাটিতে বাঙালীসমাজে মেয়েদের দুরবস্থার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কৌলীন্যপ্রথার কথা বলা হয়েছে ;

(১৩) 'আমি দেশহিতৈষী' স্বাক্ষরিত পত্র, সংবাদ প্রভাকর', ২৮. ৪. ১৮৫৩;

(১৪) 'কুলিনের ব্যবহার', 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ২৭. ৪. ১৮৫৫ ;

(১৫) 'বহুবিবাহ', 'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র, ১৭৭৭ শক ;

(১৬) 'বহুবিবাহ', 'তত্ত্ববোধিনী', ভাদ্র, ১৭৭৮ শক ;

(১৭) সম্পাদকীয়, 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৫. ১১. ১৮৫৬।

বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত লেখাগুলির একদিকে আছে গুরুগম্ভীর আলোচনা, অন্যদিকে লঘুসুরে এই প্রথার ক্লেদাক্ত দিকটির পরিচয় উন্মোচন। অধিকাংশ পত্রিকাই এ প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা নিবারণে আগ্রহী। এমন কি, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রভৃতি যে পত্রিকাগুলি বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রীতির চোখে দেখে নি, তারাও এ প্রথার কুফল অনুভব করে এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। বলতে পারি, কৌলীন্য-প্রথা উনিশ শতকে প্রচলিত থাকলেও, তার পেছনে জনসমর্থন বিশেষ ছিল না।

বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পূর্বোক্ত লেখাগুলির মধ্যে 'বিদ্যাদর্শন' ও ও 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত লেখাগুলি বিশেষ মূল্যবান। 'বিদ্যাদর্শনে' প্রকাশিত বহুবিবাহ-বিরোধী লেখাগুলির মধ্যে শ্রাবণ, ১৭৬৪ শকে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' এবং ভাদ্র, ১৭৬৪ শকে প্রকাশিত 'অধিবেদন' নামক রচনাদুটির লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বলে আমাদের অনুমান। যুক্তি ও শাস্ত্রবিরোধী এই প্রথা নিবারণে 'বিদ্যাদর্শনে'র পৃষ্ঠায় আইনের সাহায্য প্রার্থনা করতে কুণ্ঠিত না হলেও, চৈত্র, ১৭৭৭ শকের 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' নামক রচনাটিতে (এটিরও লেখক অক্ষয়কুমার বলে আমাদের অনুমান)এই 'কুপদ্ধতি'

এই দণ্ডেই দেশ থেকে দূর করা বিধেয় বলে মত প্রকাশ করেও, আইন করে তা নিবারণে তিনি উৎসাহ দেখান নি। আইন করে তা নিবারিত হলে তাঁর মতে 'আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল।' বিশেষ করে, এ প্রথা রহিত করা বহু আয়াস বা ব্যয়সাধ্য নয়, 'কেবল পরস্পর আপনারা সকলে মনোযোগী হইলেই এইক্ষণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশস্থ মহাত্মাদিগের সমীপে বিনীতভাবে আমাদিগের এই নিবেদন যে অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, আর বিলম্ব করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।'[১২৪]

ভাদ্র, ১৭৭৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' নামক দ্বিতীয় লেখাটিতে কৌলীন্যপ্রথা নিবারণের প্রতিকূলে ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত আবেদন পত্রটির বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে এ প্রথার শাস্ত্রীয়তা বিচার করা হয়েছে। শুধু যুক্তি নয়, শুধু বুদ্ধি নয়, আবেগও লেখাটির মধ্যে ধ্বনিত। শুধু যুক্তি দেখিয়ে বা শাস্ত্রের বুলি আউড়ে যে এ প্রথা দূর হবে না, এর জন্য যে হৃদয়ের উষ্ণতা চাই—তা অনুভব করে, রক্ষণশীলদের মধ্যে সেই উষ্ণতা জাগাতেই এখানে তিনি প্রয়াসী।

না, শুধু অক্ষয়কুমারেরই নয়, 'কুলীনবংশের বালিকাগণের দুঃখের কথা লিখিতে হৃদয়ে হৃদকম্প উপস্থিত' হয়েছিল মহেশপুরের সূর্যকুমার চক্রবর্তীরও।[১২৫]

শুধু বাংলা পত্রিকাগুলিই নয়, সমকালীন ইংরেজি পত্রপত্রিকাগুলিও কৌলীন্যপ্রথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারে নি। 'এনকোয়েরার', 'রিফর্মার', 'দি ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার', 'ক্যালকাটা কুরিয়র', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এ কুপ্রথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছিল। বক্তব্য মোটামুটি দুটি, অশাস্ত্রীয়, যুক্তিহীন এ প্রথা নৈতিকতার হানিকারক, হাজারো পাপের উৎসমুখ, নারীত্বের অপমান—আর সেই কারণেই সরকারের উচিত আইন করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে দেওয়া। তাই কৌলীন্যপ্রথা দূর করতে আইন চাই, আইন—এ দাবি শুধু 'রিফর্মার'ই করেনি, 'ক্যালকাটা কুরিয়র', 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও বারবার এ কথা বলেছিল।

ফল কি হয়েছিল আগে বলে এসেছি, পুনরুক্তি না করে প্রসঙ্গ শেষ করা

---

১২৪ 'বহুবিবাহ', 'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র, ১৭৭৭ শক, পৃ. ১৭৫।

১২৫ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ২.৮.১৮৫২।

যাক 'সমাচার সুধাবর্ষণ' থেকে লঘু সুরে লেখা কৌলীন্যের ক্লেদাক্ত দিকটির পরিচয়বাহী একটি লেখা তুলে ধরে :

'এক আশ্চর্য কোন কুলীন ঠাকুর অনেকগুলীন বিবাহ করিয়া প্রাচীন হইয়াছেন। কোনখানেই আর পূর্ববৎ সমাদর পান না, এবং সেইরূপ সুখে আর দিনপাত হয় না। লোকের মুখে শুনিলেন যে, কাজলা কাষ্ঠকুড়ম্ব গ্রামে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পক্ষের একটি সন্তান অতিশয় কৃতী হইয়া বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছেন, নাম সম্ভ্রম করিয়াছেন। ভাল রূপ বাড়ী ঘর করিয়া ক্রিয়াকর্ম করিতেছেন। ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেই স্থানে গমন করত পুত্রের নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। কৃতীপুত্র পিতাকে পাইয়া অতিশয় সম্মান করিলেন। উত্তম ঘর, উত্তম শয্যা, উত্তম বস্ত্র সহযোগে আহারাদির বিষয়ে অতি উত্তম নিয়মবদ্ধ করিয়া দিলেন ব্রাহ্মণ শেষ অবস্থায় অত্যন্ত সুখী হইয়া তথায় বাস কবেন, এমত সময়ে এক ঘটনা হইল, পুত্রটি "বিশ্বকর্মার ব্যাটা বেয়াল্লিস কর্মা" হইতেপাবেন নাই, সবে মাত্র ১০/১২টি বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে "দামুড়্ হুদো মামুদপুর" গ্রামের শ্বশুর এক পত্র পাঠাইলেন,

যথা।

"পরম কল্যানীয়

শ্রীযুত—মুখোপাধ্যায় বাবাজী

পরম কল্যাণবরেষু "২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার দিবসে তোমার এক নবকুমার হইয়াছে, ৮ বৈশাখ শনিবার দিবসে তাহার অন্নপ্রাসনের দিন ধার্য করা হইয়াছে, বাবাজী তুমি পত্রপাঠ এখানকার বাড়ীতে আগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবা, আমি সমুদয় আয়োজন করিয়াছি ইতি।

উক্ত বাবুজী বাবাজী এই পত্রখানি পাঠ করত তৎক্ষণাৎ অমনি আড়ষ্ট হইলেন, পরে আস্তে ব্যস্তে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট আসিয়া কহিলেন "বাবা, বাবা! হ্যাদে এক চমৎকার দেখো, দুই বৎসর হইল আমি অমুকস্থানের শ্বশুরবাড়ী গমন করি নাই, সে স্ত্রীকেও এখানে আনি নাই, আমার শ্বশুর এই পত্র লিখিয়াছেন অমুক দিবস তোমার ছেলের ভাত হইবে, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।"

এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক বৃদ্ধটি তখনি অমনি অম্লান বদনে [কহিলেন] "হাঃ হাঃ বাবা, হাঃ তার ভাবনা কি, কুলীনের ছেলে, চিন্তা কি অমন্ হোয়ে

থাকে, হোয়ে থাকে, কি বাবা তার আটক কি, তুমি এখনি যাবে, আমি সব উদ্যোগ করিয়া দিই, এতো বড় ভারি নহে, তুমি ভাতের সময় সংবাদ পাইলে, এই যে বাপু, তুমি হইলে পর একেবারে তোমার পৈতের সময়ে আমি পত্র পাইয়াছিলাম আমি তাহাতে কিছুই মনে করি নাই, স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়া তোমার পৈতা দিলাম। কুলীনের কি ওদিকে শ্বশুর যেমন কসুর করেন না, এদিকে তেমনি জামাই হইয়া কামাই দেওয়া উচিত হয় না।'[১২৬]

(৯)

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য

'নিত্য সুখ প্রদায়িনী, বিদ্যার অভাবে।
আপন জীবন তারা, মরুভূমি ভাবে ॥'[১২৭]

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র কবিতাকার উনিশ শতকের বাঙালী মেয়েদের মনের খবর জানতেন নাকি? বিদ্যার অভাবে তখনকার সদ্য-যুবতীরা জীবনকে মরুভূমি ভাবতেন কিনা জানি না, তবে এ সময়ের সচেতন অনেক মানুষই এমন কথা ভাবতেন। এঁদের মধ্যে বিদেশী বেথুন, প্রগতিশীল গৌরীশঙ্কর, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মদনমোহন, বউবাজারের মুক্তমনা নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজপতি রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও-শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন, রামগোপাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর তর্করত্ন থেকে শুরু করে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত সবাইকে পাই।

অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হবার মতো লোকের অভাবও এযুগে ছিল না। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র 'বুড়া সম্পাদক', বা 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরে'র সম্পাদক 'হাফ-ওল্ড-বাঙ্গাল' কাশীপ্রসাদ ঘোষ বা 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র নন্দকুমার কবিরত্ন—এঁরা তো এযুগের নামকরা স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী। জনসাধারণও এযুগে স্ত্রীশিক্ষাকে খুব প্রসন্ন মনে নেয় নি। বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠিয়ে শুধু মদনমোহনকেই সমাজচ্যুত হতে হয় নি। আরও অনেককে অনেকরকম সামাজিক উপদ্রব ভোগ করতে হয়েছিল। আর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বাঙালীসমাজের এইসব ধারণাই ছাপ রাখল সমকালীন সাহিত্যে।

১২৬ 'কুলিনের ব্যবহার', সমাচার সুধাবর্ষণ', ২৭.৪.১৮৫৫, পৃ. ৪।

১২৭ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ১৬.১.১৮৫৪।

বাংলাভাষায় স্ত্রীশিক্ষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সমর্থনের প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের। ১৮২২-এ 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' লিখে তিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন। বইটি রচনায় তিনি রাধাকান্ত দেবের আনুকূল্য ও সহায়তা লাভ করেন। রাধাকান্ত দেবকেই অনেকে গ্রন্থকার নামহীন এই গ্রন্থটির রচয়িতা মনে করতেন। ২০. ৩. ১৮৫১-তে রাধাকান্ত বেথুনকে এ সম্পর্কে যে চিঠি লেখেন, তা থেকে গ্রন্থটির প্রথমভাগের যাবতীয় কৃতিত্ব যে গৌরমোহনেরই তা বুঝতে পারা যায়, দ্বিতীয় ভাগের ক্ষেত্রে নিজের সাহায্যের কথা রাধাকান্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।[১২৮] বড় হরফে ছাপা ৪৫ পৃষ্ঠার এই বইটির (পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ১৮২৪) দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনে'র মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষ করে মিশনরি উদ্যোগে (লেডিস সোসাইটি) স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করা হয়েছে। প্রথম ভাগ অনেকটা গল্পের মতো করে কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা, ভাষা ও রচনারীতি সে যুগের তুলনায় প্রাঞ্জল। দেশী ও মেয়েলি কথ্যভঙ্গি প্রয়োগে (রাধাকান্ত দেব যাকে বলেছেন, 'vulgar colloquial style') রচনাংশ স্বাদু হয়ে উঠেছে। স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, বা এতে কোনো ব্যবহার দোষ নেই, গ্রন্থটির ২য় ভাগ—'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণ'-এ তা দেখিয়ে, গৌরমোহন বলেছেন, বরং এরফলে পাপকর্মে অশ্রদ্ধা ও ধর্মে মতি হয়। মেয়েদের স্বল্পবুদ্ধির অভিযোগ খণ্ডন করে, বইটির শেষাংশে তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

বইটিতে গৌরমোহন যেভাবে ও যে যুক্তিতে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করেছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নারীদরদী মনটি ফুটে উঠেছে। উদ্দেশ্যমূলক এই গ্রন্থটি সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগে, স্বচ্ছন্দ গদ্যে, কখনও বা কথোপকথনের ভঙ্গিতে, গৌরমোহন তাঁর উদ্দেশ্যমূলকতাকে ভাষা দিয়েছিলেন—এজন্য সাহিত্যিক অভিনন্দনও তাঁর প্রাপ্য। কি স্বচ্ছন্দ গদ্যে গৌরমোহন এযুগে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তার একটু দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

'যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প একারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্য উদ্যোগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত।

১২৮ 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩-৪

যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায়ে ছয়গুণ কহিয়াছেন, এবং এ দেশের স্ত্রীলোকদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধিপরীক্ষা সম্প্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ ক'রতে না পারেন তবে তাঁহারদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়। এ দেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরবসিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহারদুষ্ট বলিয়া মানা করাণ।'[১২৯]

কয়েকটি দেশীয় সাময়িকপত্র বইটির তীব্র সমালোচনা করে। প্রকাশের বেশ ক'বছর পরে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'সমাচার দর্পণ' এই পুস্তিকাটির উল্লেখ করলে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখে :

'স্ত্রী বিদ্যাবিধায়ক পুস্তক এতদ্দেশীয় হিন্দুর আচার ব্যবহারের শাস্ত্র হইতে পারে না এবং তৎপুস্তকে স্বজাতীয় ধর্ম ও বিদ্যাব্যতিরিক্ত বিজাতীয় ধর্ম-পুস্তকাধ্যয়নের বিধি নাই এবং কুলাঙ্গনাদিগের বারাঙ্গনার ন্যায় ভাইলোকের পাঠশালায় পাঠাইবার প্রমাণ নাই এবং তৎপাঠশালাস্থিতা কোন খ্রীষ্টিয়ান বিদ্যাবতীকে নিজবাটীতে রাখিয়া তাহারদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার আদেশ নাই এবং সাহেব ও বীবীলোকের সমীপে তাহারদিগকে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই কেবল পূর্বকালীন কএকজন মহামতি বিদ্যাবতীর বিবরণ আছে সংপ্রতি তাহার প্রথমভাগে কতিপয় জাত্যুক্তি কোন মিসিনরিকর্তৃক সংগৃহীতা হইয়াছে এতাবতা ঐ গ্রন্থ দর্পণ প্রকাশকের নিগূঢ়াভিপ্রায়ের সাধক হইতে পারে না।'[১৩০]

১৮৪০-এ স্ত্রীলোকের দুষ্কৃতির পরিচয় দিয়ে ৩৩ পৃষ্ঠার 'স্ত্রীজাতির দুরাচরণের কথা অর্থাৎ স্ত্রীনিন্দা বিষয়ক ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। এতে সাবলীল ভঙ্গিতে স্ত্রীজাতির দুরাচারের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনার ছলে স্ত্রীজা তর নিন্দাবাদ করা হয়েছে। লং তাঁর ক্যাটালগে বইটি গৌরমোহনের পুস্তিকার প্রত্যুত্তরস্বরূপ বললেও,[১৩১] বইটিতে গৌরমোহনের পুস্তিকার বা সমসাময়িক স্ত্রীস্বাধীনতা প্রয়াসের কোনো উল্লেখ নেই! তবু, এযুগে সমাজের শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীজাতির প্রতি সন্দিহান মনোভাবের প্রকাশক হিসাবে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

---

১২৯ 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' (৩য় সংস্করণ, ১৮২৪), গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, পৃ. ২২।

১৩০ 'স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক। দর্পণ প্রকাশকের প্রতি' (সমাচার চন্দ্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত), 'সমাচার দর্পণ', ৬.৮.১৮৩১, পৃ. ২৫৪।

১৩১ লং-এর পূর্বোক্ত বাংলা ক্যাটালগ, পৃ. ৬১৭।

'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে ছাত্র উত্তমরূপে আপনাভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেক তাহাকে ৭৫ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক'—১৮৪৯-এ হেয়ার স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভাধ্যক্ষেরা অন্যান্য বছরের মতো ছাত্রদের রচনা বিষয়ে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন। ১মে, ১৮৪৯-এর মধ্যে ঐ প্রবন্ধ, কমিটির সেক্রেটারি প্যারীচাঁদ মিত্রের কাছে পাঠাতে বলা হয়। প্রবন্ধ-পরীক্ষক হিসাবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিজ্ঞাপিত হয়। সংস্কৃত আর হিন্দু কলেজের ৫ জন ছাত্র প্রবন্ধ লিখে পাঠান; এঁদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখা সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই ৭৫ টাকা পাবেন স্থির হয়।[১৩২] ১৮৫০-এ হেয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা হিসাবে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে মাত্র ১০০ কপি ছাপা হওয়ায় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' শুধু ক্ষোভ প্রকাশ না করে, তরুণ লেখককে উৎসাহিত করার জন্য ১৮৫০-এ 'বিদ্যাতত্ত্ব' শিরোনামে তারাশঙ্করের সমগ্র পুস্তিকাটি ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করে। ১৮৫১-তে লং-এর উদ্যোগে এনসাইক্লোপীডিয়া প্রেস থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫৮ পৃষ্ঠার এই বইটি দ্বিতীয় সংস্করণে ৭০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। কোথায় ১০০, আর কোথায় ৭০০০!

এদেশে এখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন না থাকায়, কেউ বলেন তা শাস্ত্রসম্মত নয়, কেউ একে বলেন লোকাচারবিরুদ্ধ, কেউ বা বলেন লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়, আবার কারোর মতে লেখাপড়া শেখার মতো বুদ্ধি মেয়েদের নেই! এদেশের লোকের এইসব ভুল ধারণা, প্রমাণ দেখিয়ে দূর করার জন্য তারাশঙ্কর চার খণ্ডে ভাগ করে লেখেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'। প্রথম খণ্ডে 'স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রের নিয়ম ও তাহাদিগের বর্তমান দুরবস্থা বিশেষতঃ বিদ্যা ব্যতিরেকে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ।' দ্বিতীয় খণ্ড 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিবার যুক্তি ও প্রমাণ।' এই খণ্ডটি রচনায় তিনি পূর্ববর্তী গৌর-মোহনের দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়েছেন। তৃতীয় খণ্ডে 'স্ত্রীলোকের বিদ্যা হইলে এদেশের কি অবস্থা হয়' তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বঙ্গদেশ পৃথিবীবিখ্যাত হবে—এমন উক্তি করতেও দ্বিধা করেন নি। শিক্ষাদ্বারা নীতিজ্ঞ হলে মেয়েরা কুপথে যাবে না, অধর্মকে ঘৃণা করবে। এর ফলে গৃহ-

১৩২ 'সংবাদ প্রভাকর', ৩৪২৭ সংখ্যা, ২.৬.১৮৪৯।

কার্যের ও আচারের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা আসবে। মেয়েদের মানসিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন হলে তারা চিঠিপত্র লিখতে ও ছেলেমেয়েদের উপকার করতে পারবে। মেয়েদের বুদ্ধির অল্পতা, বিদ্যাশিক্ষার ফলে তাদের অকাল বৈধব্য ইত্যাদি অভিযোগও তারাশঙ্কর খণ্ডন করেছেন। চতুর্থ খণ্ড 'স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলনের উপায়'-এ তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করে, মেয়েদের শিক্ষাদানে সবাইকে যত্ন নিতে অনুরোধ করেছেন।

লেখকের ভাষা বিষয়োপযোগী, রচনারীতিও আন্তরিক। লেখকের অনেক মত বা যুক্তি বা তাঁর অনেক বিশ্বাস, আজকের দিনে আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও, স্ত্রীশিক্ষার প্রথম পর্বে তারাশঙ্কর মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার উপযোগিতা প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এটুকুই যথেষ্ট। আর তাই বোধহয় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখেছিল :

'আমরা বোধকরি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেশীয় মহাশয়দের অজ্ঞানতা দূর হইয়া যাইবেক অতএব অনুরোধ করি দেশীয় সকল ব্যক্তি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিয়া মর্মাবধারণ পুরঃসর তদুক্ত উপদেশ পালনে সত্বর হয়েন।'[১৩৩]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় 'স্ত্রীশিক্ষাবিধান' নামে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা রচনা করেন। ২০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে যেরকম যুক্তিনিষ্ঠভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানানো হয়েছে, তা বিস্ময়কর। স্ত্রীশিক্ষা প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডন করে, যুক্তির সাহায্যে 'পুত্র ও কন্যাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই' দেখিয়ে, স্ত্রীশিক্ষার প্রাচুর্য ছাড়া এদেশের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বলে—দ্বারকানাথ মন্তব্য করেছেন। এযুগে, এরকম তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ ভাব ও ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমর্থন, আমাদের খুব কমই চোখে পড়েছে।

১৮৫৯-এ প্রকাশিত রামসুন্দর রায়ের 'স্ত্রীধর্ম বিধায়ক' স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনকারী পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১৮২৪-এ গৌরমোহন তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে'র পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন'-এ প্রশ্ন রেখেছেন, 'লেখাপড়া আবশ্যক বটে, কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয়'—এর উত্তরে অন্যজন বলেন, তিনি শুনেছেন, 'কোন

১৩৩ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২২৯৩ সংখ্যা, ৭.১১.১৮৫০।

শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়।'—একথা লেখার পর অনেকদিন কেটে গেল, বেথুনের উদ্যোগে স্থাপিত প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েরা 'এ. বি' শিখতে লাগল, কলকাতার আশপাশেও দু'চারটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠল। কিন্তু হলে হবে কি, সাধারণ মনের সংস্কার কি কাটে এত সহজে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে লোকে বলবে কি! আর শিখে হবেটাই বা কি, তারা কি চাকরি করে টাকা আনবে? উল্টে লোকেরা বলে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নাকি বিধবা হয়! এসব কথা শোনার পর, কোন মা—বিশেষ করে বাংলাদেশের কোন মা প্রাণভরে মেয়েকে স্কুলে পাঠাবেন? আর বাঙালী মায়েদের এই মানসিকতাই প্রতিফলিত ১৮৫৪-তে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায়। এখানে দেখতে পাই হরিহর আর তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী মেয়ের শিক্ষাবিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। হরিহর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হলেও, সংস্কার-বশত তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী এর বিপক্ষে। পদ্মাবতীর বক্তব্য তাঁর মুখেই শোনা যাক:

'মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির বাড়ি গিয়াছিনু সেখানে মাসী পিসী সকলেই এসেছিলেন, তাদের কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বলিলে তাঁহারা সকলে বল্লেন মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেও ২ বল্লে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে রাঁড় হয়। মাগো মা সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুকপুক করছে। কায নাই বাবু আর লেখাপড়ায় কায নাই। আমার মেয়ে অমনি থাকুক। যে কয়েকদিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্যে চূড়ামণিকে দিয়া ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।'[১৩৪]

প্যারীচাঁদের লেখার গুণে পদ্মাবতীর কথার ঝংকারটুকু পর্যন্ত ফুটে উঠেছে। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রের এর চেয়ে সার্থক রূপ আর কি হতে পারে? হরিহর অবশ্য হাল ছেড়ে না দিয়ে কিছুদিন ধরে তাঁর স্ত্রীকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন (দ্র. 'মাসিক পত্রিকা', ১, ২, ৩ সংখ্যা, 'গৃহকথা-স্ত্রীশিক্ষা')। প্রমাণ তো তিনি করবেনই, কারণ হরিহরের মুখ দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা-সমর্থক প্যারীচাঁদের বক্তব্যই ভাষা পেয়েছে।

তবে ১৮৫৪-তে 'মাসিক পত্রিকা'য় যে মনোভাবই প্রকাশ পাক, স্ত্রীশিক্ষার

১৩৪ 'গৃহকথা নং ১-স্ত্রীশিক্ষা', মাসিক পত্রিকা নং ১, ১৬.৮.১৮৫৪।

দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ শাসনে প্রথমে অনেকে আনন্দে উদ্বাহু হয়ে উঠলেও ধীরে ধীরে কেউ কেউ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। শোষণে-অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক-জনতা নিয়েছে বিদ্রোহের পথ। ইংরেজ-ভক্ত মধ্যবিত্তদের কেউ ধর্মীয় স্বাধীনতাহানিতে, কেউ অর্থনৈতিক দুরবস্থায়, কেউ উচ্চ রাজকীয় পদবঞ্চিত হওয়ায়, কেউ কৃষকের অবর্ণনীয় দুর্দশায়, কেউ শিক্ষা-বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্যে ক্ষুব্ধ। এমনকি ইংরেজের দাসানুদাস জমিদার-ভূস্বামীরাও আরো সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে বিষণ্ণ। তাই ওল্ডবেঙ্গল ও ইয়ংবেঙ্গল দুদলই সংঘবদ্ধ হলেন দেশের নামে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে—গঠিত হল নানা রাজনৈতিক সভাসমিতি।

এইসব রাজনৈতিক সভার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিবরণ আগেই দিয়ে এসেছি। 'দেশ হিতার্থী' এইসব সভার চরিত্র সমকালেই বাঙালী সাহিত্যিক-দের চোখে ধরা পড়েছিল। তাদের কার্যকলাপকে অপূর্ব বিদ্রূপাত্মক বাচন-ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন ঈশ্বর গুপ্ত। উনিশ শতকের বাক্‌সর্বস্ব বাঙালীর রাজ-নৈতিক চরিত্রের অনাবৃত বিশ্লেষণ তাঁর লেখাটিকে উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে :

'ব্রিটিশ রাজ্যেশ্বরেরা ধনলোপে লোলুপ হইয়া কয়েকটা প্রজাপীড়ক নীতি নির্দিষ্ট করিলে অস্মদ্দেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যগণ 'ভূম্যধিকারী সভা' নামে এক সভা এবং ইয়ংবেঙ্গল নামধারি যুবক সম্প্রদায়েরা 'বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে অপর এক সভা স্থাপিতা করেন, উক্ত উভয় সভার অধ্যক্ষেরা প্রথমে কতপ্রকার আড়ম্বর ও ধূমধাম করিয়াছিলেন বক্তৃতার শব্দ শুনিয়া পথিকেরা স্তব্ধ হইত, কিন্তু পরিশেষ তাহার নাম পর্যন্ত লয় প্রাপ্ত হইল, অধুনা সেই অধ্যক্ষেরা যেন তাঁহারাই নহেন, যেমন সর্বরীসময়ে বিবিধ বিহঙ্গম বৃক্ষ-বিশেষে বসিয়া বিনোদ স্বরে সংগীত করত প্রভাতে পরস্পর পরস্পর প্রতি প্রীতি-শূন্য হইয়া নানাদিগে গমন করে, অস্মদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দেশোন্নতির কল্পনাও তদ্রূপ হইয়াছে, অর্থাৎ একটা সভা প্রতিষ্ঠিতা হইলে মহাপুরুষেরা সকলেই অগ্রে তথায় আগমন করত মহদাড়ম্বর সহকারে উৎসাহ প্রকাশে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না, কিন্তু সেই সভা ভঙ্গ করিয়া বাটী আসিয়া গদির উপর বসিয়া একবার একছিলিম্ গুড়ুক টানিলেই পূর্বভাবের অন্যথা হয়, ততক্ষণাৎ ধোঁয়ার সঙ্গে ২ সেই উৎসাহ শূন্যে ২ উড়িয়া যায়।'[১৮৩]

১৮৩ 'দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি মনের স্বল্পাভিপ্রায় প্রকাশ', 'সংবাদ প্রভাকর', ১২. ৪. ১৮৪৮।

কিন্তু উৎসাহ শূন্যে উড়ে যাবার আগে তাঁরা এইসব সভায় দেশহিতার্থে করলেনটা কি? কিছু করুন বা না করুন, 'গরম গরম বক্তৃতা' করতে ভোলেন নি। এইসব বক্তৃতা কাদের জন্য—জনগণের? উহু। তবে? জনৈক পণ্ডিত ও 'দেশ হিতার্থী সভা'য় (ন্যাশনাল এসোসিয়েশন) প্রবেশচ্ছুক কিঞ্চিৎপুরের একজন জমিদারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'সমাচার দর্পণে'র অজ্ঞাতনামা লেখক অম্লমধুর ভাষায় এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার পরিচয় নিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

আজকের দিনে আমাদের মনে জ্বলন্ত প্রশ্ন, দেশ কার—জনগণের না মুষ্টিমেয় বিত্তবানের? ঠিক এই একই প্রশ্ন শতাধিক বর্ষ পূর্বেকার এই লেখাটিতে ধ্বনিত—দেশ কার?

'জমীদার। প্রণাম মহাশয় শুনিয়াছেন কলিকাতার রাজাবাহাদুর ও বাবু প্রভৃতি মহোদয়গণ দেশহিতার্থি সভা স্থাপন করিয়াছেন।

পণ্ডিত। উঃ এই দেশে কি এইক্ষণেও দ্বেষ প্রচুর হয় নাই।

জমীদার। ছিঃ শ্লেষ ত্যাগ করুন। তাঁহারা আমাকে মধ্যে লইতে চাহেন।

প। আপনার যেমন অভিরুচি।

জ। তাই বটে তাঁহারা সভার প্রথম বৈঠকের কার্য বিবরণ ও গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রথম যে দরখাস্ত পাঠাইলেন তদ্বৃত্তান্ত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

প। ভাল এইক্ষণে তাঁহারা কি চাহেন কি পুনঃ সহমরণের অনুমতি কিম্বা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের তুল্য কোন নূতন আইন বা কি।

জ। না তা নয় তাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টে ও ইঙ্গলণ্ডদেশে পার্লিমেণ্টের নিকটে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অভীষ্ট বিষয় প্রকাশ করিবেন এবং কলিকাতায় বৃহৎ সিরিশ্‌তা স্থাপন করিবেন নানা ব্যাপারের বিষয়ে দরখাস্ত করিবেন এবং ইঙ্গলণ্ডদেশে আপনারদের একজন উকীল নিযুক্ত রাখিবেন ফলতঃ যাহাতে লোকের মঙ্গল সম্ভাবনা তাহা সিদ্ধ করণের চেষ্টায় ত্রুটি করিবেন না।

প। হাঁ লোকের মঙ্গল। কোন লোকের মঙ্গল।

জ। জমীদারেরদের, আর কার।

প। কিন্তু সভার নাম দেশহিতার্থী।

জ। বটে আমরাই দেশ।

প। যে আজ্ঞা, তবে আপনারদের জন্যেই কি করিবেন।

জ। প্রথমে যে আইনের মুসাবিদাক্রমে চৌকীদারেরদিগকে উপযুক্ত মাসিক

বেতন আমারদের দিতে হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে তৎকর্ম নির্বাহার্থে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে সেই আইনজারী নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছেন।

প। তাহাতে আপনার কি। এইক্ষণেও চৌকীদারেরা আপনকার চাকর আছে তখনও থাকিবেও। রাইয়তেরাই তাহারদের বেতন দিতেছে। তাহারদের উপর যদি কিছু অধিক ভার লাগে তাহাতে আপনকার কি।

জ। তাহাতে আমার বিস্তর আছে বিশেষতঃ তাহারা ইতর লোক তাহাদেরই পরিশ্রমেতে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ হয় সুতরাং স্বদেশীয় লোকেরদের প্রতি যদ্রূপ মনোযোগ কর্ত্তব্য তদ্রূপ তাহারদের প্রতি বিশেষমতে করিতেছি।

প। যে আজ্ঞা।

জ। আরো চৌকীদারেরা রাইয়তেরদের স্থানে অধিক পাইলে আমার তো কমে। যা হউক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন আমি তাহা ভালবাসি না। কে জানে কার পেটে কি আছে। কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট চৌকীদারেরদিগকে নিজ অধীনেই রাখিতে পারেন তাহা হইলে আমার এদিগ ওদিগ সর্বদিগেই হাকিমের চক্ষু পড়িবে।

প। তাই বটে কিন্তু দরিদ্র বেচারারদের কি হইবেক।

জ। গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধারক এক পুলীশ স্থাপন করুন 'তাহাতে ঐ নিদারুণ আইনের যে মুসাবিদা এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে তাহার আবশ্যক থাকিবে না। ফলতঃ সভ্যতাবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে ২ কি পশ্চাদগত হইব।

প। [...] যাউক এ রাম চাষা যে এখনো খাজনা দেয় নাই। সে কহে [কবচ ?] পড়িতে পারি না। তাহা [ছাড়া বাবুর ?] প্রতি বিশ্বাস হয় না।

জ। সে বেটা বড় বজ্জাৎ তাহাকে ধরিয়া আন। দেখি যদি গুল দিয়া সোজা করিতে পারি।

প। ভাল তত্ত্বাবধারক পুলীশ থাকিলেও আপনকার এরূপ কার্য্যের প্রতিও হস্তক্ষেপ করিত।

জ। তা বটে। চৌকীদারেরদের নূতন নিয়ম না হইলে ঐরূপ পুলীশ স্থাপন হইতে পারে না।'...১৮৪

১৮৪ 'দেশহিতার্থি সভা', 'সমাচার দর্পণ,' ১৩. ১২. ১৮৫১, পৃ. ২৫৮-৯।

॥ নির্দেশিকা ॥